আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ

আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র

মূল
সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ

অনুবাদ
হাফেজ আবু তাসমিয়া

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা

প্রকাশক ▼ নেসার উদ্দীন আয়ূব
ইসলামী টাওয়ার (৪র্থতলা)
১১, পি. কে. রায় রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল ▼ আগস্ট ২০০৯
প্রচ্ছদ ▼ ডিজিটাল সাজঘর
বর্ণবিন্যাস ▼ একুশে কম্পিউটার
মুদ্রণ ▼ হেরা প্রিন্টার্স
মূল্য ▼ ১৮০ টাকা

Agami Biplober Ghosona Patro By Sayed Kutub Shahid. Translated: Hafiz Abu Tasmia. Published by Panjeree Islamic Publications. 11, P. K. Roy Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Phone: 7124328, 01678140302

US $ 8

ISBN 984-8403-43-4

লেখকের ভূমিকা

গোটা মানবজাতি যে আজ এক ভয়াবহ ধ্বংসলীলার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে–এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সত্য। তবে এই অবস্থার জন্যে কালের চক্র বা দৈবিক কোনো কারণ দায়ী নয়; বরং এটা তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের অনিবার্য পরিণতি। এখানেই শেষ নয়, এ অবস্থা চলতে থাকলে আরো চরম ও ভয়াবহ পরিণতি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে–বর্তমান অবস্থা সেই রকম পরিণতির পূর্বাভাস মাত্র। এই দুরাবস্থার মূল কারণ হলো, মানবজাতির সত্যিকার উন্নতি, অগ্রগতির জন্যে যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রয়োজন তা আজ তারা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। এটা শুধু পৃথিবীর অনুন্নত কোনো অঞ্চলের চিত্র নয়; বরং উন্নতি ও অগ্রগতির দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার পাশ্চাত্যজগতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শূন্যতাও আজ সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ছে। বিশ্বমানবতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা তো দূরের কথা–এমন কোনো মূল্যবোধ কিংবা আদর্শ তাদের কাছে নেই, যা নিয়ে তারা নিজেরা পরিতৃপ্ত হতে পারে বা নিজেদের বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে।

তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত গণতন্ত্র বিশ্বমানবতাকে সুখ-শান্তির পথ দেখাতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এমনকি আজ তারা নিজেরাও জানে না, সুখ-শান্তি নামক শ্বেত পায়রাটি কোথায় বাস করে। গণতন্ত্রের ব্যর্থতার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তারা পাশ্চাত্যেও চালু করতে শুরু করেছে। এদিকে প্রাচ্যের অবস্থাও মোটেই সুখকর নয়। তারা একটি মৌল বিশ্বাসের ওপর রচিত মার্কসীয় দর্শনের ওপর তৈরী সমাজব্যবস্থার ফোলানো ফাঁপানো, মেকী রূপ সৌন্দর্য দেখিয়ে এক সময় পাশ্চাত্যের অসংখ্য মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। কিন্তু কালের চক্রে, আদর্শের ময়দানে মার্কসীয় মতবাদ আজ অনিবার্য পরাজয় বরণ করে নিয়েছে এবং নিতে বাধ্য। কারণ, এ মতবাদ সার্বিকভাবে মানুষের জন্মগত স্বভাব ও সৃষ্টিগত চাহিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কথা বললে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, বর্তমান বিশ্বে সত্যিকার মার্কসীয় দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রও নেই।

দীর্ঘকাল ধরে কোনো অঞ্চলের মানুষ যদি কোনো স্বৈরাচার কিংবা একনায়কের নির্যাতনে নিষ্পেষিত হতে হতে অতিষ্ট হয়ে ওঠে তবে সেই সমাজের দিশেহারা মানুষেরাই এই ধরনের সস্তা বুলি গ্রহণ করতে পারে। হাস্যকর ব্যাপার হলো, আজকাল এ ধরনের বস্তুবাদী সমাজের

লোকদের সমস্যা সমাধানেও এ ব্যবস্থা চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ বস্তুবাদই হলো মার্কসীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর আদর্শগুরু রাশিয়াই আজ চরম খাদ্যাভাবের মুখোমুখি। জারের শাসনামলে যে রাশিয়া তার নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত রাখতো, সেই রাশিয়াই আজ বাধ্য হয়ে স্বর্ণের বিনিময়ে অন্য দেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করছে। তাদের অদূরদর্শী ও মস্তিষ্কপ্রসূত কৃষিনীতিই এ জন্যে দায়ী। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতির বিপরীতমুখী নীতিমালাই এই দুরাবস্থার মূল কারণ।

সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বই আজ মানবজাতির প্রধান অভাব। এটাই আজ মানবজাতির সর্বপ্রথম প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব আজ শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন। আজ তাদের নেতৃত্বে ঘুণ পোকা ধরেছে, যা ভেঙ্গে পড়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাদের এই দুরাবস্থার কারণ কিন্তু অর্থনৈতিক, বস্তুগত বা সামরিক দুর্বলতা নয়; বরং তাদের মধ্যে যে বিষয়টি অনুপস্থিত তা হলো নীতি, নৈতিকতা, সততা ও নিষ্ঠাসহ প্রয়োজনীয় মৌলিক মানবিক গুণাবলী।

বিশ্ববাসীর সামনে ইউরোপ যে সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে এটা সত্যিই অনস্বীকার্য। তাই আগামী দিনের নেতৃত্বকে অবশ্যই তাদের এসব প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের অবদানগুলোকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। আবার এরই পাশাপাশি বিশ্বমানবতার সামনে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধের এমন এক নবদিগন্ত উন্মোচন করতে হবে যা অধঃপতিত এই মানবজাতির কাছে এখনো এক অনাবিষ্কৃত ও অজানা অধ্যায়। একই সাথে মানবজাতির সামনে এই নেতৃত্বকে এমন এক বাস্তবমুখী, কল্যাণময় ও ইতিবাচক জীবনাদর্শ পেশ করতে হবে যা প্রতিটি মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ ও তার মেধা বিকাশের পথে সহায়ক।

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি যে, একমাত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থাই আলোচিত সবক'টি বিষয়ের শাশ্বত, নির্ভুল, যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী সমাধান দিতে সক্ষম।

আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনীও মানুষকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। ষোড়শ শতকের যে রেনেসাঁ আন্দোলন উনিশ শতকে এসে বিজয়ের হাসি হাসতে চেয়েছিলো তাও ক্রমেই তার গতি হারিয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে। আধুনিক কালের

সংকীর্ণমনা জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যেসব মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে তা সবই শুরুতেই পতনের মুখ দেখেছে। দশকথার এক কথা হলো–যে শিরোনামেই হোক, আর যে মূলনীতির ভিত্তিতেই হোক–মানবরচিত জীবনব্যবস্থাগুলো একে একে সবই ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

আজ মানবজাতি যখন এই অধঃপতন আর অবক্ষয়ের অন্ধকূপের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে, তখন কী করে মুসলিম জাতি চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে? কিছুতেই নয়। আজ মুসলমানদের অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে গোটা মানবজাতিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালিত করার। কারণ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানোর সময়েই মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিম জাতির ওপর ন্যস্ত করেছেন। এ দায়িত্ব পালন কেবলই একটি মানবিক দায়িত্ব ও কাজ নয় বরং সৃষ্টিকর্তার এবাদাতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুস্পষ্টভাবে এটা তিনি তাঁর কালামে জানিয়ে দিয়েছেন–

"(হে নবী, স্মরণ করো) যখন তোমার মালিক (তাঁর) ফেরেশতাদের (সম্বোধন করে) বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বানাতে চাই, তারা বললো, তুমি কি এমন কাউকে (খলীফা বানাতে) চাও যে (তোমার) যমীনে (বিশৃংখলা ও) বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (স্বার্থের জন্যে) তারা রক্তপাত করবে আমরাই তো তোমার তাসবীহ পড়ছি, তোমার প্রশংসা করছি এবং (প্রতিনিয়ত) তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।" (সূরা আল বাকারা, ৩০)

"আমি মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে আমার বন্দেগী করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করিনি।" (সূরা যারিয়াত, ৫৬)

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী মানবদলে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে (হেদায়াতের) সাক্ষ্য হয়ে থাকতে পারো এবং (একইভাবে) রসূলও তোমাদের জন্যে সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে। যে কেবলার ওপর তোমরা (এতদিন) প্রতিষ্ঠিত ছিলে আমি তা এ উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে করে আমি এ কথাটা জেনে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কে রসূলের অনুসরণ করে, আর কে হেদায়াতের পথকে অবজ্ঞা করে। তাদের ওপর এটা ছিলো এক কঠিন পরীক্ষা, অবশ্য আল্লাহ তাআলা যাদেরকে হেদায়াত

দান করেছেন তাদের কথা আলাদা। আল্লাহ তাআলা কখনো তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মানুষদের প্রতি বড়ো দয়ালু ও একান্ত মেহেরবান।" (সূরা আল বাকারা, ১৪৩)

"তোমরাই (এই দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং নিজেরাও আল্লাহর ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে।" (সূরা আলে ইমরান, ১১০)

কোনো সমাজ, ভূখণ্ড ও জাতির মাঝে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ না করে ইসলাম কখনোই তার সত্যিকার রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে না এবং তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকাও পালন করতে পারে না। আর আধুনিক যুগের মানুষের ক্ষেত্রে তো বিষয়টি আরো প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। কেননা তারা নিছক সংজ্ঞা, ওয়ায-নসিহত বা পরকালীন সুখ-স্বপ্নের কথা শুনে কোনো আদর্শ গ্রহণ করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। তাছাড়া বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত কোনো রূপরেখা ছাড়া আসলেই কোনো আদর্শের কার্যকারিতা পরিমাপ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বাস্তবতার আলোকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই–বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম জাতি এক অর্থে তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছে। অত্যন্ত ব্যথিত মন নিয়ে আমাকে লিখতে হচ্ছে যে, সারা পৃথিবীতে এমন এক টুকরো ভূখণ্ডও নেই যেখানে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে। আজকের মুসলিম দাবীদার লোকগুলোকে দেখলে কিছুতেই মনে হয় না যে, মাত্র কিছুদিন আগেও এদের পূর্বপুরুষেরা ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। বংশীয়ভাবে আমরা আজ যেভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করি এটা তো কখনোই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো না। মুসলমান তো তাদেরকেই বলে যাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়াদিসহ তাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ সবকিছুই ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা থেকে নেয়া। সুতরাং রাজনৈতিকভাবে পৃথিবীতে যখন থেকে আল্লাহর বিধান কার্যকরী নেই তখন থেকেই বাস্ত ব অর্থে মুসলমান দলটির নামও পৃথিবী থেকে মুছে গেছে।

মুসলিম উম্মতের সেই আসল রূপ ফিরিয়ে আনা ছাড়া কিছুতেই ইসলামী আদর্শকে দিশেহারা এই মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে বসানো সম্ভব নয়।

শত শত বছর ধরে নামধারী মুসলমান সমাজ মানবরচিত পূতিগন্ধময় অনাদর্শের নীচে চাপা পড়ে আছে। আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার সাথে

যার সামান্যতম কোনো সম্পর্কও নেই এমন সব মিথ্যার জঞ্জালের নীচে পড়ে আজ মুসলিম জাতি পিষ্ট হচ্ছে। আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে মানবরচিত ব্যবস্থার ধারক, বাহক, পৃষ্ঠপোষক হয়েও তারা তাদের এলাকাকে কিংবা রাজ্যকে 'ইসলামী জগৎ' অথবা 'মুসলিম দেশ' বলে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে।

আমি জানি, নিজেদেরকে পুনর্গঠন করা থেকে শুরু করে মানবজাতির আসল নেতৃত্বের পুনরুদ্ধার–সে এক সংকটময় সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার মতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা মুসলিম জাতি এক সুদীর্ঘকাল ধরে নেতৃত্বের আসন থেকে দূরে থাকার কারণে বর্তমান পৃথিবীতে বলতে গেলে তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। মুসলিম নেতৃত্বের এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে মানুষের রচিত বিভিন্ন স্থূল মতবাদ ও তন্ত্র-মন্ত্রগুলো মানবজাতির বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে এবং ঐ সমস্ত মতবাদের ধারক, বাহক ও রচয়িতারাই চলমান পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন দখল করে বসে আছে।

বর্তমান সময়ে ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও বস্তুতান্ত্রিক উৎকর্ষের দিক থেকে সত্যিই এক অসাধারণ কৃতিত্বের দাবীদার। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, নীতি-নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধের দিক থেকে এরা ফিরে গেছে ইতিহাসের অসভ্যতম যুগে। মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় না হলে ইউরোপের এই উন্নতি সত্যিই মানবজাতিকে বসবাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারতো। অন্যদিকে ওদের মাঝে এতোসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আজ মুসলিম জাতি তাদের অধঃপতন, অবক্ষয় ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর দোষত্রুটি, ফাঁকফোকর ও অকল্যাণগুলো মানবজাতির সামনে তুলে ধরতে পারছে না। তার কারণ হলো–সৃজনশীল প্রতিভা ও সঠিক জ্ঞান থেকে থেকে বর্তমান নামধারী মুসলিম জাতি তাদের চেয়ে কয়েকশত বছর পিছিয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় নিজেদের চরকায় তেল না দিয়ে অন্যের দোষের সমালোচনা করলে তা কোনো কল্যাণ বয়ে আনা তো দূরের কথা বরং তা চরম হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হবে।

সাথে সাথে এ কথা কোনোক্রমেই ভুলে গেলে চলবে না যে–যতো সমস্যা, যতো বাধাবিপত্তিই থাকুক না কেন মানবজাতির মুক্তির জন্যে একটি সফল ইসলামী বিপ্লব ছাড়া এর কোনো বিকল্প নেই। পথ যতো বন্ধুরই হোক না কেন, বাধা-বিপত্তি যতো প্রবলই হোক না কেন, বস্তুগত সহায়সম্বল যতো অপ্রতুলই হোক না কেন, কিছুতেই মুসলিমদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনো অবকাশ নেই। সময়

নষ্ট না করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান তথা ইসলামী মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের জন্যে এখনই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

বিশ্বনেতৃত্বের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী

তবে শুধু আবেগ উদ্দীপনা থাকলেই চলবে না; বরং আবেগ ও ইচ্ছার সাথে কিছুটা হুঁশ অবশ্যই থাকতে হবে। যদি আমরা সত্যিই দ্বীনের কাজ করতে চাই তাহলে অবশ্যই সে কাজ হতে হবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। আর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তথা আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে যে নেতৃত্বের জন্যে এগিয়ে আসবে তাকে অবশ্যই সার্বিক দিক থেকে যোগ্য হতে হবে। তাই সেই নেতৃত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকের জেনে নেয়া আবশ্যক। কাজ শুরু করে পদে পদে হোঁচট খেয়ে যেন পথের মাঝেই তা মুখ থুবড়ে না পড়ে সে জন্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক।

এই নেতৃত্বকে মনে রাখতে হবে যে–বস্তুতান্ত্রিক আবিষ্কার উদ্ভাবন, অগ্রগতি খুব সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম; অথচ আজকের নামধারী মুসলমান সমাজ এদিক থেকে অনেক পিছিয়ে এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো সম্ভাবনাময় প্রতিভা দেখাতে একেবারেই অপারগ। এমতাবস্থায় আধুনিক যুগের মানুষেরা এমনিতেই মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাদেরকে বিশ্বের নেতৃত্বের আসন ছেড়ে দেবে–এমন চিন্তা করাটা বাতুলতা বৈ কিছুই নয়। আগামী কয়েক শতকেও বর্তমান ইউরোপকে মুসলিম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনীর দিক দিয়ে পেছনে ফেলতে পারবে–এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই; বরং এমনটি কল্পনা করাও বোকামী। তাই আমাদেরকে অবশ্যই এমন কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হবে যার সামনে তাদের এই বস্তুবাদী উন্নতি-অবদান ম্লান হয়ে যায়।

তবে বস্তুগত উন্নতি-অবদানকে আমরা মোটেই গুরুত্ব দেবো না–এমনটিও বাঞ্ছনীয় নয়।

মানুষের জাগতিক সুখ-সুবিধার প্রতিও আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা এই বৈষয়িক উন্নতি শুধু মানবজাতির নেতৃত্বের জন্যেই প্রয়োজন নয়; বরং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ও ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্যেও এর প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর খলিফা তথা প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং এই পৃথিবীর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে চেষ্টা করাটা শুধু তার মানবিক দায়িত্বই নয়; বরং এটা তার এবাদাতেরও

একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে মানবজাতির উন্নতির জন্যে এই বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি বাড়তি আরো একটা বিষয় পেশ করতে হবে; আর তা হচ্ছে জীবন সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি বাস্তবমুখি জীবনব্যবস্থা। সে জীবনব্যবস্থা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সকল সরঞ্জামকে সংরক্ষণ করবে। মানুষের জীবনযাত্রাকে সুখময় ও সহজ করার জন্যে উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের সযত্ন লালন করবে এবং মানুষের মৌলিক বিশ্বাস (ঈমান), নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধকে সঠিক অর্থে বিকশিত করবে। আর এই জীবনব্যবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে মুসলিম সমাজের দর্শন, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও সার্বিক রূপরেখার মধ্য দিয়ে।

আধুনিক জাহেলিয়াত

আধুনিক যুগের মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, চালচলন, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা দেখলে এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, গোটা বিশ্বই আজ জাহেলিয়াতের এক চরম ঘুর্ণিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম, সুখ-সম্ভোগের আধুনিক উপায়-উপকরণের উপস্থিতির পাশাপাশি বাস্তব চিন্তা-চেতনার দিক থেকে তাদের জ্ঞানশূন্যতা বা অজ্ঞতাও প্রকট হয়ে ধরা পড়ছে। এই অজ্ঞতা সবচেয়ে প্রকটভাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে। এটাই সবচেয়ে বড়ো জাহেলিয়াত। বলা যায়, এটাই জাহেলিয়াতের প্রধান ও একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। এর ফলে একমাত্র আল্লাহর জন্যে সংরক্ষিত অধিকার 'সার্বভৌমত্ব' মানুষ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এবং কিছুসংখ্যক মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানবজাতির ওপর প্রভু সেজে বসেছে। তবে এই আধুনিক জাহেলিয়াত প্রাচীন জাহেলিয়াতের মতো ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করে না। বরং মানুষের জন্যে জীবন-বিধান, মূল্যবোধ ও মানদণ্ড রচনার ক্ষেত্রে আল্লাহর যে একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব ছিলো, সেই সার্বভৌমত্বে ভাগ বসিয়েছে এবং তারা নিজেরাই সমাজের মানুষের জন্যে বিধি-বিধান, আইনকানুন, নিয়ম-প্রথা, তন্ত্র-মন্ত্র তথা জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন শুরু করেছে। মুখে না বললেও কার্যত এটা আল্লাহর সাথে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণারই নামান্তর। আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই তারা নতুন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন বোধ করেছে। আল্লাহর বিধানকে কল্যাণকর মনে করে যদি তারা মানতোই তাহলে এসব মস্তিষ্কপ্রসূত আইনকানুনের প্রয়োজন কোথায়? আল্লাহর বান্দাদের ওপর কোনো মানবগোষ্ঠীর

নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত আইনকানুন চাপিয়ে দেয়াই হলো সবচেয়ে বড়ো যুলুম।

কম্যুনিজম শাসিত সমাজব্যবস্থায় মানবতার ওপর এমন অবাঞ্ছিত নিয়মকানুন চাপিয়ে দেয়া হয় যা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষের চরিত্রে এমন লোভী ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনা গড়ে ওঠে যেখানে দুর্বল মানুষ ও অনুন্নত দেশের ওপর সবল ও উন্নত দেশের যুলুম–নিস্পেষণ এক নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। আর গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের রায়ে এমন সব বিধিবিধান মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় যার অনুমোদন আল্লাহ তাআলা দেননি। এগুলো হলো আল্লাহর মর্যাদার অবমূল্যায়ন করা ও আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করার নামান্তর। বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থাকে কোনো 'মানুষের' পক্ষে মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, মানবরচিত সকল সমাজব্যবস্থায় মানুষ কোনো না কোনোভাবে তারই মতো আরেক শ্রেণীর মানুষের আনুগত্য ও দাসত্ব করে। একমাত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থায়ই মানুষ মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। নিজেরই মতো এক শ্রেণীর মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত আইনকানুন মেনে নেয়া হলো মানুষের জন্যে সবচেয়ে অপমানজনক পরাধীনতা বা গোলামী। একমাত্র ইসলামই মানুষকে এই সব ধরনের ঘৃণ্য, অপমানজনক গোলামীর জিঞ্জীর থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতার সম্মান দান করে।

ইসলাম বনাম জাহেলিয়াত

উপরোক্ত বিষয়গুলোই হলো মানবরচিত জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামের মূল পার্থক্য। এখান থেকেই অন্যান্য জীবনব্যবস্থা থেকে ইসলামের পথ পৃথক হয়ে যায়ঃ। এই বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানবজাতির সামনে তাদের সৃষ্টিকর্তার নাযিল করা জীবনব্যবস্থার বাস্তবমুখী কল্যাণকামিতা যথার্থরূপে তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তোমরা মানুষ হয়ে মানুষেরই দাসত্ব করে চলেছো–এটা তোমাদের জন্যে সবচেয়ে অপমানজনক। সুতরাং তোমরা ফিরে এসো স্বাধীনতার দিকে, ফিরে এসো আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার দিকে। এ কথাটি বোঝানোর জন্যে সর্বপ্রকার উপায় ও উপকরণ ব্যবহার করা দরকার। কেননা বর্তমান বিশ্বের অমুসলিমরা তো দূরের কথা, নামধারী মুসলিম দাবীদাররাও বিষয়টি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ এবং অসচেতন। একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত যে জীবনব্যবস্থার দিকে আমরা মানবজাতিকে আহ্বান করছি তা

সকল দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ও কল্যাণকর। কালের চক্রে মানুষ আজ এই মহাসত্যটিকে ভুলে গেছে। আর এটাও সত্য যে, কস্মিনকালেও এরচেয়ে কার্যকর কল্যাণমুখী কোনো জীবনবিধান অন্য কেউ কখনো উপস্থাপন করতে পারবে না।

ইতিপূর্বেও আমি বলেছি যে, পৃথিবীর কোনো না কোনো ভূখণ্ডে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া শুধুমাত্র সংজ্ঞা আর ওয়ায-নসীহত, আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করার মাধ্যমে কখনোই ইসলামের স্বরূপ মানুষের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। বাস্তবে প্রতিষ্ঠা ছাড়া এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও স্বাদ কিছুতেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই মানবজাতির সামনে ইসলামী সমাজের নমুনা পেশ করতে হলে পৃথিবীর যে কোনো ভূখণ্ডে হোক প্রথমে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী একটি দলকে সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নিকট কিংবা দূর ভবিষ্যতে নির্ভেজাল তাওহীদপন্থী এই প্রকাশ্য বিপ্লবী দলটিই বিশ্ব নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সত্যিকার অর্থে ইসলামী সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে একটি তাওহীদবাদী জানবাজ দলকে জাহেলিয়াতের আগ্রাসী রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, লক্ষ্যস্থল ও গন্তব্য ঠিক করে যাত্রা শুরু করতে হবে। চলতে গিয়ে কোনো পর্যায়েই এই জাহেলিয়াতের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া চলবে না, বরং সর্বাবস্থায় জাহেলিয়াতের পঙ্কিল ছোঁয়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

এই বিপ্লবী দলকে যাত্রা শুরুর আগে তাদের কর্মপরিকল্পনা স্থির করে নিতে হবে, গন্তব্য নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং গন্তব্যে পৌঁছার পথের সঠিক নির্দেশনা, এই পথের গলি, উপগলি চিনে নিতে হবে। এ পথের অনিবার্য বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার জন্যে মানসিকভাবে সর্বাত্মক প্রস্তুতি রাখতে হবে। শুধু এতোটুকুই যথেষ্ট নয়; বরং মানব সমাজের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জাহেলিয়াত কিভাবে তার শেকড় বিস্তার করে রেখেছে তাও জানতে হবে। এই পথে চলতে গিয়ে কোন্ কোন্ ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে হবে তা-ও বুঝে নিতে হবে। জেনে নিতে হবে–কোন পর্যায়ে কার সাথে কতোটুকু সহযোগিতা করা যাবে, কখন কার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে? কখন কাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে? কখন কাকে কাজে

লাগাতে হবে? কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে? যে জাহেলিয়াতকে নির্মূল করার জন্যে এই সংগ্রাম–তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে, কোন পদ্ধতিতে সে মানবসমাজে জেঁকে বসে আছে তা অনুধাবন ও নির্ণয় করতে হবে। কোন পদ্ধতিতে তাকে সহজে কাবু করা যাবে, কোন ভাষায় তার সাথে কথা বলতে হবে, কোন কোন বিষয়গুলো অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ কোত্থেকে কীভাবে গ্রহণ করতে হবে–এর সব কয়টি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নিয়েই এই বিপ্লবী কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের মনোবল ও শক্তির উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। সোনালী যুগের সোনার মানুষদের হৃদয় এই কুরআনের. আলোয় আলোকিত হয়েছিলো। একমাত্র এই কুরআন থেকেই তারা সকল প্রেরণা গ্রহণ করতেন। তাই আমরাও যদি সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই তাহলে আমাদেরও একমাত্র পাথেয় ও পথনির্দেশক হিসেবে কুরআনকেই গ্রহণ করতে হবে।

এই কুরআনের বিপ্লবী মন্ত্রেই সেই সাহাবায়ে কেরাম গোটা বিশ্বব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। আমি এই বইটি রচনা করেছি এই বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রনায়কদের জন্যেই। তাই কুরআনের আলোকেই আমি এখানে এই আন্দোলনের কর্মপন্থা উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি।

আমার লেখা তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' থেকে এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট চারটি অধ্যায়কে কিছুটা পরিবর্তন করে এখানে সংযোগ করে এই বইটিকে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই বইয়ের অন্যান্য অধ্যায় এবং এর ভূমিকা আমি বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে লিখেছিলাম। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের জীবনদর্শন নিয়ে ভাবতে বসে বিভিন্ন সময়ে আমি যে সুগভীর মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেছি–তাই আমি এখানে একত্রিত করেছি। আমার এই বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো কারো কাছে হয়তো অগোছালো ও এলোপাতাড়ি মনে হতে পারে। তবে আমি বিশ্বাস করি, ইসলামী বিপ্লব বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত কর্মীবাহিনীর জন্যে প্রয়োজনীয় অনেক উপায়-উপকরণ ও পাথেয় এখানে পাওয়া যেতে পারে। আমার এই লেখাগুলো এখানেই শেষ নয়, এটি ধারাবাহিক লেখার একটি অংশ মাত্র। আল্লাহ তাআলা যেন ভবিষ্যতে আমাকে এ বিষয়ে আরো লেখার তাওফীক দান করেন এজন্যে আল্লাহর রহমত কামনা করছি, কেননা আল্লাহর রহমতই এ ধরনের কাজের একমাত্র সহায় ও চালিকাশক্তি।

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের বাণীবাহকদের বৈপ্লবিক চরিত্র

ইসলামের বিপ্লবী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে কালেই হোক, যে ভূখণ্ডেই হোক– শুরু করতে হলে, এ পথের মুজাহিদদেরকে অবশ্যই এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ আলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কুরআনই এক সময় এমন এক মানবগোষ্ঠী তৈরি করেছিলো যাদের তুলনা শুধু ইসলামের ইতিহাস কেন, গোটা মানবজাতির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ইসলামি ইতিহাসের সেই সোনালি অধ্যায়ের পর আর কখনোই তাদের মতো যোগ্যতা ও গুণের সমাহার কোনো মানবগোষ্ঠীর মাঝেই পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও দু'একজন মানুষের জন্ম হয়েছে, তবে তাদের মতো উঁচুমানের নৈতিক গুণসম্পন্ন কোনো সুসংগঠিত, সুশৃংখলিত মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেনি। এটা এমন প্রমাণিত, বাস্তব ইতিহাস, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাই বিষয়টির তাৎপর্য ও কারণ সম্পর্কে আমাদের ব্যাপক পর্যালোচনার মাধ্যমে এর রহস্য খুঁজে বের করতে হবে।

তাদের মতো সোনার মানুষ এখন আর নেই কেন

যে কুরআন সেই যুগের জাহেলিয়াতের পঙ্কে নিমজ্জিত মানুষদের আকাশের তারার মতো উদ্ভাসিত একেকজন আলোকিত মানুষে পরিণত করেছিলো, সেই কুরআন তো আজও আমাদের সামনে অবিকৃত ও অবিকল বিদ্যমান। সেই কুরআনের বাহক আল্লাহর নবীর জীবনাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত ইতিহাসও আমাদের জানা। তারপরও বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম জাতির বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই কেন? আমরা কি এ কথা বলতে পারি যে, বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স.) সশরীরে আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই বলে আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না! ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যদি আল্লাহর রাসূলের সশরীর উপস্থিতি এমন অপরিহার্যই হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা বলে ঘোষণা দিতেন না। নবী-রাসূল পাঠানোর ধারা বন্ধ করে দিয়ে এটাকে সকল যুগ ও কালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য একমাত্র জীবনবিধান বলেও ঘোষণা করতেন না।

মূলত এখন রাসূলের (স.) সশরীর উপস্থিতির কোনো প্রয়োজনও নেই; বরং কুরআনের বিদ্যমানতাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল উপায়-উপকরণ ও দিকনির্দেশনা সরবরাহের জন্য

যথেষ্ট। তাই আল্লাহ তাআলা নবীকে জীবিত না রেখে পবিত্র কুরআন অবিকৃত ও অবিকল রেখে হিফাযতের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন এমনভাবে রচনা করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যে কোনো ধরনের সমস্যার বাস্তব সমাধান এর মাধ্যমে সম্ভব। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিবের মাধ্যমে মানবজাতির নিকট এ কুরআন পৌঁছে দিয়ে তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়ে ঘোষণা দেন যে, এ কুরআন তথা ইসলাম মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর থাকবে। রাসূলের শারীরিক অনুপস্থিতি এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।

প্রথম কারণ ঃ সাহাবিদের মতো মানুষ এখন না হওয়ার হেতু খুঁজতে গেলে প্রথমে দেখা যাবে, তারা যে কুরআনের স্বচ্ছ, নির্মল, নির্ভেজাল ঝরনাধারা থেকে তাদের জ্ঞান-পিপাসা মিটিয়েছেন, কালের আবর্তনে সেই ঝরনাধারার সাথে অনেক ভেজাল মিশে গেছে। পুঁথিগতভাবে যদিও এসবের কিছুই মূল কুরআনের সাথে সংযুক্ত হয়নি, কিন্তু মানুষের চিন্তাচেতনায় ঐসব ভেজালের প্রভাব আমরা এখন অস্বীকার করতে পারি না। যে ঝরনাধারা থেকে সেই যুগের সোনার মানুষেরা তাদের জ্ঞান-পিপাসা মেটাতেন, সঞ্জীবনীশক্তি গ্রহণ করতেন, পাথেয় সংগ্রহ করতেন তা হলো পবিত্র কুরআন। কারণ, হাদীস বলতে আমরা যা বুঝি, তা মূলত কোনো উৎস বা ঝরনাধারা নয়, বরং তা হলো ঐ কুরআনী ঝরনারই স্রোতধারা। তাইতো আমরা দেখতে পাই 'আল্লাহর নবীর চরিত্র কেমন ছিলো'—এ প্রশ্নের জবাবে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়শা (রা.) বলেন, 'কুরআনই তাঁর চরিত্র'।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাদের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ গ্রহণ করতেন। তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে কুরআনের ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। কথা হলো—কেন তারা কুরআনকে এভাবে গ্রহণ করতেন? অন্য কোনো সভ্যতা, সাহিত্য, শিক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি না থাকার কারণে বাধ্য হয়েই কি তারা কুরআনকে এমন পরমভাবে গ্রহণ করেছিলেন? কিছুতেই নয়, কস্মিনকালেও এটা সত্য নয়।

প্রকৃত ইতিহাস ঘাটলে দেখতে পাবো, তৎকালীন রোমান সভ্যতা ও রোমান আইনশাস্ত্রকে আজও ইউরোপে সভ্যতার আদি মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সে যুগের গ্রীক যুক্তিবিদ্যা, গ্রীক দর্শন, আর্টসহ সাহিত্যকে আজও পাশ্চাত্যে উন্নত চিন্ত াধারার অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পারস্য সভ্যতা, তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও সে যুগে ছিলো অত্যন্ত সুগঠিত ও ঐতিহ্যবাহী হিসেবে সুপরিচিত। আরবের নিকটে ও দূরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আরো অনেক সভ্যতা তখন বিদ্যমান ছিলো—তাতে চীন ও ভারতের কথাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবের উত্তরে ছিলো রোমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, আর দক্ষিণে ছিলো পারস্য সভ্যতা। সুতরাং, একজন সুস্থ চিন্তার মানুষ একথা বলতে পারে না যে, সাহিত্য, সভ্যতা ও সুগঠিত কোনো ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে সে যুগের মুসলমানরা

কুরআনকে তাদের একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা অনেক ভেবেচিন্তে , বুঝেশুনে বিদ্যমান সব ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে কুরআনকেই তাদের জীবনবিধান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাওরাতের অংশবিশেষ নিয়ে হযরত ওমরের (রা.) আল্লাহর রাসূলের (স) কাছে আসার ঘটনাটি আমাদেরকে আরো সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। তাওরাতের কপি আনতে দেখে আল্লাহর রাসূল (স.) অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত ওমর (রা.)-কে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম, আজ যদি স্বয়ং মুসা (আ.)ও জীবিত থাকতেন তাহলে আমার আনুগত্য তার ওপরও ফরয করে দেয়া হতো।'

এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, মহানবী (স.) তাঁর সাহাবিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের জন্য একমাত্র কুরআনিক নির্দেশনাই কাজে লাগিয়েছেন। কুরআনের বিশুদ্ধ ঝরনাধারা থেকেই জ্ঞানপিপাসা মেটানোর আদেশ দিয়েছেন। সুস্পষ্টভাবে তিনি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এ কুরআনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করতে হবে এবং এ কুরআনের শিক্ষা মোতাবেকই জীবন গড়ে তুলতে হবে। এ কারণে দেখা যায়, ঐশী গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও তাওরাতের দিকে মনোযোগ দেয়ার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি আল্লাহর নবী (স.) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর নবীর একমাত্র চাওয়া পাওয়াই ছিলো এমন একটি সুসংগঠিত, সুসংঘবদ্ধ মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলা-যারা হবে সকল ধরনের হীনম্মন্যতা, কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত; যারা হবে সম্পূর্ণ আল্লাহর রঙে রঞ্জিত একটি বিপ্লবী মানবগোষ্ঠী। আর আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হতে হলে বিশুদ্ধ কুরআনী প্রশিক্ষণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। কেননা, এ কুরআনই হলো সেই মহাগ্রন্থ, যার মাধ্যমে মহান রব্বুল আলামীন সরাসরি তাঁর বান্দাদেরকে প্রশিক্ষণ দান করেন।

আমাদের সবারই জানা যে, সেই মহাভাগ্যবান সোনার মানুষেরা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জীবন-মরণ সবকিছু এ কুরআনী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিলীন করে দিয়ে নিজেদেরকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করেন। পরবর্তী যুগের মানুষেরা এদিক থেকে প্রায় বঞ্চিত এবং বিমুখ। সেই সোনালি যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ পথের পরিচ্ছন্ন স্রোতধারার সাথে কিছু ভেজাল মিশে যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, প্রাচীন উপকথা, ইহুদীদের মুখরোচক গল্পকথা (ইসরাঈলি বর্ণনা), খ্রিস্টানদের কাছে রক্ষিত আসমানী কিতাবের বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত কিছু অংশ ইত্যাদি। পরবর্তীকালের মুফাস্‌সিরিন কেরাম এসব বিষয়গুলোকে তাদের 'স্থূল পাণ্ডিত্যপূর্ণ' আলোচনার অংশে পরিণত করেন। ফলশ্রুতিতে এ অবাঞ্ছিত বিষয়গুলো কুরআনী স্রোতধারার সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। একারণেই পরবর্তী বংশধর বঞ্চিত হয় কুরআনের নির্ভেজাল জ্ঞান থেকে এবং তারা জ্ঞানার্জন করতে থাকে সেসব ভেজাল মিশ্রিত জ্ঞান থেকে। এর স্বাভাবিক পরিণতি হলো, পরবর্তী বংশধরের মাঝে সাহাবিদের মতো চরিত্র ও গুণসম্পন্ন কোনো মানব বা গোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি। আমরা

নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সোনালি যুগের সোনার মানুষদের সাথে চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও গুণগতমানের দিক থেকে পরবর্তীকালের মানুষদের যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে- সেটিই হলো এর প্রধান কারণ। এ কারণেই বিক্ষিপ্তভাবে দু'একজন মানুষ বিভিন্ন যুগে জন্ম নিলেও সমষ্টিগতভাবে সাহাবিদের মতো কোনো মানবগোষ্ঠী পরবর্তীকালে গড়ে ওঠেনি উপরন্তু বিভিন্ন ধরনের অবাঞ্ছিত ও বাতিল সংমিশ্রণের ফলে যেসব 'মনগড়া ইলম' তৈরি হয় তাতে ইসলামের আসল রূপ চেনা কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় কারণঃ এ ব্যাপারে অন্য একটি কারণও আমরা কোনোভাবে অবহেলা করতে পারি না। কারণটি বের করতে হলে আমাদেরকে দেখতে হবে প্রথম যুগের মানুষের জীবনে কুরআনের সাথে তাদের সম্পর্কের ধরন কী ছিলো; কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি কী ছিলো? এক্ষেত্রে পরবর্তীকালের মানুষের সাথে প্রথম যুগের মানুষের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, সাহাবায়ে কেরাম কখনো হাফেয, মাওলানা, ক্বারী, ইমাম, খতীব, মোল্লা, মৌলভী ইত্যাদি হওয়ার জন্য কুরআন পড়েননি। কিংবা নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানার্জন, বৈজ্ঞানিক তথ্যের মূলসূত্র অনুসন্ধান, আইনশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ–এক কথায় নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো প্রয়োজন বা চাহিদা মেটানোর জন্য কুরআন পড়েননি; বরং বাস্তব জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোন বিষয়ে কী বিধান নাযিল করেছেন, তা জেনে সেভাবে জীবন পরিচালনার জন্যই তারা কুরআন পড়তেন। যুদ্ধের ময়দানে একজন সৈনিক যেভাবে কমান্ডারের প্রতিটি হুকুম জীবনবাজি রেখে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, ঠিক তেমনিভাবে সাহাবিগণও কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ পালন করতেন। এমন ঘটনাও রয়েছে যে, কেউ কেউ দশটি আয়াতের বেশি একসাথে পড়তেন না। কারণ, তারা জানতেন যে, একসাথে অনেক সংখ্যক বিধি-নিষেধের বোঝা বহন করা দুরূহ ব্যাপার। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) একটি বর্ণনার মাধ্যমে এ তথ্যটি আমরা জানতে পারি।

'কুরআনের বিধান এসেছে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য'–এ চেতনাই তাদের নৈতিক উন্নতি ও বাস্তবমুখী জ্ঞানের পথ সুগম করে দিয়েছিলো। তাঁরা যদি নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানার্জন, তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ, কিংবা হাফেয, মাওলানা, ক্বারী, খতীব ইত্যাদি নাম ধারণের জন্য কুরআন অধ্যয়ন করতেন তাহলে এ নৈতিক উন্নতির পথে তারা অগ্রসর হতে পারতেন না।

তাছাড়া 'কুরআন এসেছে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য' এ উপলব্ধিই তাদেরকে কুরআনের বিধিবিধান জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ করে দিতো। ফলে তারা চালচলন, আচার-আচরণ, লেনদেন তথা সার্বিক জীবনে কুরআনকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করতেন যে কারণে তারা কুরআনের এক একটি বাস্তব দৃষ্টান্তে পরিণত হতেন। তাদের কাছে ঈমান কোনো পণ্ডিতের জটিল বাক্য কিংবা কুটিল সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত বিষয় ছিলো না। ছিলো না বই-পুস্তকে লেখা নিছক জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বিষয়। ছিলো না শুধু অন্তরে ধারণকৃত নিছক উপলব্ধির ব্যাপার; বরং ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সার্বিক জীবনের আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের নাম ছিলো ঈমান।

কুরআনের হুকুম-আহকাম যারা নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অধ্যয়ন করে না, কুরআন কখনোই তাদের জন্য লুক্কায়িত জ্ঞানভাণ্ডার খুলে দেয় না। কুরআনকে যারা নিছক পুঁথিগত তাত্ত্বিক আলোচনা, একই শব্দের বিভিন্ন অর্থবোধক এক অসাধারণ গ্রন্থ, সাহিত্য চর্চা, পৃথিবীর আদি ইতিহাস জানার নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র কিংবা নিছক সুর করে পড়ার একটি গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা কুরআনের সাথে যথার্থ আচরণ করেন না। কুরআন এমন কোনো গ্রন্থ নয়। কুরআন একটি জীবন্ত ও সার্বজনীন জীবনবিধান। কুরআনি আইন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহর দরবারে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ করবে–কুরআন এজন্যই এসেছে। একারণেই আল্লাহ তাআলা সমগ্র কুরআন একত্রে নাযিল করেননি; বরং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে ধাপে ধাপে নাযিল করেছেন।

"আমি কুরআনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছি, যাতে তুমি ক্রমে ক্রমে তা মানুষের সামনে পড়তে পারো–আর (এ কারণেই) আমি তা পর পর নাযিল করেছি।"

(সূরা বনী ইসরাঈল, ১০৬)

ক্রমবিকাশমান ইসলামি সমাজের নতুন নতুন সমস্যার প্রেক্ষিতে, মানুষের চিন্তাচেতনার পরিবর্তনের ধারার সাথে সংগতি রেখে, সমাজজীবনের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষ ঘটনা, বিশেষ প্রশ্নের জবাব কিংবা বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জরুরী দিকনির্দেশনাসহ এক বা একাধিক আয়াত নিয়ে বিভিন্ন সময় আল্লাহর দূত জিবরাঈল (আ.) এসেছেন। বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে মানুষের মনে উদিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়াও ছিলো কুরআনের একটি বিশেষ দিক। মানুষের জীবনে যেসব দোষত্রুটি, ভুলভ্রান্তি রয়েছে, সেগুলোকে হাতে-কলমে ধরিয়ে দিয়ে তা সংশোধনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণের কথা বলতে কুরআন এসেছে।

এ কারণেই সে সময়ের মুসলমানরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাদের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি চিন্তা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সার্বক্ষণিক তদারকিতেই সংঘটিত হচ্ছে এবং তাদের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর রহমতের ছায়ায় অতিবাহিত হচ্ছে। দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে গভীর ও সার্বক্ষণিক সম্পর্কের অনুভূতিই তাদেরকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার অদম্য সাহস ও আগ্রহ জুগিয়েছিলো।

এভাবেই (খায়রুল কুরূন) সোনালি যুগের সোনার মানুষেরা নিজেদের জীবন কুরআনিক ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পরবর্তীকালের মুসলমানরা কুরআনকে নিছক জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক আলোচনা, বিজ্ঞানের তথ্যসূত্র, তর্ক-বিতর্ক, ফিকহী জটিলতার দুর্ভেদ্য জাল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও নিছক ওয়ায-মাহফিলের বিষয়ে পরিণত করে ফেলে। এ কারণেই কুরআন অবিকৃত অবস্থায়

বিদ্যমান থাকা এবং কুরআনের যথেষ্ট পাঠ হওয়া সত্ত্বেও সেই ধরনের আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠেনি।

তৃতীয় কারণঃ তৃতীয় যে কারণটি আমরা খুঁজে পাই, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে যে ব্যক্তি কুরআনের ছায়াতলে আসতেন, তিনি পূর্বেকার জাহেলি জীবন ও জাহেলি সমাজব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করেই আসতেন। কুরআনের ছায়াতলে এসে সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু করতেন। জাহেলি সমাজের সদস্য থাকায় তিনি যে পাপ-পঙ্কিল পথে চলেছেন সেজন্য হৃদয়ের গভীর থেকে প্রচণ্ড অনুতাপ-অনুশোচনা বোধ করতেন। কোনো অবস্থায়ই যে আর জাহেলি সমাজ ও তার নেতৃত্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না–তা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করতেন। মানবীয় দুর্বলতার কারণে, জীবনের কোনো ঘূর্ণিপাকে বা কোনো প্ররোচনায় পড়ে কখনো যদি ভুল করে কোনোরকম জাহেলি আচরণ করে ফেলতেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ-অনুশোচনায় উৎকণ্ঠিত ও অনুতপ্ত হয়ে উঠতেন এবং ক্ষণকাল বিলম্ব না করে কুরআনের ছায়ায় আশ্রয় নিতেন।

এভাবে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার গতি জাহেলিয়াত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে কুরআনমুখী হয়ে যেতো। জাহেলিয়াত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ও কুরআনি বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ এ কারণেই তাদের পক্ষে সম্ভব হতো যে, তারা ভেবেচিন্তে, বুঝেশুনে মহান রব্বুল আলামীনের পথে নিজেকে কোরবানী করে দেয়ার মানসিকতা নিয়েই ইসলামে প্রবেশ করতেন। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, তারা মুশরিকদের সাথে লেনদেন, বেচাকেনা, দেখা-সাক্ষাৎ সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে অরণ্যে চলে যেতেন। কেননা, বৈষয়িক সম্পর্ক ও আদর্শিক ঐক্যবদ্ধতা সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি বিষয়। জাহেলি সমাজ ও তাদের চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মূল অর্থ হলো শিরকবাদী সমাজ ও আদর্শের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাওহিদভিত্তিক জীবনাদর্শ গ্রহণ এবং নতুন ইসলামি সমাজের আনুগত্য মেনে নেয়া। ইসলাম গ্রহণের অর্থই ছিলো এক নতুন জীবনবিধানের সাথে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া এবং সকল প্রকার অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে উঠে এসে এক আলোকিত জীবনে পদার্পণ করা।

ইচ্ছে করলেই যে কেউ এ আলোকিত জীবনের পথে পা বাড়াতে পারতো, জাহেলিয়াত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারতো–এমনটি ভাবার কোনো অবকাশ নেই। ইসলামের পথে পা বাড়াবার অর্থই ছিলো জাহেলি সমাজের নিষ্ঠুর ও নির্মম যুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়া। কেউ এ পথে অগ্রসর হলেই তার ওপর নেমে আসতো চরম অত্যাচার। এতোদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচিত আপনজনরাও হঠাৎ হয়ে উঠতো অন্য চেহারার মানুষ। বহুদিনের পরিচিত সমাজ, হাট-ঘাট সবকিছু তাদের ওপর সঙ্কুচিত হয়ে আসতো। চতুর্মুখী বিভীষিকাময় নির্যাতন ও আগ্রাসনের মুখে পড়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েই এ পথে তারা অগ্রসর হতেন। এমনকি মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে এ সোনার মানুষেরা সত্যকে গ্রহণ করেছেন। কোনো কিছুই তাদের সংকল্পে সামান্য ফাটল ধরাতে পারেনি।

আমাদের অবস্থান ও করণীয়

মুষ্টিমেয় যে সব লোককে আল্লাহ তাআলা হিফাযত করেছেন, তারা ব্যতীত বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা আজ জাহেলিয়াতের পংঙ্কে নিমজ্জিত। আরো ভয়ংকর ব্যাপার হলো যে, তৎকালীন জাহেলিয়াতের রূপ ছিলো খোলামেলা ও প্রকাশ্য, যা চিহ্নিত করা তেমন কঠিন বিষয় ছিলো না। কিন্তু বর্তমান জাহেলিয়াত অত্যন্ত জটিল ও কুটিল, যা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা আলেমগণও এর স্বরূপ উদঘাটন করতে সক্ষম হচ্ছেন না; বরং অনেকক্ষেত্রে তারাও এর আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। আমাদের চিন্তা-চেতনা, রীতিনীতি; চালচলন, তথা সমাজনীতি, রাজনীতি ও সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা জাহেলিয়াতের ঘোর আঁধারে নিমজ্জমান। এমনকি সমাজের অধিকাংশ মানুষ-যেসব কার্যাবলী ইসলামি সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আকিদা বিশ্বাস বলে পালন করে–তার অধিকাংশই জাহেলিয়াত দ্বারা পরিদুষ্ট। এ জাহেলিয়াত মিশ্রিত ইসলাম লালন-পালনের কারণেই আমাদের মন-মগজে ইসলামের সঠিক চেতনা জাগছে না এবং সমাজে সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটছে না। সুতরাং, আমরা যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করতে চাই, তাহলে সমাজের সব রকম জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হতে হবে। জাহেলিয়াত থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে এবং ষড়যন্ত্রমূলক জ্ঞান-গবেষণা বর্জন করতে হবে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল থেকে নির্দেশনা ও প্রেরণা নিতে হবে। এ উৎস থেকেই সৃষ্টিলোকের প্রকৃতি এবং একচ্ছত্র সার্বভৌম স্রষ্টার সাথে মানবজাতি ও অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্ক কী, তা নির্ণয় করতে হবে আর জানতে হবে আমাদের সমাজ, সরকার ও দেশ পরিচালনার নিয়মকানুন।

ভ্রান্তিপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা, বাহাস-মোবাহাসা, তর্কবিতর্ক কিংবা বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে নয় বরং 'আল্লাহর নাযিল করা বিধান জেনে আমরা সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করবো' এ উদ্দেশ্যেই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কুরআন আমাদেরকে যেমন ছাঁচে গড়তে চায়, আমরা নিজেদেরকে তেমন ছাঁচেই গড়ে তুলবো। এ দিকগুলো যদি আমরা যথাযথ বজায় রাখতে পারি তবেই আমরা কুরআনের ভাষাশৈলী, সাহিত্য সৌন্দর্য, উপস্থাপনরীতি, সম্মোহনীশক্তি, বৈজ্ঞানিক তথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা চালানোর নীতিগত অধিকার অর্জন করি। মনে রাখতে হবে, আমরা এগুলোর মাধ্যমে জীবন চলার পথে অনেক সহযোগিতা ও কল্যাণ পেতে পারি, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ঠিক না রেখে শুধু এ ধরনের গবেষণা কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না।

কুরআন থেকে আমাদের জানতে হবে, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কোন ধরনের জীবনবিধান দিয়েছেন; সৃষ্টিজগতের সাথে আমাদেরকে কেমন সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন; কোন ধরনের নীতি-নৈতিকতা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানবতার জন্য কোন ধরনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন। এ বাস্তব অনুশীলনের সাথে সাথে বর্তমান সমাজের সকল ধরনের জাহেলি চিন্তাধারা ও সামাজিক রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। বিদ্যমান

জাহেলি সমাজের প্রতিষ্ঠিত জাহেলি নেতৃত্বের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। কেননা, যে ব্যক্তি ইসলামের পবিত্র সুশীতল ছায়ায় জীবন যাপন করতে চায় সে কখনোই জাহেলি সমাজ ও তার পৃষ্ঠপোষক নেতৃত্বের সাথে আপোষমূলক সহাবস্থান করতে পারে না। জাহেলিয়াতের সাথে আপোষ করে তাকে খুশি রেখে তার অধীনে জীবন যাপন করা কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিজের জীবনের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেহেতু বিক্ষিপ্ত সামান্য কোনো পরিবর্তন নয়, বরং সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন; তাই আমাদেরকে গোড়া থেকেই এ পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে। কারণ, যে ভ্রান্ত মতবাদের ওপর ভিত্তি করে এ সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেখানে জাহেলিয়াতনির্ভর মতবাদ থাকার কারণে সমাজের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ জাহেলিয়াতের প্রভাব পড়ছে এবং বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিক নির্যাতনের মাধ্যমেও সমাজের মানুষের ওপর এ ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত জাহেলি নেতৃত্বের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই জনসাধারণকে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

এ সমাজ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা নিজেদেরকে জাহেলি সমাজ, ও এর চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ থেকে মুক্ত করবো। দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে, আমরা কোনো অবস্থাতেই জাহেলি সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের সাথে আপোষ করার জন্য আমাদের আদর্শে ও মূল্যবোধে কোনোরকম নমনীয়তা প্রদর্শন করতে পারবো না। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের গন্তব্য আর এ জাহেলি সমাজের গন্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। আমরা যদি কোনো অজুহাত দেখিয়ে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে একই পথে চলতে শুরু করি তাহলে কখনোই আমরা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো না। যথেষ্ট ভেবেচিন্তে, বুঝেশুনে এ রক্তপিচ্ছিল পথে আমাদের পা বাড়াতে হবে। কেননা, এটি ইতিহাসের এক মহাসত্য যে, এ পথে যখনই কেউ পা বাড়িয়েছে, তখন হাজারো বাধাবিপত্তি, দুঃখকষ্ট, যুলুম-নির্যাতন তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় মনযিলে মাকসুদে পৌঁছুতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোচ্চমানের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যারা দেখাতে পেরেছেন, সেই জানবায মাযলুমদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মনে রাখতে হবে, তাদের সেই সংগ্রাম এবং আমাদের সংগ্রাম এক ও অভিন্নসূত্রে গাঁথা। সুতরাং, বাধাবিপত্তি যুলুম-নির্যাতনের মুখে পিছিয়ে গেলে কখনোই এ সংগ্রাম সফলতার মুখ দেখবে না। যে রক্তপিচ্ছিল পথ আমরা বেছে নিয়েছি, সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

কোন পথে আমরা যাত্রা শুরু করলাম, কোথায় আমাদের গন্তব্য, জাহেলিয়াতের অন্ধকার পথ পাড়ি দিয়ে ইসলামের আলোকিত রাজপথে পৌঁছুতে কোন কোন অন্ধগলি আমাদের অতিক্রম করতে হবে, এ আলোকিত রাজপথের মিছিলে ইতিপূর্বে যারা চলেছেন তারা কীভাবে সফলতা অর্জন করেছিলেন–এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই এ মিছিলে শামিল হতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মক্কী যুগে কুরআনের মৌলিক বিষয়সমূহ

রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ (স.)-এর প্রাথমিক জীবনে অর্থাৎ মক্কী জীবনে কুরআনের একটি বিরাট অংশ নাযিল হলেও তার পুরোটাই ছিলো মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, একেক স্থানে একেক ধরনের বর্ণনাভঙ্গিতে বিষয়টি উপস্থাপনের কারণে বারবার একই বিষয়ের আলোচনা সত্ত্বেও প্রতিবারই শ্রোতাদের মনে হয়েছে যে, বিষয়টি এ বুঝি প্রথম আলোচনা করা হলো। বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে একই বিষয়ের অবতারণার কারণ হলো, এ বিষয়টিই ইসলামি জীবনব্যবস্থার মৌলিক বিষয়। আর সে বিষয়টি হলো 'বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার সাথে মানবজাতির সম্পর্ক'।

ভৌগলিক সীমারেখা পেরিয়ে আরব-অনারব নির্বিশেষে যুগের গণ্ডি ছাপিয়ে সর্বকালের মানুষের সামনেই প্রশ্নটি তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি সবার জন্য অভিন্ন হওয়ার কারণ হলো, মানব-মনের এমন কিছু মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে- যা জাতি, গোত্র, বর্ণ, ভূখণ্ড নির্বিশেষে সকলের কাছেই সমান। তন্মধ্যে অন্যতম কয়েকটি প্রশ্ন হলো, সৃষ্টিজগতে মানবজাতির অস্তিত্ব কীভাবে এলো, কোত্থেকে তার যাত্রা শুরু, কোথায় তার গন্তব্য, সৃষ্টিজগতের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে মানবজাতির অবস্থান কেমন, দায়িত্ব কী এবং মর্যাদা কোন স্তরের? সৃষ্টিকর্তার সাথে মানবজাতির সম্পর্ক কোন সূত্রে গাঁথা? ইত্যাদি...। এসব প্রশ্ন মানুষের অস্তিত্বের সাথে বিজড়িত।

এ কারণে রাসূলের (স.) মক্কী জীবনে কুরআনের যে অংশ নাযিল হয়েছে তাতে সৃষ্টিজগতের মাঝে লুক্কায়িত অনেক সুপ্ত রহস্যের জট খুলেছে। মানুষের পরিচয় কী? কোত্থেকে সে এলো? কেন এলো? কোথায় যাবে? শূন্য থেকে কে তাকে অস্তিত্বে আনলো?

কুরআন নাযিলের প্রথম দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ ধরনের মৌলিক বিষয়গুলো নাযিল করা হয়েছে। সৃষ্টিজগতের এমন কিছু দিক নিয়েও কুরআন আলোচনা করেছে, যেগুলোর অস্তিত্ব দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে অনুভব করা যায়। এছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তিক এমন কিছু বিষয়ে মানুষের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যা চিন্তার জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। যেমন, এ বিশ্বজগত কে সৃষ্টি করলেন? কে নিয়ন্ত্রণ করছেন এ সৃষ্টিজগত? কে পালাক্রমে দিন-রাতের আবর্তনের ব্যবস্থা করছেন?

কে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রগুলোকে নিয়মমাফিক পরিচালনা করছেন ..... ইত্যাদি। প্রশ্ন করে করে মানুষকে চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে দিয়েই কুরআন বিদায় নেয়নি; বরং এগুলোর অনস্বীকার্য উত্তরও দিয়েছে এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উপায়ও বলে দিয়েছে। এটিই সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যার ওপর মানবজাতিসহ গোটা সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব টিকে আছে।

যেহেতু মানবজীবনের অন্যান্য সকল বিষয়ের সকল প্রশ্ন এ মৌলিক বিষয়টি থেকে উৎসারিত, তাই মক্কী জীবনের তেরটি বছরের এক দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ মৌলিক বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কুরআন মক্কী জীবনে এ মৌলিক প্রশ্নের সীমানা ডিঙ্গিয়ে যৌগিক বা আনুষঙ্গিক কোনো বিষয়ের অবাঞ্ছিত অবতারণা করেনি। সর্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানতেন যে, একটি মানবশ্রেণীর হৃদয়ে ঈমানকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে আনুষঙ্গিক কোনো বিধিবিধান দেয়া কিছুতেই সংগত হতে পারে না। কারণ, যে দলটি আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার কঠিন সংগ্রামের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে, তাদের অন্তরে মজবুত ঈমানের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। যারা দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার করতে চান এবং এ জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান. তাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মক্কী জীবনের দীর্ঘ তেরটি বছর কুরআন শুধু ঈমানের দাওয়াতই দিয়েছে, কেবল ঈমানের রূপরেখাই তুলে ধরেছে; কোনো ধরনের আইনকানুন বা বিধিবিধান প্রণয়ন করেনি।

আল্লাহর পথে আহ্বান

কোনো মানবীয় বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে নয়; বরং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই তাঁর নবীকে প্রাথমিক পর্যায়ে দাওয়াতী কার্যক্রম শুধু আকিদা বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো। তাই আল্লাহর নবী প্রাথমিক পর্যায়ে দাওয়াত শুধু কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। সাথে সাথে মানুষের কাছে সত্যিকার মাবুদের যথার্থ পরিচয় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ গোলামীর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। মানবীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানে হয়তো মনে হতে পারে যে, এ ছোট্ট একটি বাক্য প্রথমে আরবদের চিন্তার জগতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে বাস্তব কথা হলো, শাব্দিক উচ্চারণের মাধ্যমে এ কালেমা অনারবদের মনে প্রভাব বিস্তার যদিও কিছুটা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ব্যাপার, তবে আরবদের নিজস্ব মাতৃভাষার শব্দ 'ইলাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিপ্লবী ঘোষণাটি অনুধাবন করতে মোটেই কসরত করতে হয়নি। কেননা এটা তাদের মাতৃভাষা আরবীর অতি প্রচলিত একটি শব্দ। তারা ভালো করেই জানতো

যে, 'উলুহিয়্যাত' বলতে বুঝায় একচ্ছত্র অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব এবং এ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতি নিবেদন করার অর্থই হলো তাদের ধর্মীয় নেতা, পীর-পুরোহিত, গোত্রীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ধনী শাসকদের থেকে সকল প্রকার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে এনে একমাত্র আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। এর অনিবার্য ফল হলো, মানুষের সকল কাজে-কর্মে, চিন্তা-চেতনায়, বিচার-আচারে, লেনদেনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক–তথা মানুষের দেহ ও আত্মার সবটুকু জুড়ে আল্লাহর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার। তারা জানতো যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' এ ঘোষণা দেয়ার অর্থ হলো, বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা ও তার নেতৃত্বের সামনে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া এবং প্রতিষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করা। তাদের মাতৃভাষায় উচ্চারিত কালেমার তাৎপর্য এবং বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার ওপর তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তারা মোটেই অজ্ঞ ছিলেন না। তাই তো যারাই এ বিপ্লবী ঘোষণা দিয়েছেন তাদের প্রতি সমাজের নেতৃস্থানীয়দের পক্ষ থেকে যুলুম-নির্যাতনের খড়গহস্ত নেমে এসেছে। শুরুতেই সমাজে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগার মতো, সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার মতো এ পদ্ধতিতে কেন আল্লাহ তাআলা এ মহান দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত দিলেন, তা আমাদেরকে অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে। জানতে হবে যে, প্রথমে কেন আল্লাহ তাআলা এ বাণীকে এমন বাস্তব পরীক্ষার মুখোমুখি করলেন?

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

বিকল্প কোনো সহনীয় পদ্ধতিতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে আস্তে আস্তে প্রস্তুত করে এ বাণী প্রচারের নীতি অবলম্বন করলে আরব জাতীয়তাবাদের চেতনাকে একটা মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতো। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন রিসালাতের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন তখন আরবদের অধিকাংশ ভূমি ও সম্পদই ছিলো রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত। উত্তরের সিরিয়া অঞ্চল ছিলো রোমানদের এবং দক্ষিণে ইয়েমেন ছিলো পারস্য সাম্রাজ্যের জবর দখলে। স্থানীয় কিছু মেরুদণ্ডহীন আরব নেতারা পারস্য সাম্রাজ্যের গোলামী করে ওই এলাকা শাসন করতো। মরুভূমির কয়েকটি অনুর্বর অঞ্চল যেমন, নজদ, হেজায ও তেহামানামক অঞ্চলগুলো ছিলো আরবদের কর্তৃত্বাধীন। এরও সামান্য কয়েকটি বাগান ছাড়া প্রায় গোটা এলাকাই ছিলো ধু ধু বালুকাময় মরুভূমি।

অপরদিকে মুহাম্মদ (স.)-এর জনপ্রিয়তা, নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ছিলো সে অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা সবার কাছে স্বীকৃত সত্য। তারা তাঁকে 'আল আমীন' ও 'আস সাদীক' (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। তাঁর জনপ্রিয়তা ও নির্ভরযোগ্যতা এমন স্তরে পৌঁছেছিলো যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পনের বছর পূর্বে কাবা চত্বরে হাজরে আসওয়াদ প্রতিষ্ঠা নিয়ে গোত্রীয় কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌঁছলে

মীমাংসার জন্য তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে সালিস মেনেছিলো। তাছাড়া বংশীয় দিক বিবেচনায়ও তিনি ছিলেন কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী শাখা বনু হাশিমের সদস্য। সুতরাং, এটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, তিনি জাতীয়তাবাদী ঘোষণার মাধ্যমে অতি সহজেই আরবদের নিজস্ব প্লাটফর্মে একত্রিত করে ফেলতে পারতেন। গোত্রীয় কলহ-বিবাদে, নিজেদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। ফলে মহানবীর (স.) ডাকে যে তারা স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিতো এটা খুবই যৌক্তিক ব্যাপার। পরস্পরে যুদ্ধ করে অশান্তির আগুনে ঝলসিত আরবদের মাঝে ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক সংহতি গড়ে তুলে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য দখল করা এবং আরবভূমি পুনরুদ্ধার করে একটি সম্মিলিত আরবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই কঠিন বিষয় ছিলো না। সুদীর্ঘ তেরোটি বছর অমানুষিক যুলুম-নির্যাতন সহ্য করার ঝুঁকিপূর্ণ পথে না গিয়ে জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে অতি সহজেই মুহাম্মদ (স.) তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আরবদের সমর্থন আদায় করতে পারতেন। এভাবে তাদের হারানো ভূমি উদ্ধার করে, তাদেরকে তাঁর নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার পর জনগণকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিতে পারতেন। ইতিমধ্যে আরবদের ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক কারণে তাঁর নির্দেশিত মতাদর্শ অনুযায়ী আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নিতে তারা বাধ্য হতো। মানবীয় জ্ঞানের এটাই স্বাভাবিক বিশ্লেষণ।

কিন্তু সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে এ পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেননি; বরং চরম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে প্রকাশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিপ্লবী ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব ধরনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে তা অস্বীকার করার নির্দেশ দেন এবং তাঁকে (স.) ও তাঁর মুষ্টিমেয় সাথীকে ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলার নির্দেশ দেন। আমাদেরকে জানতে হবে, সহজসাধ্য পথ বাদ দিয়ে কেন এ ঝুঁকিপূর্ণ পথের দিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর এ মুষ্টিমেয় ক'জন বান্দাকে ঠেলে দিলেন। আল্লাহর প্রিয় হাবীব ও তাঁর সাথীদেরকে কি তিনি অযথাই যুলুম-নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিয়েছেন? না। তা কিছুতেই হতে পারে না।

এর কারণ হলো, সকল জ্ঞানের আধার আলিমুল গায়িব আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। কেননা, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের নিপীড়ন থেকে তাদেরকে মুক্ত করে আরব্য নির্যাতন প্রবর্তন করা এ সংগ্রামের উদ্দেশ্য নয়। এ জিহাদের উদ্দেশ্য ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা হলো তাওহিদের আলোর মাধ্যমে শিরক ও জাহেলিয়াতের পঙ্কিল অন্ধকার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করা। এ পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া একমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না এবং এ পৃথিবী অন্য কোনো উপায়ে পবিত্র হতে পারে

না। কেননা মানুষ তো শুধু আল্লাহরই দাস। তাই কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র সর্বাত্মক চেতনার অধীনেই আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

কথা হলো, আজকাল আমরাও তো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দিই। এমন মানুষের সংখ্যা মোটেই কম নয় যারা প্রতিদিন শত সহস্রবার এ কালেমা পাঠ করেন, সকাল সন্ধ্যায় সজোরে এ যিকির করেন, কিন্তু তারপরেও আমাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই কেন? আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই কেন? এর কারণ হলো, আমরা এ কালেমার মর্মবাণী উপলব্ধি করতে শিখিনি। এ কালেমা আমাদের কাছে কী চায়? এ কালেমার গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে আমরা যথার্থ জানি না। তাই চিৎকার করে কালেমা পাঠ করে করে গলা ভেঙ্গে যাচ্ছে; অথচ আমাদের ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, কোনো ক্ষেত্রেই এর কোনো প্রভাব পড়ছে না। কিন্তু আরবের অবস্থা এমন ছিলো না। আরবি মাতৃভাষা হওয়ায় তারা এ কালেমার মর্ম পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন পূর্ণাঙ্গরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে। এ কালেমার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক হতে পারে না। কোনো মানুষ মানুষের জন্য নিরঙ্কুশ আইন প্রণেতা হতে পারে না এবং কোনো মানুষের ওপর কোনো মানুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব চলতে পারে না। সকল কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন। মানুষের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি হলো ঈমান। এ মহাসত্যটি প্রথম থেকেই মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিবার্য। তাই আল্লাহ তাআলা এ কালেমা ঘোষণার মাধ্যমে দাওয়াতী অভিযান শুরুর নির্দেশ দেন।

অর্থনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) যখন নবুওয়াত পেয়েছিলেন সে সময়ে আরব অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুবিচার বলতে কিছুই ছিলো না। ছিলো না সম্পদের সুষম বণ্টনের সামাজিক এনতেজাম। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা গোটা ব্যবসাবাণিজ্য, ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রেখে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে জীবনযাত্রার ন্যূনতম সুযোগসুবিধা থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিলো। সে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব, নেতৃত্ব ও মানসম্মান সবই নির্ভর করতো অর্থের ওপর। সমাজের বৃহত্তর অংশের সাধারণ মানুষেরা শুধু ধন-সম্পদ থেকেই বঞ্চিত নয়; বরং মানবিক মর্যাদা থেকেও ছিলো বঞ্চিত। এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা কোনো অবাস্তব যুক্তি নয় যে, শোষিত, বঞ্চিত সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, ধনীদের সম্পদ ছিনিয়ে এনে দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে তা বণ্টন করে দেয়ার সংগ্রাম শুরু করে অতঃপর সমাজের সবচেয়ে বৃহৎ অংশের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে তিনি তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। এতে গোটা আরব সমাজ দু'টো দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেও সমাজের বৃহত্তম বঞ্চিত জনগোষ্ঠী আন্দোলনের সপক্ষেই থাকতো। কেননা, তারা এ বিত্তশালী পুঁজিপতিদের হাতে দীর্ঘদিন ধরে শোষিত হয়ে

আসছে। এ মানবীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য সহজ পন্থা অবলম্বন না করে কেন সরাসরি আপসহীন তাওহিদের বাণী প্রচারণায় নেমে যুলুম-নির্যাতন ও বাধাবিপত্তির পথ বেছে নিলেন? অথচ এর কারণে সমাজের হাতেগোনা সত্যানুসন্ধিৎসু কতিপয় সাহসী লোক ছাড়া এ আহ্বানে তেমন কেউ সাড়া দেয়নি। অথচ অর্থনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের বিরাট একটি অংশকে নিজের নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসার পর যদি নবুওতি দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাওহিদি প্রচারণা শুরু করতেন, তাহলে বরেণ্য নেতা হিসেবে মুহাম্মদ (স.)-এর মতাদর্শ অনুযায়ী আল্লাহর একত্ববাদকে তারা মেনে নিতো এবং নিজেদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে সঁপে দিতো।

কিন্তু বাস্তব সত্য হলো–সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে এ পথেও পরিচালিত করেননি। আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ পথটিও সঠিক নয়। আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত হলো, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই এ তাওহিদি মিশনের যাত্রা শুরু হতে হবে। প্রথমে সবাইকে আল্লাহর ফায়সালা দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিতে হবে। প্রত্যেকের মনে এ কথা বদ্ধমূল হতে হবে যে, মানবজাতির জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানের কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি শ্রেণীর পুঁজিপতি বিত্তশালী হওয়া, আর অন্য শ্রেণীর শোষিত বঞ্চিত হওয়া কিছুতেই ইসলামের নীতি ও আদর্শের সমর্থনযোগ্য নয়। এ ধরনের সকল অপরাধের মূল উৎস হলো আল্লাহর আইন-বিধানের অস্বীকৃতি ও তার অনুশীলন না করা। যে সমাজে আল্লাহর আইনকে সর্বোচ্চ আইন বলে স্বীকৃতি দেয়া হয় না সেই সমাজে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির প্রচলন হবে, অধিকাংশ মানুষ শোষিত বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করবে–এটাই স্বাভাবিক।

আন্দোলন সূচনার পদ্ধতি

আন্দোলন সূচনার এ প্রেক্ষাপট নিয়ে ভাবতে হলে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মানবিক ও নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অধঃপতিত একটি জাতির মাঝেই রাসূলুল্লাহ (স) কাজ শুরু করেছিলেন। প্রাচীন গোত্রীয় সংস্কৃতি হিসেবে কদাচিৎ দু'একটি ভালো কাজ ছাড়া সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজটাই ডুবে গিয়েছিলো পাপ-পঙ্কিলতার অতল গভীরে। যুলুম-নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, অনাচার, অবিচার ছিলো সেই সমাজের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক চিত্র। সে দৃশ্য চিত্রায়ণ করতে গিয়ে কবি জুহাইরী বলেন, 'যার হাতে অস্ত্র নেই মৃত্যু তার অনিবার্য পরিণতি' অর্থাৎ যে যুলুম করবে না তার জন্য মাযলুম হওয়া অবধারিত।

জাহেলি যুগের আরেকটি প্রথা হলো, 'যালিম মাযলুম যেই হোক না কেন গোত্রীয় ভাইকে সাহায্য করবে'।

মদ্যপান আর জুয়ার আড্ডা ছিলো তাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক রুটিন। শুধু তাই নয়, এসব বদঅভ্যাস নিয়ে লোকেরা রীতিমতো গর্বও করতো। মদ জুয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি। ব্যভিচার সমাজে এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, এ জঘন্য কাজটা করে কেউ সামান্যতম অস্বস্তি, অনুতাপ বা অনুশোচনা না করে বরং ব্যভিচার নিয়ে গর্ব করতো। সমাজের এ দিকটিকে তুলে ধরতে গিয়ে হযরত আয়শা (রা) বলেন,

'জাহেলি সমাজে সাধারণত চার পদ্ধতির বিবাহ প্রথা চালু ছিলো। এক ধরনের বিয়ে এখনকার মতো স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হতো। পাত্রের পক্ষ থেকে পাত্রীর অভিভাবকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিতো এবং কিছু উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সামাজিকভাবে বৌ ঘরে তুলতো।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছিলো–সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান লাভের জন্য স্ত্রীকে অন্যের সাথে সহবাস করতে বাধ্য করা। অর্থাৎ, স্বামী স্ত্রীকে তার দুটি ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট কোনো উচ্চবংশের লোকের সাথে যৌন মিলন করতে বলতো এবং এ সময়ে আসা গর্ভের সন্তান যে সেই সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যক্তির, তা নিশ্চিত করার জন্য এ সময়ে সে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলন করতো না। গর্ভ নিশ্চিত হওয়ার পর মেলামেশা শুরু করতো।

তৃতীয় পদ্ধতি ছিলো আজকালকার পতিতাবৃত্তির মতোই। অনেকে একজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করতো এবং এতে মহিলার যদি কোনো সন্তান হতো তাহলে মহিলাটি তার সাথে যারা ব্যভিচার করেছে তাদের সবাইকে ডাকতো। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সামাজিক প্রথাই এমন ছিলো যে, মহিলা যদি নির্দিষ্ট করে কাউকে ডাকতো তাহলে তার অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকতো না যে, সে মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে। মহিলা সবাইকে ডেকে বলতো, তোমরা যা করেছো তা তো তোমরা জানোই এবং এর ফলাফলও তোমরা দেখতে পাচ্ছো। আমি একটি সন্তান প্রসব করেছি। তারপর মহিলাটি তাদের মাঝ থেকে কোনো একজন লোককে নির্দিষ্ট করে বলতো, এ হলো আমার সন্তানের পিতা। তারপর থেকে শিশুটি ওই ব্যক্তির পরিচয়েই বড়ো হয়ে উঠতো। শিশুটির দায়দায়িত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায়ই তখন সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিলো না।

চতুর্থ পদ্ধতিটি ছিলো প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি। এদের ঘরের দরজায় বিশেষ ধরনের পতাকা টানানো থাকতো। যে কেউই এদের সাথে ব্যভিচার করতে পারতো। এদের কোনো সন্তান হলে বহু লোক একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লোকদের দ্বারা বাচ্চার আকার-আকৃতি ও বিশেষ চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সন্তানের পিতা খুঁজে বের করতো। উপস্থিত লোকেরা যাকে শিশুর পিতা বলে ঘোষণা দিতো, তাকেই সন্তানের সকল দায়দায়িত্ব বহন করতে হতো। এ দায়িত্ব অস্বীকার করার বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ই সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিলো না। (বুখারি, বিয়ের অধ্যায়)

এ ধরনের অধঃপতিত সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদ (স.) সমাজের মানুষের নৈতিক পরিশুদ্ধির জন্য একটি সংস্কার আন্দোলন. শুরু করতে পারতেন। অন্যান্য সমাজ সংস্কারকদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এতে সমাজের কিছু ভালো মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাকে সর্বাত্মক সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতো। এটা যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য যে, এ ধরনের আন্দোলন শুরু করলে (Cream of the Society) বা সমাজের সবচেয়ে যোগ্য, সৎ ও ভালো মানুষগুলোকে তিনি একটি প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করাতে পারতেন। উন্নতমানের নৈতিকতাসম্পন্ন এসব মানুষজন স্বাভাবিকভাবেই মহাসত্য তাওহিদের বাণী অগ্রাহ্য করতো না এবং এ পদ্ধতিতে কাজ করলেও মুহাম্মদ (স.)-কে সেই অমানবিক যুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হতো না, সমাজের বর্বর লোকেরা বিরোধিতা করার সুযোগও পেতো না।

কিন্তু না। এ দ্বীনের যিনি প্রভু, সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীন জানতেন যে, এটিও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সূচনার সঠিক পন্থা নয়। তিনি জানতেন যে, এসব সামাজিক নৈতিকতা হলো ঠুনকো বিষয়, সত্যিকার নৈতিকতা একমাত্র ঈমানের ভিত্তিতেই অর্জিত হতে পারে। ঈমানই নীতিনৈতিকতার সঠিক মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে এবং এ মানদণ্ডের প্রবর্তক মহাশক্তিধর সত্তার সন্ধান দিতে পারে। সেই মহাশক্তিধর সত্তাই তাদের এ নীতিনৈতিকতার বিনিময়ে পুরস্কৃত করেন, পক্ষান্তরে নীতিনৈতিকতা বর্জনের শাস্তি দেন। কার জন্য, কী কারণে, কীসের আশায়, কীসের ভয়ে এ নীতিনৈতিকতা বজায় রাখতে হবে, তা যদি জানা না থাকে তবে সেই ঠুনকো নীতিনৈতিকতা সমাজের পাপ-পঙ্কিলতার সামান্য স্রোতেই ভেসে যায়। আর যদি শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের আশা থাকে তাহলে তা কিছুতেই মানুষ বিসর্জন দেয় না।

বিপ্লবের পথে

স্বর্ণ যেমন পুড়িয়ে খাঁটি করা হয় তেমনি প্রথম যুগের তাওহিদি কাফেলার সদস্যদেরও যুলুম-নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট করে প্রথমে খাঁটি মানুষে পরিণত করা হয়েছিলো। এমনিভাবে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে যখন আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রমাণিত হলো, যখন তারা তাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককে যথার্থরূপে চিনতে শিখলেন, নফসের কুপ্রবৃত্তির আনুগত্যসহ আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কর্তৃপক্ষের আনুগত্য থেকে মুক্তি লাভ করলেন, কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ছাপ তাদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে গেলো, তখনই তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নুসরত বা সাহায্য আসা শুরু হলো। আরবীয় শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়; বরং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের দখলদারিত্ব থেকে আল্লাহর যমিনকে তাদের মাধ্যমে মুক্ত করলেন।

সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে সকল যুলুম-নির্যাতনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সমাজের ন্যায়নীতি, বিচার-আচার, মূল্যবোধ, প্রভৃতির মানদণ্ড নির্ধারণ করা

হয় সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রণীত মানদণ্ডে। ইসলামি সুবিচারের মধ্য দিয়ে সমাজে আল্লাহর নির্ধারিত মানদণ্ড একমাত্র ও সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর নামে এ সার্বজনীন সুবিচারের পতাকা উড্ডীন হয়। এ পতাকায় খোদিত ছিলো একটি বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

ইসলামের এ জিয়নকাঠির পরশে মানুষের নৈতিক চরিত্র এমন উঁচু মানে উন্নীত হয় যে, গুটিকয়েক ঘটনা ছাড়া ব্যাপকভাবে কখনো তাদের ওপর শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করতে হয়নি। তাদের নৈতিকতাই তাদেরকে গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আইন মেনে চলতে উৎসাহ জুগিয়েছে। তাই আইনের দণ্ডের ভয়ে নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আশায়ই তারা নিজেদেকে সব ধরনের অপরাধমূলক কাজ থেকে দূরে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তারা একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করেন এবং অন্যান্য মানবীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উঁচু স্তরে উপনীত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কোনো মানবগোষ্ঠী এতো উন্নত জীবনযাত্রা ও সুখী সুন্দর সমাজ গড়তে পারেনি।

এ বিপ্লব কোনো অলৌকিক ম্যাজিক নয় বরং এটা একটি বাস্তবতা। আর তা এ কারণেই সম্ভব হয়েছিলো যে, ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য যারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, প্রথমে তারা ঈমান-আকিদা, নীতিনৈতিকতা, চরিত্র, আদর্শ ও পারস্পরিক অটুট ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের অন্তরে ও বাস্তব জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। পার্থিব কোনো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বা সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য তারা এ জিহাদে শরীক হননি। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই চেয়েছিলেন। তাদের সাথে একটি পুরস্কারের ওয়াদাই করা হয়েছিলো। তা হলো চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাতের ওয়াদা। তাওহিদি বাণীর বিরুদ্ধে ফুসে ওঠা কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিপুল অর্থবিত্ত, অস্ত্র ও জনবলের মোকাবেলায় তারা যে দৃঢ় মনোবল ও অদম্য সাহস দেখিয়েছিলেন এবং যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, জীবন বাজি রেখে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলেন, তার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে যে পুরস্কারের ওয়াদা তাদের দেয়া হয়েছিলো তা ছিলো অফুরন্ত আনন্দের উদ্যান-মনোময় জান্নাত।

এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেললে আল্লাহর রহমতে তারা সম্পূর্ণ সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। নিজেদের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে তারা আল্লাহর দ্বীনের পথে সর্বোচ্চ দৃঢ়তার পরিচয় দেন। আল্লাহ তাআলা যখন দেখলেন যে, তারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা, সুখ-সম্ভোগের জন্য লালায়িত নয়, নিজেদের জীবদ্দশায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে নিজেরা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে না, তাদের এ মগজ থেকে জাতীয়তাবাদী সীমাবদ্ধ চিন্তা, দেশ ও গোত্রীয় অহংকার, গোষ্ঠীগত আধিপত্যের হীন উদ্দেশ্য দূর হয়ে গেছে এবং এভাবে তারা যখন আল্লাহর বিচারে পূতপবিত্র ও পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী বলে

বিবেচিত হলেন, তখনই তাদের ওপর খিলাফতের এ মহামূল্যবান আমানত অর্পণ করলেন। খিলাফতের মুকুট পরিয়ে দুনিয়াতেই তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন।

দুনিয়াতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা তথা খিলাফত লাভের সর্বপ্রথম শর্ত হলো 'বিশুদ্ধ ঈমান'। বিশুদ্ধ ঈমান অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই আল্লাহ তাআলা খিলাফত তথা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দান করেন। কেননা, আল্লাহর যমিনে রাজনৈতিকভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে যারা এগিয়ে আসবে, তাদের হৃদয়-মনে আচার-আচরণে, চিন্তা-চেতনায় ও কর্মপন্থায় তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটলে তারা খিলাফতের মহামূল্যবান আমানত বহনের যোগ্য হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে ও বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তহীন প্রতিফলনের পর আল্লাহ তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন। কারণ, তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পরও এ ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোত্রীয়, জাতীয় কিংবা চাটুকার মোসাহেবদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহার না করে বরং আল্লাহর আমানতকে তাঁর সন্তুষ্টির অধীনেই যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নির্ভেজাল তাওহিদি চেতনার মাধ্যমে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ ও কষ্টসাধ্য আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সূচনা না হলে এ মহান জীবনব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। জাতীয়তাবাদী চেতনা, অর্থনৈতিক ভাবনা, সমাজ সংস্কার কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতির ধোঁয়া তুলে বাঁকা পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলে অথবা অন্য কোনো শ্লোগানের আশ্রয়ে তাওহিদি বাণী প্রচারের পন্থা অবলম্বন করা হলে এ জীবনবিধান কখনো বাস্তবের মুখ দেখতো না।

পবিত্র কুরআনের মক্কী অংশেও আমরা এ তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এ সময়ে নাযিল হওয়া সূরা ও আয়াতসমূহ মানুষের মনে শুধু কালেমার চেতনা বদ্ধমূল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বারবার একথাটিই বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই, ইলাহ্ নেই, আইনদাতা নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারো নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা কোনো মানুষের জন্য বৈধ বা যুক্তিসংগত নয়। সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে আপসহীনভাবে তাওহিদের ঝাণ্ডা নিয়ে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হতে; তা যতোই ত্যাগ ও কষ্টসাধ্য হোক না কেন; এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হলেও।

ইসলামি শরিয়তে কোনো ধরনের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, বিধিবিধানের আলোচনা এড়িয়ে শুধু ঈমানসংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাঝেই কুরআনের আলোচনাকে সীমিত রাখা হয়েছে। ইসলামি জীবনবিধানের খুঁটিনাটি বিষয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। ইসলামের প্রকৃতি ও মূলনীতির সাথে এ পদ্ধতির সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে।

ঈমানের এ মৌলিক চেতনা থেকেই ইসলামের সকল বিধিবিধান উৎসারিত হয়। তাই নির্ভেজাল তাওহিদি চেতনা যদি কারো অন্তরে বদ্ধমূল না হয়, তাহলে ইসলামের কোনো বিধিবিধান তার নিকট গুরুত্ব পায় না। এ তাওহিদি চেতনাই ইসলামের উৎসমূল। কুরআন কারিমে তাওহিদি কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা দ্বীনকে একটি বৃক্ষের উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। একটি উঁচু বড় বৃক্ষ আকাশে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তার ডালপালা ছড়িয়ে দিলেও এ বড় বৃক্ষটি যেমন মাটির গভীরে মজবুত শেকড় গেড়ে নিজের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে, দ্বীন ইসলামও ঠিক তেমনি।

এ দ্বীন শুধু ইহলৌকিক সমাধান নয় বরং পারলৌকিক জগতের যাবতীয় সমস্যারও সমাধান দেয়। জীবনের ছোট-বড় সকল বিষয়ে সুষ্ঠু নির্দেশনা দেয়। সৃষ্টিজগতের থেকে এমনকি অণু থেকে পরমাণু তথা সকল ক্ষেত্রে রয়েছে এ দ্বীনের স্বগর্ব বিচরণ। এর মূলে হলো ঈমান তথা তাওহিদ। তাওহিদি ঈমানই হলো এ ব্যাপক দ্বীনের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। ঈমানকে কেন্দ্র করেই এ দ্বীন দৃশ্য অদৃশ্য সকল কাজকর্ম ও চিন্ত াজগতের সকল দিক পরিবেষ্টন করে আছে। ইসলামের অনস্বীকার্য এ মৌল চেতনাটি আমাদেরকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেয় যে, মনের গভীরে নির্ভেজাল তাওহিদি ঈমানের বীজ বপনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সূচনা অনিবার্য। এ পদ্ধতিতেই এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব; এর কোনো বিকল্প নেই। কেননা, এ তাওহিদি চেতনার মধ্য দিয়েই ইসলাম নামের বৃক্ষের সকল শাখা-প্রশাখার সাথে মূলের সংযোগ সুদৃঢ় হয়।

কালেমার বাস্তব চেতনা সঠিকভাবে অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে ঈমানদাররা যে কোনো বিধিবিধান মেনে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যায়। কালেমার চেতনা গ্রহণ করে তারা আল্লাহর দরবারে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ করেছে—এটাই তাদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে সকল আইন-কানুন মেনে নিতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই বিধিবিধান নাযিল হবার সাথে সাথেই তারা নতশিরে তা মেনে নেয়। এ জন্য কোনো শাস্তি প্রয়োগের দরকার হয় না। তাদেরকে জানিয়ে দেয়াটাই আইন বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট। ইসলামের সোনালি যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সেকালের মুসলমানদেরকে লাঠিপেটা করে বা দণ্ড প্রয়োগ করে আইন মানতে বাধ্য করা হয়নি; বরং কুরআনের কয়েকটি আয়াত বা আল্লাহর রাসূলের মুখনিঃসৃত কয়েকটি বাণীই তাদের মনে অভাবনীয় পরিবর্তন ও আনুগত্য আনতে সক্ষম হয়েছে। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের আধুনিক সভ্যতার দাবিদার ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখতে পাব—আইন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে সকল ক্ষেত্রেই সামরিক শক্তি, থানা-পুলিশ, জেল-হাজত, ডাণ্ডাবেড়ির সাহায্য নিতে হয়। এতোকিছু করেও তারা প্রকাশ্যে আইন মান্য করার ক্ষেত্রে কিছুটা সফলতা হয়তো পায়, কিন্তু গোপনে এ আইনের প্রতি বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তা দেদারসে ভঙ্গ করতে থাকে। যেন মনে হয়, আইন বানানোই হয় তা লঙ্ঘনের জন্য।

একটি বাস্তবমুখী জীবনব্যবস্থা

ইসলামি জীবনবিধানের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তবমুখিতা। মানব চরিত্র এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেই এ বিধান মানবজীবনের সকল বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে কখনোই বাড়াবাড়ি করে না। আবার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিথিলতাও প্রদর্শন করে না। এ কারণে মুহূর্তেই সব বদলে দেয় না এ বিধান; বরং সমাজের প্রচলিত প্রথা, নিয়মনীতি পর্যালোচনা করে যেটা পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করে না সেটা বহাল রাখে। সংশোধনযোগ্য হলে সংশোধন করে। আর যদি একেবারেই অবাঞ্ছিত হয় তাহলে তা সময় নিয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। তাই কোনো সমাজের মানুষের মাঝে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সে সমাজে বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই সে যুগের আইনসমূহ প্রণয়ন করে।

ইসলাম কিছুতেই কল্পনাসর্বস্ব, অনুমানভিত্তিক বা কিছু তাত্ত্বিক সূত্রের সমাহার নয়। এটি মানুষের মাঝেই প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তাই সমাজে ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধি ও অন্যান্য আইন-কানুন প্রয়োগের আগে এমন একটি সমাজ গড়ে ওঠা আবশ্যক, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মানে না, অন্য কারো আনুগত্য করে না। এ ধরনের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ সমাজের মানুষেরা তাদের জীবন চলার পথে যখন বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখন তাদের সে সব সমস্যার কল্যাণমুখী সমাধান দেয়ার জন্যই ইসলাম প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন শুরু করে। ইসলামি বিধান এ সমাজেই প্রয়োগ করা হয়, যে সমাজের মানুষেরা নীতিগতভাবে আল্লাহর আইন মেনে নিয়েছে এবং অন্য সব মানবরচিত জাহেলি আইন-কানুন অবাঞ্ছিত ও বাতিল বলে ঘোষণা দিয়ে সেগুলো বর্জন করেছে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ক্ষমতার আবশ্যকতা

ইসলামি মূল্যবোধে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে সমাজে ইসলামি আইন প্রয়োগের জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। তাছাড়া সরাসরি কুরআন সুন্নাহ থেকে নির্ধারিত আইন বিধান ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে তারা যেসব ছোট-খাটো সমস্যার মুখোমুখি হবে, সে ক্ষেত্রে তা সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকতে হবে।

যদি আমরা আল্লাহর রাসূলের মক্কি ও মাদানি জীবনের প্রতি লক্ষ করি তাহলে এ বাস্তব সত্যটি আমাদের সামনে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে; মক্কায় মুসলমানদের সামাজিক রাজনৈতিক কোনো ক্ষমতা ছিলো না, যে কারণে আইন প্রয়োগ বা প্রণয়ন কোনোটাই তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সে জন্য মক্কি জীবনে আল্লাহ তাআলা কোনো ধরনের সামাজিক আইন-কানুন নাযিল করেননি। সে সময়ে তাদেরকে শুধু ঈমানি তারবিয়াতই দেয়া হতো; ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোই শুধু তাদের শেখানো হতো।

হিজরতের পর মদিনায় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে যখন একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান দেয়ার মতো অবস্থা যখন সৃষ্টি হয়, আইন-কানুন প্রয়োগ ও প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের হাতে আসে, তখনই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর 'হুদুদ', 'কেসাস'সহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আইন-কানুন নাযিল করেন।

প্রথমে একত্রে সকল আইন-কানুন নাযিল করে রেখে দিয়ে পরে সময় সুযোগ এলে তা বাস্তবায়ন করা হবে' এমন স্থূল চিন্তার জীবনব্যবস্থা ইসলাম নয়। এ ধরনের নীতি ইসলামি চেতনার সাথে কিছুতেই সংগতিপূর্ণ হতে পারে না। এ আদর্শ 'যদি এমন হয় তবে এমন হবে'—এমন কাল্পনিক সমস্যার সমাধান দিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নয়। ইসলাম প্রথমে সমাজের সার্বিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। ইসলাম যদি দেখে, সমাজে মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে, মানুষ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাহলেই ইসলাম সে সমাজের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আইন প্রণয়নের চিন্তা করে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি যে, এ বিশাল পৃথিবীর ছোট্ট কোন ভূখণ্ডেও পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত নেই এবং প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতাশীল কোনো রাজনৈতিক শক্তিও নেই। প্রতিটি দেশই আজ শাসিত হচ্ছে মানবরচিত জাহেলি কুফরি আইন-কানুন দিয়ে। এসব দেশের মানুষেরাও (হোক সে মুসলিম পরিচয়ধারী) সামগ্রিকভাবে জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছে। এ পরিস্থিতি দেখেও যারা বর্তমান বিশ্বের জন্য উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানান, তারা আল্লাহর এ দ্বীনের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে যে দারুণভাবে অজ্ঞ, সে কথা বলা বাহুল্য। যে ইপ্সিত উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা এ দ্বীন নাযিল করেছেন তারা সে উদ্দেশ্যটিও জানে না। তারা এ দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে একে মানবরচিত মতবাদের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চায়। পরস্পর সাংঘর্ষিক মানবরচিত উদ্ভট আইন-কানুনের ঘূর্ণিপাকে তাদের যে পরাজিত মনোবৃত্তির জন্ম হয়েছে, এর অনিবার্য কুপ্রভাবের কারণেই তারা অতি সহজে আরাম কেদারায় বসে সংক্ষিপ্ত পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা ইসলামকে সংজ্ঞাসর্বস্ব কতিপয় অবাস্তব আইন-কানুনের সমষ্টি মনে করে বসে আছে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা চাওয়া, কিছু না খেয়েই পেট পূরণের মতো অমূলক চিন্তা। ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথম যুগের মতো করেই শুরু করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত হলে একমাত্র সেই পদ্ধতিতেই হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এমন একটি মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে, যাদের মন-মগজে ঈমানের নির্ভেজাল চেতনা গভীরভাবে বদ্ধমূল হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য বা গোলামি না করার ব্যাপারে তারা হবে পাহাড়সম অটল। এ আকিদা বিশ্বাসের আলোকে গড়ে ওঠা কোনো মানবগোষ্ঠী যখন সমাজের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে

তখনই সে সমাজের চাহিদা অনুসারে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী আইন-কানুন রচনা সম্ভব হবে। ইসলামি জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এটি হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র পদ্ধতি। আর তার নির্ধারিত পন্থা অগ্রাহ্য করে মানবমস্তিষ্ক প্রসূত, আপাত দৃষ্টিতে যৌক্তিক কোনো পন্থা অবলম্বন করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। গ্রহণ করা হলেও সেসব পদ্ধতিতে পরিচালিত আন্দোলন হয়তো এক পা দু'পা এগুবে তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি

বর্তমান বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যদিও নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করছে, সরকারী রেকর্ডে তাদের নাম মুসলমান হিসেবেই আছে। তবুও একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, জেনে হোক বা না জেনে হোক ইসলামের মৌলিক দাবি কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র সঠিক বুঝ থেকে তারা আজ বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। তাই ইসলামের পথে আহ্বানকারীদেরকে সর্বপ্রথম মানুষকে ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং কালেমার সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। কালেমার সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায় থেকে নিয়ে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া এবং এ চেতনার বিরোধী সকল ক্ষমতাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা বা অস্বীকার করা। মনে রাখা আবশ্যক যে, এটা শুধু মনে মনে গ্রহণ করলেই হবে না, এ দাবি অনুযায়ী বাস্তব জীবনযাত্রায়, চালচলনে, আচার-ব্যবহারে এর সঠিক অনুশীলনও করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রথম আন্দোলন এ পদ্ধতিতেই শুরু হয়েছিলো। দ্বীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যারাই শুরু করবে, এ মৌলিক দিকটির প্রতি তাদেরকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। রাসূলের মক্কী জীবনে অবতীর্ণ কুরআনে হাকীম তার আলোচনার বিষয়বস্তু ঈমানের এ মৌলিক চেতনার মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলো। বিক্ষিপ্তভাবে ইসলামের কিছু পঙক্তি আওড়ালেই ইসলামি সংগঠন আখ্যা দেয়া যায় না। যারা উপরোক্ত তাৎপর্য উপলব্ধি করে জিহাদে যোগ দেয় এবং এ নীতির ভিত্তিতে তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করে, তাদের জনসমষ্টিকেই ইসলামি সংগঠন আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের চেতনায় উজ্জীবিত মুজাহিদরাই সামষ্টিক জীবনে ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। কারণ, তারা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের জীবন আল্লাহর আদর্শের রঙে রঞ্জিত করেছে, আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে অন্য সকল সার্বভৌমত্বের দাবিদারদের অস্বীকার করেছে।

ইসলামের এ বৈপ্লবিক চেতনার ভিত্তিতে যখন একটি সমাজ জন্ম লাভ করে তখনই সেই সমাজ তার পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান প্রণয়ন করতে অগ্রসর হবে। এ হলো ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার কুরআন ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মপন্থা।

আল্লাহর দ্বীনের এ মৌলিক বৈশিষ্ট্য যারা বুঝতে পারেন না, তারাই অহেতুক তাড়াহুড়া করেন। তারা বুঝতে চান না যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে নীতি মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন, তা শুধু তৎকালীন সময়ের জন্যই নয়; বরং সেই কর্মপন্থা কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নজীরবিহীন মডেল। এ পদ্ধতির মাঝেই রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা। অতিদ্রুত ফল প্রত্যাশী স্বভাবের লোকেরা মনে করেন, ইসলামি আইন-কানুন ও বিধিবিধানের বাস্তবমুখিতা ও কার্যকারিতা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারলেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামি আইন-কানুন গ্রহণে এগিয়ে আসবে। এটা তাদের কাল্পনিক চিন্তা। এ রকম কর্মপন্থা যদি আল্লাহর রাসূল গ্রহণ করতেন তাহলে তাদেরকে নির্মম যুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হতো না। তিনি ভৌগলিক জাতীয়তা, অর্থনৈতিক বিপ্লব বা সমাজ সংস্কারের কৌশলে আন্দোলন শুরু করলে তাঁর জন্য সহজ হতো, কিন্তু তিনি সে পথে যাননি। ইসলামি শরিয়ার আইন কানুনের কার্যকারিতা বর্ণনা করে তাদেরকে মুগ্ধ করার নীতি অবলম্বন না করে তিনি প্রথমে তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি গভীর ঈমান স্থাপন ও সকল জাহেলি রীতিনীতি, আইনকানুন বর্জন করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর দেয়া বিধিবিধান গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করেছেন। আইন-কানুন দেখে মুগ্ধ হয়ে নয়, আল্লাহর কাছে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণের ফলেই আল্লাহর দেয়া শরিয়তের প্রতি সত্যিকার আন্তরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। অবশ্য ইসলামি আইন-কানুন যে মানবরচিত সকল আইন-কানুন থেকে শ্রেষ্ঠ, বরং তুলনাহীন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কেননা, এ জীবনবিধান তো তিনিই প্রণয়ন করেছেন যিনি এ গোটা বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তো সবচেয়ে ভালো জানবেন যে, তার কোন সৃষ্টির স্বভাব-প্রকৃতি কেমন এবং তাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হলে কোন ধরনের আইনবিধান দেয়া যথার্থ। তবে হাঁ, শুধু আইন-বিধানের এ শ্রেষ্ঠত্বই আন্দোলনের ভিত্তি হতে পারে না। আন্দোলনের ভিত্তি হলো স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বিনা দ্বিধায় আল্লাহর আইন-বিধানকে গ্রহণ ও অন্য সকল আইনকে প্রকাশ্যে বর্জন। এটাই ইসলামের মূলমন্ত্র। ইসলামের সঠিক ও একমাত্র শিক্ষা। এ শিক্ষা যার অন্তরে প্রবেশ করে সে ইসলামি বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারে। একেকটি করে মানবরচিত আইন ও আল্লাহর আইনের তুলনামূলক আলোচনা করে তাকে ইসলামি আইনের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে হয় না। এটাই ঈমানের মূলমন্ত্র, প্রধান ভিত্তি, এবং এটাই পূর্ণাঙ্গ ঈমান।

জাহেলিয়াতের মোকাবেলা

আমরা এখন আলোচনা করবো মক্কী জীবনে অবতীর্ণ কুরআন কী পদ্ধতিতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করেছে এবং মানুষের মনে কীভাবে ঈমান-আকিদা গড়ে তুলেছে। আমরা খতিয়ে দেখবো কীভাবে তাদের এ থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করে সেখানে ঈমানের আলো প্রবেশ করিয়েছে।

মক্কী জীবনের নাযিলকৃত আয়াতসমূহ পর্যালোচনায় দেখতে পাই যে, ঈমান-আকিদার বিষয়টি কুরআন নিছক কোনো তাত্ত্বিক ও পাণ্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা হিসেবে উপস্থাপন করেনি। দুনিয়ার পণ্ডিতদের বই-পুস্তক লেখার প্রচলিত নীতিও তাতে গ্রহণ করা হয় নি; বরং সম্পূর্ণ নতুন, অভিনব, হৃদয়গ্রাহী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ এক পদ্ধতিতে এ কুরআন নাযিল হয়েছে। মানব প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো একটি কথাও এতে নেই, বরং কুরআন মানুষকে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাবনীয় জটিল সৃষ্টি প্রক্রিয়া এবং মানুষের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টি নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদেরকে এসব সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভাবতে বলেছে যে, এসব কিছু কি এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এ সুবিশাল সৃষ্টি আয়োজনের উদ্দেশ্য কী?

কুরআন মানুষের মন-মগজ ও চিন্তা-চেতনা জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত করেছে। তার মাঝে লুক্কায়িত মানবীয় বোধশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। মানুষ যাতে বুঝতে পারে, তাকে কেন এতো উন্নত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার নিকট থেকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কী আশা করেন—এজন্য তার সুপ্ত বুদ্ধিমত্তাকে ক্রমান্বয়ে শাণিত করে তোলা হয়েছে। এ ছিলো কুরআনের একটি সাধারণ দিক।

কুরআন শিক্ষার বৈপ্লবিক দিক হলো, তাওহিদের ভিত্তিতে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান জাহেলিয়াত উচ্ছেদের সংগ্রাম শুরু করা। নিছক কোনো তাত্ত্বিক মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে সমাজকে জাহেলিয়াতমুক্ত করার চিন্তা নিজের পিঠ বাঁচানোর কল্পনাবিলাসী ভাবনামাত্র। জাহেলিয়াত যেভাবে মানবসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গিয়েছিলো, যেভাবে জগদ্দল পাথরের মতো মানবজাতির ওপর চেপে বসেছিলো তা উচ্ছেদ করা নিছক কোনো তাত্ত্বিক আদর্শের মাধ্যমে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই কুরআন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জাহেলিয়াতের সকল আবরণ ছিঁড়ে ফেলে, প্রতিষ্ঠিত মিথ্যার প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়ার আপসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কুরআনি প্রচারণা এভাবেই শুরু হয়েছিলো।

রাসূল ও সাহাবিদের যুগের কয়েক যুগ পরে এসে কুরআনি বিধিবিধানের যে সব যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো তখন ছিলো না। কুরআনের বাণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও হয়নি। কুরআননির্ভর কোনো যুক্তিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্রেরও অস্তিত্ব ছিলো না। তাই প্রচারণার ক্ষেত্রে এসব কোনো কৌশলই কুরআন গ্রহণ করেনি। কুরআন সরাসরি বিদ্যমান গোটা জাহেলি সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদ প্রকল্পে বাস্তব সংগ্রাম শুরু করে। দুর্বলের প্রতি সবলের যুলুম, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কুরআন তার কালজয়ী বক্তব্য পেশ করে এবং সরাসরি সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সংগ্রাম সময়ের এক অনিবার্য দাবি। এ সংগ্রামের পথকে পাশ কাটিয়ে নিছক আধ্যাত্মিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোনো 'ধর্ম' প্রচার করে কিছুতেই কুরআনের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি, হবেও না। নিছক কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করার জন্য এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়নি। কুরআন একই সাথে মুসলিম দলের সদস্যদের অন্তরে ঈমানের

বীজ বপন করে, তাদের জীবনযাত্রার সকল দিক ও বিভাগকে জাহেলিয়াতের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করে তাদের মাধ্যমে বিদ্যমান জাহেলি সমাজের দুর্গে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ চালায়।

কুরআন তার অনুসারীদেরকে একই সাথে চতুর্মুখী বাধাবিপত্তি ও সংঘাত-সংঘর্ষে নিপতিত করে তাদের ঈমান সজীব ও খাঁটি করে তোলে। মজবুত ও দৃঢ় করে তোলে। কেননা, বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, এতেই ঈমানের শক্তি অধিক বৃদ্ধি পায়। ইসলাম একটি সদাতৎপর সুগঠিত দীপ্ত আন্দোলনের নাম। মুসলিম সমাজের বাস্তব কার্যক্রম দিয়েই সে আপন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। এ সমাজের আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ঈমানি ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে। ঈমান যতো মজবুত হবে ইসলামি আন্দোলন ততোই বিকাশ লাভ করবে। ঈমানি স্তরের সাথে সংগতি রেখেই ইসলামি আন্দোলন প্রসার লাভ করবে–এটাই সত্য এবং দীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে যারা জিহাদ করেন তাদেরকে ইসলামি বিপ্লবের আলোচিত এ পদ্ধতিটি কোনোক্রমে ভুলে গেলে চলবে না। এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, মক্কী জীবনে অবতীর্ণ কুরআন উল্লিখিত পদ্ধতিতে একই সাথে মানুষের ঈমান মজবুত করেছে এবং রাজনৈতিকভাবে সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দুর্বার আন্দোলনকে সফল করে তোলার মতো একদল সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবদল তৈরি করেছে। আগে ঘরে বসে লেখা-পড়া করে দ্বীন বুঝে আন্দোলনে যোগদান নয়; বরং একই সাথে আন্দোলন ও শিক্ষার সমন্বয়ে এ সংগ্রামী মানবদলটির জন্ম হয়। এটি হলো সরাসরি আল্লাহর নির্দেশনায় প্রস্তুতকৃত ইসলামি আন্দোলনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় একমাত্র মডেল। নিকট কিংবা দূর ভবিষ্যতে যখনই কোনো দল ইসলামি জীবনাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করবে তখন তাদেরকে এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে হবে।

নিছক কোনো তাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা দ্বারা ঈমান-আকিদা মজবুত করা সম্ভব নয়, এভাবে সময় নষ্ট করাও উচিত নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ধরে দৃঢ় ও সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে আস্তে আস্তে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ নয়; বরং ঈমানি চেতনা ঈমানি দাবিগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করতে হবে এবং ঈমানের রূপরেখার বাস্তব নমুনা নিজ জীবনে প্রস্ফুটিত করে তুলতে হবে। প্রথমে মানুষের মনে ঈমানের আলো প্রবেশ করবে এবং সাথে সাথেই এমন একটি জামাত গড়ে উঠবে যাদের জীবনযাত্রা হবে সেই ঈমানের জীবন্ত নমুনা। তারা তাদের জীবনকে সম্পূর্ণ ঈমানের ছাঁচেই গড়ে তুলবেন। এ বিপ্লবী জামাতের প্রতিটি সদস্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কথায় ও কাজে বিদ্যমান জাহেলি সমাজ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এ জাহেলি সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঈমানের জলজ্যান্ত নমুনা মানুষের সামনে ফুটে উঠবে। তখন জাহেলি সমাজের মানুষেরা শুধু ঈমানের দাওয়াতই শুনবে না বরং ঈমানের স্বরূপ তাদের সামনেই

দেখতে পাবে। বর্তমান বিশ্বে এমন দলের অভাব নেই যারা বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের জন্য বিভিন্ন স্থানে শুধু সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করেন, ইসলামি আইনকানুনের কার্যকারিতা মানুষকে বুঝান, জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক আলোচনা করেন, বীরগাঁথা ইতিহাস চর্চা করেন এবং মনে করেন যে, এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং হয়তো একদিন ইসলামি জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এটা চরম ভ্রান্তি এবং আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। এ ধরনের আপাত যৌক্তিক ও বাস্তবে নিষ্ফল ধারণা সম্পর্কে সকলেরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন তাহলে পুরো কুরআনকে গ্রন্থ আকারে একদিনে নাযিল করে তা অধ্যয়ন ও উপলব্ধির জন্য তেইশ বছর সময় দান করতে পারতেন। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, ওটি অকার্যকর পদ্ধতি। তাই তিনি তেইশ বছরে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধাপে ধাপে কুরআন নাযিল করেছেন এবং সাথে সাথে বাস্তব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে ঈমানের বীজ বপন করেছেন, তাদের জীবনে ঈমানের বাস্তব মডেল তৈরি করেছেন এবং ক্রমান্বয়ে তাদের ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তিনি একই সাথে পুরো কুরআন নাযিলের পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। কারণ, তিনি তো মহাজ্ঞানী, তিনি সেই পদ্ধতির অনিবার্য ব্যর্থতা সম্পর্কে অবশ্যই জানতেন। এ পদ্ধতির বদলে তিনি একটি বাস্তব ফলপ্রদ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কেননা, তিনি তো মানবজাতিকে নিছক জ্ঞানগর্ভ কোনো তাত্ত্বিক মতবাদ শেখাতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন একই সাথে মানুষের মনে তাঁর দ্বীনের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস গড়ে উঠবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে এ দ্বীনের বাস্তব রূপরেখা প্রস্ফুটিত হবে। তিনি চেয়েছিলেন মজবুত আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুসলিম সদস্যদের ঈমান ক্রমান্বয়ে আরো দৃঢ় ও মজবুত হয়ে উঠুক। আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই জানতেন যে, মানুষের আকিদা বিশ্বাস পরিবর্তন করাই হলো কঠিন ব্যাপার। আকিদা বিশ্বাস যেমন রাতারাতি পরিবর্তন করা যায় না, তেমনি কোনো আকিদার ভিত্তিতে সমাজ গঠনও সহজসাধ্য নয়। এ উভয়বিধ লক্ষ্যের জন্যই প্রয়োজন এক সুদীর্ঘ সময়ের নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ ও বাস্তব অনুশীলন। এটাই আল্লাহর দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য। মক্কি সময়কালে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত ও সূরাগুলোকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে এ তত্ত্বটি দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আল্লাহর দ্বীনের এ মহান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবশ্যই পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হবে। মানবরচিত মতবাদগুলোর বাহ্যিক চাকচিক্যময় ও আপাতদৃষ্টিতে ফলপ্রসূ নীতির ছাঁচে যেন ইসলামকে সাজাতে চেষ্টা না করি। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হোক বা না হোক, ইসলাম কোনো অবস্থাতেই মানবরচিত মতবাদের কোনো নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ইসলাম তার স্বকীয় নীতি আদর্শের মাধ্যমে সেকালে এমন একটি উম্মাহ্ গড়ে তুলেছিলো, যারা ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে আলোকিত অধ্যায়ের স্থপতি।

আজকের বহুধাবিভক্ত, দিশেহারা, পথভ্রষ্ট মুসলিমজাতি যদি আল্লাহর দ্বীনকে আবার যমিনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে তা সে পদ্ধতিতেই সম্ভব । অন্য কোনো পদ্ধতিতে এ দ্বীনের প্রতিষ্ঠা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এ পথ পরিহার করে যারা কম ঝুঁকিপূর্ণ পথ গ্রহণ করে, যারা এ দ্বীনের নিজস্ব পদ্ধতি পরিবর্তন করে সমাজে প্রচলিত কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চায়; কিংবা যারা নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা, জ্ঞানচর্চা ও ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে মানুষের কাছে দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তাদেরকে এর দিকে আকৃষ্ট করতে চায়, তাদের এ কর্মকাণ্ডকে শুধু ভুল কার্যক্রম আখ্যা দিলেই হলো না; বরং তাদেরকে সুস্পষ্ট করে বলে দিতে হবে, তোমরা ইসলামপ্রিয় উম্মাহকে নিয়ে এক বিপজ্জনক গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ।

প্রত্যেকটি মতবাদেরই মৌলিক দাবি রয়েছে। ইসলামের মৌলিক দাবি হলো, সে মানুষের চিন্তা-চেতনা, কাজকর্ম তথা সার্বিক জীবনকে দখল করে নেবে এবং সেই মানুষকে তার প্রতীকী শক্তিতে পরিণত করে বিদ্যমান জাহেলি সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রাম শুরু করে দেবে। ইসলাম শুধু সমাজ থেকেই জাহেলিয়াতের উচ্ছেদ সাধন করে সন্তুষ্ট হবে না বরং যারা এর অনুসরণ করবে তাদের মন-মগজ থেকেও যাবতীয় জাহেলিয়াতের কলঙ্ক দূর করার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কারণ হলো, যারা 'নতুন ইসলাম' গ্রহণ করে এ আন্দোলনে শরীক হয়েছে, তারা তো এ জাহেলি সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছে। এ জাহেলি সমাজেই তারা জীবনের সুদীর্ঘ সময় কাটিয়েছে। সুতরাং, তাদের জীবনযাত্রায় জাহেলিয়াতের কোনো চোরাবালি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

নিছক জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক ওয়ায-নসীহত মানুষের জীবনে এতো গভীর প্রভাব বিস্তার কখনোই করতে পারে না। ইসলামের এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষকে এতো গভীরভাবে প্রভাবিত করে। চিন্তা-চেতনার সীমানা পেরিয়ে ইসলাম যেহেতু সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে তাই সে মানুষকে এতো প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এর আরো একটি কারণ হলো–ইসলাম স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ ও মানবজাতি সম্পর্কে যে দর্শন পেশ করে তা অত্যন্ত ব্যাপক ও ইতিবাচক। ইসলাম কিছুতেই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক তর্কবিতর্ক, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে থাকতে রাজি নয়, এটা তার নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে অসামঞ্জস্যশীল। ইসলাম তার বিপ্লবী অনুসারীদের কর্মতৎপরতা, আন্দোলন, সংগ্রাম ও দৈনন্দিন জীবনধারার সাথে সংগতিশীল এক চলমান রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। ইসলাম কিছুতেই মানুষের জীবনের ঐচ্ছিক কোনো দিক বা নিছক শোভা বৃদ্ধিকারী কোনো বিষয়ে পরিণত হতে চায় না; বরং সে মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতিটি কর্মতৎপরতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, প্রথমে কিছুদিন ইসলামের গভীর জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই জ্ঞান একত্রে জীবনে প্রয়োগ করার চিন্তা শুধু ভ্রান্তই নয় বরং মারাত্মক বিপজ্জনক। এটা ইসলামের প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যশীল এবং সাংঘর্ষিক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

'আমি কুরআনকে (বিভিন্ন ভাগে) বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে তুমি ক্রমে ক্রমে তা মানুষের সামনে পড়তে পারো–আর (এ কারণেই) আমি তাকে পর পর নাযিল করেছি।' (সূরা বনী ইসরাঈল, ১০৬)

আলোচ্য আয়াতে আমরা দেখতে পাই, এখানে দুটি নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে–

এক. অল্প অল্প করে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কুরআন নাযিল

দুই. অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে তা মানুষকে পড়ে শোনানো।

ধীরে ধীরে মানুষের মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা, দৈনন্দিন জীবনের কর্মপন্থা একেক করে পরিবর্তন করে তাদেরকে সম্পূর্ণ ইসলামের ছাঁচে তৈরি করাই এ নীতি নির্ধারণের প্রধান লক্ষ্য। নিছক ভালো ভালো কথা শোনানো, বা অসাধারণ মতবাদ হিসেবে মানুষের স্বীকৃতি পেয়ে ইসলাম ধন্য হতে চায় না। সুতরাং, লক্ষ্য যেখানে সুদূরপ্রসারী, পদ্ধতিটাও সেখানে বাস্তবসম্মত ও গভীর প্রভাবব্যঞ্জক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বীন আল্লাহর, প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও হতে হবে তাঁর দেয়া

ওযু করা যেমন আল্লাহর বিধান, ওযুর পদ্ধতিও তেমনি আল্লাহর নির্ধারিত। নামায পড়া যেমন আল্লাহর হুকুম, নামায পড়ার পদ্ধতিটাও তার প্রণীত এবং এর ব্যতিক্রম হলে সেই নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। ঠিক তেমনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা শরীক হতে চান তাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য; এবং তিনি যেহেতু তাঁর রাসূলের জীবনকে একটি বাস্তব মডেল হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে এ নীতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই অন্য কোনো নীতি এখানে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার দ্বারা এ দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়াও সম্ভব নয়। ভালো করে বুঝতে হবে যে, আকিদা বিশ্বাস ও সমাজ পরিবর্তন করা যেমন দ্বীনের উদ্দেশ্য তেমনি এ আন্দোলনের পদ্ধতি পরিবর্তন না করাও এ দ্বীনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ দ্বীন তার নিজস্ব আকিদা বিশ্বাসের ছাঁচে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উম্মাহ গড়ে তোলে। এ জীবনব্যবস্থা মানুষের ওপর মুহূর্তেই বিরাট এক নীতির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে বিব্রত করতে রাজি নয়; বরং তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারায় মানবীয় প্রকৃতির সাথে সংগতি রেখে যতোটুকু পরিবর্তন সহনীয় ততোটুকু বিধান প্রয়োগ করে। তাই আকিদা বিশ্বাস সংশোধন করা আর কর্মজীবন সংশোধন করাকে ইসলাম কোনো পৃথক কর্মসূচি মনে করে না; বরং একই সাথে উভয় দিকটি সংশোধন করে।

আমাদের প্রত্যেকের জানা উচিত যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের রয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব কর্মপদ্ধতি। এ পদ্ধতি সকল দিক থেকে বাস্তবসম্মত, ফলপ্রসূ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী। এ শাশ্বত দ্বীনের সুনির্ধারিত অন্যান্য বিধিবিধানের যেমন কোনো পরিবর্তন নেই, তেমনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মপদ্ধতিরও কোনো পরিবর্তন নেই। এ কর্মপদ্ধতির মৌলিক দিকগুলো বিশেষ কোনো যুগ, দেশ বা পরিবেশের জন্য তৈরি করা হয়নি বরং সকল যুগ, দেশ ও পরিবেশে একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এ শুধু সাহাবায়ে কেরামের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত কোনো কর্মপন্থা নয়; বরং সাহাবিদের মাধ্যমে চিরকালের জন্য নির্ধারিত একটি মডেল। তাই যখন যে ভূখণ্ডে দুনিয়ায় কোনো মানবগোষ্ঠী দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করবে তাদেরকে এ নীতিই গ্রহণ করতে হবে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র নামে জাহেলি কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। অন্য কোনো ব্যাপারেও যেমন মানবরচিত মতবাদের সাথে ইসলামের কোনো সামঞ্জস্য নেই, তেমনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অন্য কোনো জীবনব্যবস্থার পদ্ধতির সাথে ইসলামি পদ্ধতির জোড়াতালি ফলপ্রসূ নয় এবং তার কোনো প্রয়োজনও নেই। কারণ, মানবরচিত মতবাদ সর্বদাই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানুষকে পরিমাপ করে।

আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল্লাহর দেয়া পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অন্য কোনো উপায়ে জাহেলি সমাজ পরিবর্তন কখনো সম্ভব হবে না।

আমরা ইসলাম কীভাবে গ্রহণ করলাম–তার সাথে ইসলামের কল্যাণ পাওয়া না পাওয়ার বিরাট সম্পর্ক রয়েছে; বরং এর ওপরই নির্ভর করে-দ্বীনের শাশ্বত কল্যাণ আমরা লাভ করতে পারবো, না তা থেকে বঞ্চিত হবো। আমরা যদি ইসলামকে নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করি, জ্ঞানগর্ভ পঙক্তি আওড়িয়ে মজলিস গরম করি বা মানুষকে বিস্মিত করার জন্য আসমানী গ্রন্থ অধ্যয়ন করি তাহলে আল্লাহপ্রদত্ত বিপ্লবী ধারাকে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো। এর মাধ্যমে আমরা এটাই বুঝাতে চাই যে, মানবজাতির সংস্কারের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত পদ্ধতির চেয়ে মানুষের বানানো পদ্ধতিগুলোই বেশি কার্যকর। মানুষের বানানো পদ্ধতিকে আল্লাহর পদ্ধতির ওপর স্থান দেই এবং আল্লাহ প্রণীত পদ্ধতিকে 'সংশোধন' করে মানবরচিত পদ্ধতির সমপর্যায়ে 'উন্নীত'(!) করতে চেষ্টা করি। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা আল্লাহর দ্বীনের সাথে কত মারাত্মক বিদ্রূপ তা কলমের ভাষায় বুঝানো সম্ভব নয়। এটা দীর্ঘদিন বিজাতীয়দের শাসনাধীন থাকায় গড়ে ওঠা পরাজিত মানসিকতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

তবে হাঁ, একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামি আদর্শ প্রচার করা, লিখনিশক্তির মাধ্যমে এর বিধিবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা–এগুলো ইসলামেরই কাজ বটে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, এ গুণকীর্তন ও নিছক প্রচারণার দ্বারা কখনো সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে

পারে না। এ জন্য বাস্তব সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, ইসলামি সাহিত্য, আলোচনা ও ওয়ায-নসীহত দ্বারা শুধু দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত মুজাহিদরাই উপকৃত হতে পারে। তাত্ত্বিক আলোচনা সাধারণ মানুষের ততোটা ফলপ্রসূ হয় না।

আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে প্রচলিত (ভোট, ক্যু কিংবা অন্য) কোনো পদ্ধতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। তা আমাদের দৃষ্টিতে যতোই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি সরাসরি আল্লাহর বাণী থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে, এর কোনো পরিবর্তন নেই, এটা চিরকালের জন্য এক নিখুঁত ও স্থায়ী পদ্ধতি। অন্য যে কোনো পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি মানবপ্রকৃতিকে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে আকর্ষণ করতে পারে। কেননা, এ পদ্ধতি মানবপ্রকৃতির সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

ইসলামি মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচিত বিষয়গুলো যদি সত্য হয় তাহলে এ সমাজের গঠন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় আইন-বিধান প্রণয়নের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষের বানানো বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের কারণ হলো, বর্তমান বিশ্বের ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের চারপাশে দীর্ঘদিন ধরে এক জটিল ধরনের জাহেলি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তাই নিজেদের অজান্তেই এ নিঃস্বার্থ কর্মীরা জাহেলিয়াতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে এবং এ কারণে তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক স্তরগুলোকে খুব দ্রুত অতিক্রম করতে চাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়; প্রতিষ্ঠিত জাহেলি সমাজব্যবস্থার চাকচিক্যময় বাহ্যিক রূপ দেখে, আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন নতুন পদ্ধতি দেখে তারা আজকাল প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করেছে যে—আমরা যে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছি তার বিধানগুলো কী? বর্তমান সমাজে প্রয়োগের ব্যাপারে আনুষঙ্গিক দিকগুলো সম্পর্কে কি আমরা যথেষ্ট গবেষণা করেছি? বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ইসলামের নীতিমালাগুলোকে কি আমরা নির্ধারণ করেছি? আমাদের ফেকাহশাস্ত্র তো অনেক পুরাতন আমলে রচিত, আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এ ফেকাহ শাস্ত্রকে আমরা নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছি ইত্যকার বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে।

তাদের এসব প্রশ্ন শুনে সত্যিই দুঃখ হয়। তাদের প্রশ্নের ধরন শুনে মনে হয় গবেষণামূলক এ কাজগুলোই যেন শুধু বাকি আছে। এ ব্যবহারশাস্ত্র প্রয়োগের বাস্তবক্ষেত্র যেন তাদের সামনে প্রস্তুত হয়ে গেছে। যেন সমাজের মানুষেরা সামষ্টিকভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, জাহেলি মানবরচিত ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন শুধু আল্লাহর আইন অনুযায়ী জীবন যাপন করার আধুনিক যুগোপযোগী

একটি ব্যবহারশাস্ত্র (ফেকাহ) তৈরির কাজই বাকি রয়েছে এবং একদল অভিজ্ঞ মুজতাহিদেরই শুধু আমরা অভাব বোধ করছি!

ইসলামি আন্দোলনের মুজাহিদদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো মূলতঃ ইসলামের শত্রুদেরই কাজ। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অত্যন্ত সুকৌশলে গলা টিপে হত্যা করতে চায়। তারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রতিরোধ করে জাহেলিয়াত প্রতিষ্ঠিত রাখার পথ সুগম করার চেষ্টা চালায়।

ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের ঈমানিশক্তি দুর্বল করা এবং তাদেরকে এ আত্মতৃপ্তিতে বিভোর থাকতে বলে যে, তোমরা যে আদর্শ প্রচার করছ তা-ই হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আর নিজেদের অজান্তেই আন্দোলনকর্মীরা ইসলামের প্রশংসা শুনে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। এর মাধ্যমে ইসলামের শত্রুরা ইসলামি আন্দোলনের সদস্যদেরকে তাদের সঠিক পথ থেকে সুকৌশলে বিচ্যুত করে ফেলে। কিন্তু ইসলাম কখনো চায় না যে, তার কর্মীরা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই তৃপ্ত থাকুক বরং আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ইসলাম বিকাশ লাভ করতে চায়। দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, সমস্যা বিক্ষুব্ধ এক কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়েই সে নিজেকে ক্রমান্বয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে তার কর্মীরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয় তার বাস্তব সমাধান দিয়ে তাদেরকে ধন্য করতে চায়; কিন্তু ধুরন্ধর বাতিল শক্তি জানে যে, এ পদ্ধতি তার অস্তিত্বের জন্য কত ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। সে জানে এ পদ্ধতিতে ইসলামি আন্দোলন অগ্রসর হলে অচিরেই জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে সেখানে ইসলাম তার আদর্শের প্রাসাদ গড়ে তুলবে। তাই তারা ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের অত্যন্ত সুকৌশলে এ পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত করে ভিন্ন পথে ঠেলে দেয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত প্রতিটি কর্মীকে জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীদের এসব চক্রান্ত বানচাল করে দিতে হবে এবং যে জাহেলি সমাজের মানুষেরা মানবরচিত আইন দিয়ে এখনো তাদের কোর্টকাচারি, রাষ্ট্রীয় সংবিধান তথা জীবন পরিচালনা করে, যে সমাজের মানুষেরা এখনো আল্লাহর আইনকে একমাত্র ও সর্বোচ্চ আইন হিসেবে গ্রহণ করেনি, সেই সমাজে ফেকাহ শাস্ত্রের আধুনিকীকরণের এ জীবনব্যবস্থা যে মহাজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রণয়ন করেছেন তিনিই এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও নির্ধারণ করেছেন। এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূলের জীবনে উপস্থাপিত পদ্ধতি এখন কার্যকর নয়, বরং প্রচলিত কোনো পদ্ধতিতেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে হবে-এসব কথা অবান্তর; কারণ, যিনি এ পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারপরও

যদি কেউ এমন কথা বলতে চায়, তাহলে আমাদেরকে সুস্পষ্ট করে বলতে হবে যে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনায় লিপ্ত।

সফলতা ইসলামের নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমেই আসতে পারে। এ কর্মপদ্ধতির মাঝেই নিহিত রয়েছে দ্বীনের প্রাণশক্তি।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির মাঝে কোনো তফাৎ নেই, বরং দু'টোর সমন্বয়েই আল্লাহর দ্বীন পূর্ণতা লাভ করে। একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন করার কোনো উপায় নেই। সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোনো পদ্ধতিকে যতোই যুগোপযোগী, চাকচিক্যময়, বাস্তবধর্মী মনে হোক না কেন, তার মাধ্যমে কস্মিনকালেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ও সব উপায়ে মানবরচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। তাই ইসলামের মৌলিক আকিদা গ্রহণ করা ও মৌলিক হুকুম-আহকাম পালন করা যতোটা অপরিহার্য, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত ও রাসূলের (স.) জীবনে উপস্থাপিত পদ্ধতি অবলম্বন করাও ততোটা আবশ্যকীয়। তাই তো আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন–

“অবশ্যই এ কুরআন এমন এক পথের দিকনির্দেশনা দেয়, যা অতি (সরল ও) মজবুত এবং যে সব ঈমানদার মানুষেরা নেক আমল করে, এ কুরআন তাদের (এ) সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে এক মহা পুরস্কার।” (সূরা বনী ইসরাঈল, ৯)

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামি সমাজের রূপরেখা ও তা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

সকল নবীর একই দাওয়াত

আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (স) যে দ্বীনের বাণী নিয়ে এসেছিলেন তা পৃথিবীতে নতুন কোনো বিষয় নয়; বরং পৃথিবীর শুরু থেকে সকল নবীগণ একই দাওয়াত মানবজাতিকে দিয়ে গেছেন। শেষনবী মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে দ্বীনের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সংস্করণ মানবজাতিকে উপহার দেয়া হয়েছে মাত্র। অথবা বলা যায়, সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে এ দ্বীন চূড়ান্তভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। মানব ইতিহাসের সকল নবীদের একই দাওয়াত ছিলো। আর সে দাওয়াত হলো, একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে প্রভু ও ইলাহ্ হিসেবে মেনে তাঁর কাছে সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পণ করা। এ দাওয়াত ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিক্ষিপ্ত দু'একজন বিকৃত মস্তিষ্কের লোক ব্যতীত সামগ্রিকভাবে মানবজাতি কখনো সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অস্বীকার করেনি। তবে মানবজাতি যুগে যুগে যে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তা হলো 'শিরক'। তারা অনেক সময় আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করেছে, কখনো বা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে অন্য কারো গোলামি করেছে। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে হোক, শিরক যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন, তা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে বের করে দিয়ে দূরতম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে। পৃথিবীতে যতো নবীই এসেছেন তাদের মিশন ছিলো আল্লাহর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। তারা তাদের দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সংগ্রামও করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, প্রত্যেক নবীর ইন্তেকালের পরেই তার উম্মত কিছুকাল সঠিক পথে থেকে, ধীরে ধীরে শিরকের মাঝে ডুবে গেছে। জাহেলিয়াতের ভয়াল অন্ধকার আবার তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। তবে তারা সবাই একই ধরনের শিরকে লিপ্ত হয় না; বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের শিরকে লিপ্ত হয়। কখনো আকিদা-বিশ্বাসে, কখনো বা গোলামী-আনুগত্যে, পূজা-অর্চনায়, কখনো বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার মাধ্যমে, কখনো বা একই সাথে উপরোক্ত সকল ধরনের শিরকে লিপ্ত হয়। শিরকের দরজা একবার খুলে গেলে তা সামাল দেয়া বড়ো কঠিন। এক দরজা দিয়ে তখন হাজার ধরনের শিরক এসে জীবনকে কালিমাচ্ছন্ন করে ফেলে।

মানবজাতির মর্যাদা

পৃথিবীর ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে যুগে যুগে দ্বীনের আহ্বান একই । একই পয়গাম নিয়ে সব নবীরা এসেছেন। আর তা হলো 'ইসলাম'। তবে ইসলাম বলতে বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর মুসলমানরা যা বুঝে নিয়েছে তা ইসলাম নয়; বরং ইসলাম অর্থই হলো ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার সর্বাত্মক প্রতিফলন ঘটানো এবং জীবনের সকল স্তর থেকে মানবরচিত জীবনবিধানের ঘৃণ্য পঙ্কিলতা বিতাড়িত করা। এমনকি সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে মিথ্যা 'মানবপ্রভু'দের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা। হযরত নূহ (আ.) থেকে নিয়ে মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী একই মিশন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন।

বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধান মেনেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সৃষ্টিজগতের একটি অংশ হওয়ার কারণে মানুষও স্রষ্টার আইন মেনে চলতে বাধ্য। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মানুষের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্তকণিকা সবকিছুই আল্লাহর হুকুম মেনে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। হাত কখনো বলে না আমি হাঁটতে চাই, পা কখনো বলে না, আমি লিখতে চাই। এমনিভাবে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। অথচ মানুষকে সামান্য এ স্বাধীনতা দেয়ার কারণেই সে তার প্রভুর আইন অমান্য করে স্বেচ্ছাচার জীবন যাপন শুরু করে দেয়। এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানুষের মাঝে সংগতি রক্ষার জন্যও আল্লাহর আইনের নিরঙ্কুশ আনুগত্য বাঞ্ছনীয়। মানুষের শারীরিক পুষ্টি-অপুষ্টি, সুস্থতা-অসুস্থতা, বেঁচে থাকা, মরে যাওয়া সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। পাপ-পুণ্যের পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় মানুষের নেই। এ সকল ক্ষেত্রে মানুষ একেবারে অসহায়। প্রাকৃতিক জগৎ আল্লাহর যে নিয়মানুযায়ী চলে সেখানেও মানুষের সামান্যতম কর্তৃত্ব নেই। একটু ঝড়-বাদল, বৃষ্টি-বন্যা ও ভূমিকম্পের সময়ে মানুষ অসহায়ের মতো শুধু আল্লাহকেই ডাকে। সুতরাং, আল্লাহতাআলা জীবনের যে অংশে মানুষকে পরীক্ষার জন্য স্বাধীনতা দিয়েছেন সে অংশেও মানুষের উচিত আল্লাহর কাছে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ করে তাঁর দেয়া আইনবিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা। কতো বড় নির্লজ্জ, অকৃতজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী হলে মানুষ সামান্য একটু সুযোগ পেয়েই এমন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে, তা নিতান্তই এক আশ্চর্যের বিষয়!

জাহেলিয়াত থেকে মুক্তির পথ

জাহেলিয়াতের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত রূপ থাকলেও এর মূল ভিত্তি হলো নফসের কুপ্রবৃত্তি ও মানুষ হয়ে অন্য মানুষের গোলামী করা। এর মাধ্যমে নিজের নফসকে কিংবা অন্য মানুষকে প্রভুর আসনেই বসানো হয়। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি যেহেতু আল্লাহর হুকুমের অনুগত–তাই এটা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মানুষ তার জীবনের একটি অংশে আল্লাহর আইন মানতে বাধ্য, আর ব্যবহারিক জীবনে সে স্বাধীন। তাই স্বাধীন অংশে যদি মানুষ আল্লাহর আইন মেনে না চলে তাহলে মানুষ তার নিজের সত্তার ভেতরেই একটা সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়।

জাহেলিয়াতকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। কারণ, জাহেলিয়াত নিছক কোনো মতবাদ নয়, বরং বর্তমান বিশ্বে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শেকড় গেড়ে বসেছে এবং জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকরা এর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। এ কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের প্রবর্তিত রীতিনীতি, আইন-বিধান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত করে জেঁকে বসেছে। জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকরা সংগঠিত এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত। তারা সকল শক্তি নিয়ে সারাক্ষণ তাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য তৎপর। শুধু তাই নয়, যাকেই তারা সমস্যা তথা কাঁটা মনে করে, অর্থাৎ তাদের এ জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদের জন্য কেউ যদি উঠে দাঁড়ায় তাহলে সংঘবদ্ধভাবে, একযোগে তার বিরুদ্ধে লেগে যায় এবং প্রয়োজনবোধে তারা তাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সুতরাং, একটি সুসংগঠিত, সংঘবদ্ধ, প্রতিষ্ঠিত ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য নিছক ওয়ায-নসিহত, তাত্ত্বিক আলোচনা বা ইসলামি আইনের শ্রেষ্ঠত্বের গুণকীর্তন কখনোই ফলপ্রসূ হতে পারে না। আজকের বস্তুবাদী সমাজের পুরোটাই যেখানে জাহেলিয়াত নিয়ন্ত্রিত, একটি সুসংগঠিত বিপুল জনগোষ্ঠী, সরকার, সামরিক বাহিনী যেখানে জাহেলিয়াতের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক, সেখানে মৌখিকভাবে ইসলামের আদর্শ প্রচার করে সফলতা পাওয়া তো দূরের কথা বাতিলের মুখোমুখি দাঁড়ানোটাও সম্ভব নয়। তাই জাহেলিয়াতের উচ্ছেদকল্পে ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা অবতীর্ণ হবে তাদেরকে অবশ্যই ঈমানের অপ্রতিরোধ্য বলে বলীয়ান ও সুসংগঠিত হয়ে, সর্বাত্মক জিহাদের পরিকল্পনা নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। বস্তুগত দিক থেকে না হলেও তাদেরকে সাংগঠনিক কাঠামো, পারস্পরিক সম্পর্ক, আমীরের আনুগত্য, নৈতিক উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয় সকল দিক থেকে জাহেলি সংগঠনগুলোর চেয়ে আরো বেশি সুশৃংখল ও শক্তিশালী হতে হবে। জাহেলিয়াতের স্রোতের মুখে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে তার গতি রোধ করে দিতে হবে।

ইসলামি সমাজের মূল আদর্শ

কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বৈপ্লবিক সাক্ষ্যদানই হলো ইসলামি সমাজের সর্বপ্রধান ভিত্তি। সকল নবীরা এ কালেমার ওপর ভিত্তি করেই সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সুতরাং, আরব-অনারব সকলকেই এ কালেমার সঠিক তাৎপর্য জানতে ও বুঝতে হবে। এ কালেমার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলাই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক। সুতরাং, তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন একমাত্র শাসক। চিন্তা চেতনায়, আকিদা-বিশ্বাসে, বাস্তব জীবনের সকল কাজে-কর্মে তথা আল্লাহর একত্ববাদের ছাপ রাখতে হবে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন-কানুনের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদানের মধ্য দিয়ে এ কালেমার প্রকৃত মর্ম বিকশিত করে তুলতে হবে। এভাবে কালেমার দাবি বাস্তবায়ন না করে নিছক মন্ত্র

জপার মতো পড়লে কিছুতেই সঠিক অর্থে কালেমার সাক্ষ্য দেয়া হয় না। এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কালেমার দাবি মোতাবেক উল্লিখিত সকল দিকগুলোর বাস্তব প্রতিফলনের মধ্য দিয়েই এ কালেমার সাক্ষ্য কার্যকর হয় এবং এগুলোকে যারা অস্বীকার করে তারাই কাফির, তাদেরকে নিঃসন্দেহে অমুসলিম বলা যেতে পারে। চিন্তা চেতনায়, নীতি আদর্শে এ কালেমা তখনই বাস্তব রূপ লাভ করে যখন মানুষ তার পুরো জীবন আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত করে নেয়। এ কালেমার অর্থ হলো মানুষ কোনো ব্যাপারেই মনগড়া সিদ্ধান্ত নেবে না; বরং, যে কোনো ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনার আলোকেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আর আল্লাহর হুকুম জানার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স)। কালেমায়ে শাহাদার দ্বিতীয় অংশে আমরা এ কথারই স্বীকৃতি দান করি–'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', অর্থাৎ–'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল।'

এ দু'টো চেতনাই হলো ইসলামের প্রধান প্রাণসত্তা। ইসলামি আদর্শের মূলভিত্তি। এ বিশ্বাস ও মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই ইসলাম মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান দেয়। সে সমস্যা হোক ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। হোক তা কারো সাথে সন্ধিচুক্তির বা সম্পর্কচ্ছেদের। সকল ক্ষেত্রের সকল আইনের মূলনীতি এ কালেমা।

এযাবৎ আলোচনায় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম এমন কোনো অর্থহীন প্রতীকী মতবাদ নয় যে, মন্ত্র জপার মতো দু'একটি কালেমা পাঠ করলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে, অথচ ওদিকে তার জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রগুলো চলবে জাহেলি রীতিনীতি, আইন-কানুন অনুযায়ী। সংখ্যায় তারা যতোই হোক মুসলমান দাবিদারদের অবস্থা যদি সত্যিই এমন হয় তাহলে আদৌ মানবসমাজে তাদের দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। যেসব নামধারী মুসলমানরা প্রতিষ্ঠিত জাহেলি সমাজকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে, যারা এ জাহেলি সমাজের নিয়ন্ত্রকদের সহযোগী শক্তিতে পরিণত হয়, তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক জাহেলি সমাজের চাহিদাকেই পূরণ করে চলছে। এ অপরাধদুষ্ট জাহেলি সমাজ ও সমাজের নেতৃত্বকে টিকিয়ে রাখতে তারা নিজেদের অজান্তেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। জাহেলি নেতৃত্ব যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে তখন ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের স্বার্থে তার সহযোগীরাও কাজ করে যায়। এ জন্য যে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয় তার উচিত নয় জাহেলি সমাজের স্রোতে ভেসে যাওয়া জাহেলি নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া বা সহযোগিতা করা।

জাহেলি সমাজে ইসলামের পুনর্জাগরণ

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে জ্ঞানহীনতা। যারা কালেমা পাঠ করছে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ ছাড়া কালেমার সঠিক বুঝ কারো ভেতরে আছে বলে মনে হয় না। এর সর্বপ্রধান কারণ হলো, তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করে না যে,

তারা কী পাঠ করছে। নিছক মন্ত্র জপার মতো করে কালেমা পাঠকারীদের সংখ্যায় যদি পৃথিবী ভরেও যায়, ইউরোপ আমেরিকার সবাই যদি এভাবে কালেমা পাঠ করে নেয় তাতে ইসলামের কিছুই আসে যায় না। কালেমার বিপ্লবী ঘোষণার সঠিক অর্থ বুঝে জীবনের সকল কাজকর্মে তার বাস্তব প্রতিফলন না ঘটলে এ কালেমা পাঠ করে কোনো লাভ। যখন কালেমা পাঠকারীরা এর সঠিক অর্থ বুঝবে, যখন মজবুত ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মধ্য দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে সংগঠিত করে একটি অখণ্ড ইউনিটে পরিণত হতে পারবে, যখন তারা জাহেলিয়াতকে রুখে দাঁড়াবার জন্য ঈমানি বল ও প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি অর্জন করবে, যখন জাহেলি নেতৃত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকার দ্বীনী নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম শুরু করবে তখনই তারা অর্পিত মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্ব হবে সম্পূর্ণ জাহেলি নেতৃত্বের প্রভাবমুক্ত এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত সকল কার্যক্রম হবে আল্লাহমুখী। জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে জীবন, মন ও সমাজকে সম্পূর্ণ পবিত্র করে তোলার লক্ষ্যে তারা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এ সংগ্রাম চলবে নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ও প্রতিষ্ঠিত জাহেলি বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে।

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা খুব ছোট একটি কথা দিয়ে মানুষের গোটা জীবনকে পরিবেষ্টন করে নেয়। এ মৌলিক ছোট বাক্যটি হৃদয়ঙ্গম করার সাথে সাথে তথা এ কালেমাকে গ্রহণ করার সাথে সাথে প্রথম যুগের প্রতিটি মানুষের ভেতর জন্ম নিয়েছিলো বলিষ্ঠ আন্দোলন, সক্রিয় বিপ্লব।

নিছক কোনো কাল্পনিক মতবাদ নিয়ে ইসলাম পৃথিবীতে আসেনি। আর যদি ভবিষ্যতে ইসলামের অনুসারীরা ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে তা বাস্তব ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই করতে হবে। নিছক কিছু যিকির-আযকার, নামায-রোযার নাম ইসলাম নয়। এ সংগ্রামে যারা প্রথম শরীক হয়েছিলেন তারা ইসলামকে সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন। তাই তারা নিজেদেরকে জাহেলিয়াত থেকে দূরে সরিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং প্রতিষ্ঠিত জাহেলি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তা উচ্ছেদকল্পে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বর্তমান পৃথিবীকে জাহেলিয়াতের নিকষ কালো আঁধার যেভাবে ছেয়ে ফেলেছে, যেভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাহেলিয়াত জেঁকে বসেছে, তা থেকে এ সমাজ তথা এ বিশ্বকে পবিত্র করতে হলে প্রথম যুগের মুসলমানদের পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। ইসলামের সঠিক মর্ম যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ইসলামের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভালো করে বুঝে নিতে হবে। তারপর একটি বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে সফলতা পাওয়ার আশা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা।

মানুষকে সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা

মানুষের নীতি-নৈতিকতা, কর্মক্ষমতা তথা মানবসম্পদ উন্নয়নও ইসলামি কর্মসূচির অন্ত র্ভুক্ত। তাওহিদের ভিত্তিতে যখন ইসলাম একটি উম্মাহর ভিত্তি রচনা করে তখন পারস্পরিক মজবুত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সুপ্ত মনুষ্যত্ববোধ, প্রাকৃতিক গুণাবলী ও নীতি-নৈতিকতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী করে তোলা নেহাত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাণী হিসেবে মানুষের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যেগুলো সমভাবে অনেক পশুরও রয়েছে। তবে, সেগুলো মানুষের পরিচয় বহন করে না। মানুষ হিসেবে যে বিশেষ গুণাবলী ও বিশেষ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন সেগুলোই মানুষের পরিচয়বাহী গুণ। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান পশুসুলভ বৃত্তিগুলোর ওপরে মনুষ্যত্ববোধ ও নৈতিক গুণাবলীর প্রাধান্য বিস্তার করার মতো আধ্যাত্মিক শক্তিই একজন মানুষকে সত্যিকার মানুষ করে তোলে। মানুষের মধ্যে শুধু পশুসুলভই নয়; বরং বিশেষ কিছু দিকের সাথে জড়পদার্থেরও মিল রয়েছে। আর কিছু বিভ্রান্ত, বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক নামধারী এ যুক্তি তুলে মানুষকে জড়পদার্থের পর্যায়ে নামিয়ে আনার অসার কল্পনায় ডুবে আছে। তাদের চিন্তা যে কতোটা ভ্রান্ত ও অমূলক তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। (ধরুন একটি অফিসে এক'শ জন স্টাফ রয়েছে, তবে তাই বলে সবাই কি ডাইরেক্টর? না। অথচ এ ডাইরেক্টরের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যা সাধারণ স্টাফদের মধ্যেও রয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য সমভাবে সবার মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও বিশেষ কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলীর কারণেই এ লোকটিকে ডাইরেক্টরের চেয়ারে বসানো হয়েছে।) ঠিক তেমনি সৃষ্টিজগতের সদস্য হিসেবে কোনো মৌলিক বৈশিষ্ট্য সবার মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা অন্য কাউকে দেননি। মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তাঁর খিলাফত দান করে সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত আসনে সমাসীন করেছেন। অনস্বীকার্য বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অনেক জাহেলি সমাজের বিজ্ঞানীও একথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তবে তারপরও নির্লজ্জের মতো সুস্পষ্ট বক্তব্য না দিয়ে বিভিন্নভাবে বিষোদগার করছে।

এ ধরনের মান-মর্যাদাহীন কথাবার্তাকে ইসলাম মোটেই গুরুত্ব দেয় না। ইসলাম সব সময় মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনের চেষ্টা করে। কেননা, এ নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ও পশুসুলভ বৃত্তি দমনের মাধ্যমে মানুষকে সত্যিকার মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করা ইসলামি সমাজের মহান লক্ষ্য। এ পদ্ধতিতেই গড়ে ওঠে একটি অতুলনীয় আদর্শসমাজ। এ সমাজের ভিত্তি হলো আল্লাহভীতি, নীতিনৈতিকতা ও আদর্শ। এ সমাজ ভাষা, বর্ণ, জাতীয়তাবাদ ও ভৌগলিক সীমারেখাভিত্তিক দুর্বল বন্ধন

ছিঁড়ে ফেলে ঈমান ও নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে এক 'মেগা পরিবার' গড়ে তোলে। সকল বর্ণ, গোত্র ও অঞ্চলের মানুষের জন্য এ পরিবার বা এ সমাজের দ্বার থাকে সদা উন্মুক্ত। এ কারণেই ইসলামি সমাজে বৈচিত্র্যময় মেধা ও মননশীলতার সমন্বয় ঘটে। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানরা ইসলামের এ মহান আদর্শ অনুসরণ করেই বিশ্বের ইতিহাসের সর্বাধিক সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। ইসলামি আদর্শের এ মহামিলনে মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী, মেধাবী ও প্রতিভাবান স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান করেছিলেন।

ইসলামের এ 'মেগা পরিবার'-এর গর্বিত সদস্য হয়েছিলো আরব, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, মরক্কো, তুরস্ক, চীন, ভারত, রোম, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বর্ণ গোত্রের মানুষ। তাদের মাঝে বিদ্যমান বিভিন্ন গুণাবলী, বৈচিত্র্যময় আঞ্চলিক চালচিত্র, সবই ইসলামি আদর্শের অভিন্ন সুতায় গেঁথে গিয়েছিলো। পারস্পরিক মজবুত ভ্রাতৃত্ববন্ধন, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও মেধার মূল্যায়নের মাধ্যমে তারা গড়ে তুলেছিলেন এক অবিস্মরণীয় সভ্যতা। আজকাল কিছুসংখ্যক বিকৃত মস্তিষ্কের ও সংকীর্ণ জ্ঞানের বুদ্ধিজীবীরা সেই সভ্যতাকে নিছক আরবসভ্যতা বলে চালিয়ে দিয়ে মহান ইসলামি আদর্শের অমর কৃতিত্বকে ম্লান করে দিতে চায়। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, সে সভ্যতা কখনোই আরবসভ্যতা ছিলো না; বরং সেটা ছিলো সার্বজনীন এবং একটি নির্ভেজাল ইসলামি সভ্যতা। এ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো ঈমান ও ইসলামের মূলনীতির ওপর।

বর্ণ, ভাষা, গোত্র, জাতীয়তা, অঞ্চল নির্বিশেষে ইসলামের গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকলেই এ সমাজ তথা সভ্যতা নির্মাণে যথাসাধ্য ভূমিকা রাখেন। প্রত্যেকেই নিজের সবটুকু সামর্থ্য, যোগ্যতা ও মেধা উজাড় করে দিয়ে এ সভ্যতার ভিত্তি মজবুত করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এ কাজ তাদেরকে কেউ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে করায়নি, বরং ইসলামি সমাজের সম্মানিত সদস্য হওয়ায় প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। তাই প্রত্যেকেরই যোগ্যতা, মেধা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছিলো এ সমাজের স্বাভাবিক দৃশ্য। যে কারণে, তাদের মধ্যে এমন ধরনের উন্নত মানবিক গুণাবলী আমরা দেখতে পাই, যা পৃথিবীর কোনো জাতির ইতিহাসই আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি।

এমন আদর্শ সমাজের কোনো চিত্র ইতিহাসে নেই। তবে ঐতিহাসিকরা রোমান সভ্যতাকে একটা সামগ্রিক ও সার্বজনীন সভ্যতা হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। কারণ বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ, অঞ্চলের লোক এ সমাজে একত্রিত হয়েছিলো। যে যাই বলুক না কেন, বাস্তবতার দৃষ্টিতে এ ধরনের আদর্শহীন সামষ্টিক সমাজের কোনো মূল্য নেই। কারণ, সে সমাজ কোনো আদর্শভিত্তিক সমাজ ছিলো না। সে সমাজ কোনো মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। কোনো নীতিনৈতিকতার যোগসূত্রে তারা একত্রিত

হয়নি; বরং শ্রেণী বিভাগই ছিলো সেই সমাজের মূল ভিত্তি। একদিকে ছিলো মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত শাসকশ্রেণী, অপরদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের দাস শ্রেণী। তাছাড়া গোত্রীয় বিভেদও তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো। রোমীয় গোত্রের লোকদেরকে সমাজের শাসক হিসেবে সর্বত্রই অন্যরা আনুগত্য প্রদানে বাধ্য থাকতো। যে কারণে ইসলামি সমাজের মতো স্বাধীনতা সে সমাজ কখনোই দিতে পারেনি, কখনোই তারা ইসলামি সমাজের মতো কোনো সার্বজনীন কল্যাণধর্মী সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি।

এরপরের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঘৃণ্য অধ্যায়। এরা এক দিক থেকে রোমান সাম্রাজ্যেরই উত্তরাধিকারী। নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষাই ছিলো এ সাম্রাজ্যের মূলনীতি। স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে তারা তাদের উপনিবেশগুলোতে চরম শোষণ চালিয়েছে। সেসব অঞ্চল থেকে বিভিন্নভাবে লুটতরাজ করে নিজেদের ভোগ বিলাস নিশ্চিত করেছে। জাতীয় স্বার্থের ঘৃণ্য লোভই এ সাম্রাজ্যের মূল লক্ষ্য এবং বৃটিশরাই এর হর্তাকর্তা। এছাড়াও অতীতের স্পেন, পর্তুগীজ এবং আধুনিককালের ফ্রান্সসহ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাস একই স্বার্থবাদী সূত্রে গাঁথা।

এরপর কম্যুনিজম এসে বিশ্ববাসীকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলো। তাদের গোত্র বর্ণ, ভাষা ও আঞ্চলিকতার জাতীয়তাবাদমুক্ত সমাজ দেখে অনেকেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু এরা কেউ লক্ষ করেনি, এ সমাজও সকল মানবিক ভিত্তি পরিত্যাগ করে নিছক শ্রেণী বিভাগের ওপর দাঁড়ানো এক ঠুনকো সমাজ। এদিক থেকে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের মূলনীতির সাথে এ সাম্রাজ্যের তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

রোমান সাম্রাজ্যে প্রাধান্য ছিলো বিত্তশালী সম্ভ্রান্তদের, আর এখানে প্রোলেটারিয়েটদের। প্রতিটি সমাজেই এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে চরম হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। এ ধরনের সমাজব্যবস্থা মানবজাতির জন্য চরম অপমানজনক পরিণতি বয়ে আনে। কারণ, এদের মূলনীতিটাই এমন যে, এর দ্বারা মানবীয় সৎ গুণাবলী ও নীতিনৈতিকতাকে গলা টিপে হত্যা করা হয় এবং পশুবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। পশুবৃত্তিকে জাগ্রত করে তোলাই যেন এদের মূল কর্মসূচি। এ কথা আমরা নিছক কোনো আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে নয়; বরং সুনির্ধারিত তথ্যের ভিত্তিতেই বলছি। দেখুন, পশুর মতো দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে কি শুধু 'খাদ্য, বাসস্থান এবং যৌনক্ষুধা নিবারণ'–এগুলোকেই মানুষ তার মৌলিক প্রয়োজন নির্ধারণ করতে পারে? এ কারণে মানবসভ্যতার ইতিহাসকে কম্যুনিষ্টরা নিছক খাদ্যশস্য সংগ্রহের ইতিহাস বলেই আখ্যায়িত করে।

এসব বাস্তবধর্মী ও সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলাম মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবন-বিধান। কারণ, এ জীবন বিধান এসেছে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, প্রতিপালক, মহাজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয়ত, এ জীবনব্যবস্থা মানুষকে মানুষ বলেই বিবেচনা করে। একারণে সে মানুষের মাঝে সুপ্ত গুণাবলী, নীতিনৈতিকতা ও সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেয়। মানবিক গুণাবলী বিকাশের জন্য উপযুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সে হয় বদ্ধপরিকর। এ জীবনব্যবস্থা যে নজীর স্থাপন করেছে, ইতিহাসে তার কোন উপমা নেই। মানবতা বিবর্জিত মানবদুশমনেরাই এ সব মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপেক্ষা করে গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী কিংবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ার চেষ্টা করে। তারা মানুষের প্রাকৃতিক মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ চায় না। ইসলাম চায় সকল ধরনের জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ এমন একটি সামগ্রিক ও সার্বজনীন সমাজ গড়ে তুলুক যেখানে সকলের মেধা, যোগ্যতা ও গুণাবলী দ্বারা সবাই কল্যাণ লাভ করতে পারে, সবাই উপকৃত হতে পারে। এদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা বলেন–

"(হে নবী, এদের) বলো, আমি কি তোমাদের এ লোকদের কথা বলবো যারা আমলের দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত (হয়ে পড়েছে)? (এরা হচ্ছে) সেসব লোক যাদের সমুদয় প্রচেষ্টা এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে মনে ভাবছে তারা (বুঝি) ভালো কাজই করে যাচ্ছে। এরাই হচ্ছে সে সব লোক, যারা তাদের মালিকের আয়াতের সাথে কুফরি করে এবং (অস্বীকার করে) তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়টিও। ফলে এদের সব কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়; তাই কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য ওজনের কোনো মানদণ্ডই স্থাপন করবো না। জাহান্নাম হলো তাদের যথার্থ পাওনা। কেননা, তারা কুফরি করেছে, (উপরন্তু) তারা আমার আয়াতসমূহ ও (তার বাহক) রাসূলদেরকে বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।" (সূরা কাহাফ, ১০৩-১০৬)

চতুর্থ অধ্যায়

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

পর্যায়ক্রমিক জিহাদ

ইমাম ইবনে কাইয়্যূম তার 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে 'নবুওয়াতি জীবনে কাফির ও মুনাফেকদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের নীতি' শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে বিজ্ঞ গ্রন্থকার জিহাদের পর্যায়ক্রমিক স্তর বিন্যাস ও জিহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম আয়াত হলো–

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি পড়ো (পড়ো) তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, (যিনি) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত (আলাক) থেকে। তুমি পড়ো এবং (জেনে রেখো), তোমার প্রভু বড় মেহেরবান, যিনি (মানুষকে) কলম দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিয়েছেন, মানুষকে এমন সব কিছু শিখিয়েছেন যা তিনি (না শেখালে) সে জানতেই পারতো না।" (সূরা আলাক, ১-৫)

এই আয়াতগুলোর মধ্য দিয়ে আল্লাহর নবীর নবুওয়াতি জীবনের সূচনা হয়। সূচনার এ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাকে শুধু পড়ার হুকুম দেন। প্রচারের নির্দেশ তখনো দেননি। পরবর্তী পর্যায়ে নাযিল হয় সূরা মুদ্দাছ্ছির। এভাবে প্রথম আয়াত 'ইক্‌রা'র মাধ্যমে নবুওয়াত এবং দ্বিতীয় 'ইয়া আইউহাল মুদ্দাছ্ছির' আয়াতের মাধ্যমে রিসালাতের দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে আল্লাহর রাসূলকে নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, সমগ্র আরব এবং গোটা বিশ্বমানবতার কাছে তাওহিদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহর নবী আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ীই দাওয়াতি মিশন পরিচালনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি কোনোরকম যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই প্রায় তেরটি বছর মানুষের মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। আল্লাহর সঠিক পরিচয় এবং আল্লাহর একত্ববাদের সঠিক রূপরেখা তুলে ধরার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এই সময়ে তিনি ও তাঁর সাহাবিরা অমানবিক যুলুম-নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও কারো প্রতি কোনোরকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেননি, বরং সম্পূর্ণ ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এটা অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ ছিলো।

এরপর তাঁকে সাহাবীদের নিয়ে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। হিজরতের পরবর্তী সময়ে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয় এবং যারা মুসলমানদের কাজে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি করেনি এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে উস্কে দেয়নি, তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করেনি, তাদের ব্যাপারে সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর যখন আস্তে আস্তে আল্লাহর দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, মুসলমানরা যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠেন, তখন কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ ঘোষণার নির্দেশ দেয়া হয়। এ পর্যায়ে কাফিরদের সাথে নীতিগত অবস্থানের ব্যাপারে তাদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

১. চুক্তিবদ্ধ ২. যুদ্ধরত ৩. জিম্মি।

যেসব কাফিরদের সাথে আল্লাহর রাসূল পূর্ব থেকেই কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চুক্তি রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ তোমরাও নিয়মমাফিক চুক্তি রক্ষা করে চলবে। তবে হাঁ, তাদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গ করে মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলার সন্দেহ দেখা দিলে, কোনোরকম লুকোচুরি না করে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলকে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। যারা প্রকাশ্যে চুক্তি ভঙ্গ করেনি, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আভাস পাওয়া গিয়েছে, তাদেরকে যথানিয়মে চুক্তি বাতিলের নোটিশ না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সূরা তাওবাতে আল্লাহ তাআলা তিনটি শ্রেণীর ব্যাপারেই তাঁর নীতি ঘোষণা করেন। এই বিধানে বলা হয়, আহলে কিতাবিরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করবে বা নিজ হাতে জিযিয়া না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ শুরুর নির্দেশ দেয়া হয়। এই দুই শ্রেণীর সাথে জিহাদের পদ্ধতি ছিলো দু'ধরনের। কাফিরদের বিরুদ্ধে সরাসরি সশস্ত্র জিহাদ, আর মুনাফিকদের সামনে অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে মৌখিক জিহাদ শুরু হয়।

সূরা তাওবার প্রথম আয়াতেই কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পাদিত আল্লাহর রাসূলের সকল চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের চুক্তির ধরন ও প্রকারভেদে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং তিন শ্রেণীর ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে একই নীতি হলেও সাময়িকভাবে তিনরকম নীতি ঘোষণা করা হয়।

১. যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

২. মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ যেসব কাফিররা চুক্তি ভঙ্গ করেনি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতাও করেনি, তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

৩. অনির্দিষ্টকালের জন্য চুক্তিবদ্ধদের মধ্যে যারা যথাযথ সম্মানের সাথে চুক্তি মেনে চলছিলো তাদেরকে চার মাস সময় দেয়া হয়। এই সময়ের পর তারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ না করলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়।

আল্লাহর রাসূল কুরআনের হুকুম যথানিয়মে বাস্তবায়িত করেন। এতে দেখা যায় যে, তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারাও জিযিয়া (ট্যাক্স) প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নেয়। আমরা সার্বিক অবস্থা ও কুরআনের নির্দেশনা বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, সূরা তাওবা নাযিল হওয়ার পর কাফিররা সর্বমোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়।

১. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফির।
২. চুক্তিবদ্ধ কাফির।
৩. জিম্মি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাফিররা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে কাফিরদের এই শ্রেণীটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাকি থাকে দুটি শ্রেণী–

(১) যুদ্ধরত ও (২) জিম্মি।

আমরা এই নীতির আলোকে সারা পৃথিবীর মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখতে পাই। প্রত্যেকটি জাতি এর কোনো না কোনো দলে বিভক্ত। ১. নবীর আনীত দ্বীনের প্রতি ঈমানদার মুসলমান। ২. নিজ নিজ ধর্মাবলীম্ব জিম্মি। ৩. যুদ্ধরত কাফির। চতুর্থ আরেকটি বহুল আলোচিত শ্রেণী যদিও রয়ে গেছে তবে তাদের ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়নি। কারণ, এরা হলো বর্ণচোরা, কপট, মুনাফিক। এরা নিজেদেরকে মুসলমানই দাবি করে, মুখে ঈমানের ঘোষণা দেয়, অথচ তারা ঈমানদার নয়। জাহান্নামের এই কীটগুলোর ব্যাপারে কোনো সাধারণ ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। তাদের বাহ্যিক ঈমানের দাবি ও আনুগত্য মেনে নিতে বলা হয় এবং অন্তরের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতে বলা হয়। তবে তাদের চরিত্রের এই কপটতা দূরীকরণের জন্য যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে সত্যিকার অর্থে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

এদিকে কুরআনের সরাসরি আয়াতের মাধ্যমে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে, তাদের জন্য দোয়া করতে, তাদের কবরের পাশে দাঁড়াতে, এমনকি তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া পর্যন্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। সর্বশেষ পর্যায়ে এও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নবীও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এমনকি যদি সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও তাদের মাফ করা হবে না।"

আমরা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো, ইমাম ইবনে কাইয়ুমের এতক্ষণের আলোচনায় ইসলামি জিহাদের পর্যায়ক্রমিক সকল স্তরগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ প্রক্রিয়ার মাঝে নিহিত রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী জিহাদী পরিকল্পনা। এগুলো পর্যালোচনা করলে অনেক ইতিবাচক দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো।

জিহাদের প্রথম স্তর ঃ দ্বীনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, এই দ্বীন কল্পনাবিলাসী বা অলৌকিক কিছু নয়; বরং আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত একটি জীবনবিধান। যমিনে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রয়েছে বাস্তব পন্থা ও যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়-উপকরণ। মানুষ পঙ্কিলতার যতো নীচেই চলে যাক না কেন, সে চাইলে দ্বীন তাকে

মুহূর্তে নিজের শান্তিময় কোলে টেনে নিতে পারে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম শুরু করার সাথে সাথে জাহেলি সমাজব্যবস্থা ও তার কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। কারণ প্রতিষ্ঠিত সমাজের কাঠামো, মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে জাহেলিয়াতের ওপর। সুতরাং সংঘর্ষ তো অনিবার্য হবেই। তাই ইসলামি আন্দোলনের মুজাহিদদেরকেও ঈমানি বলে বলীয়ান হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক উপায়-উপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও চেষ্টা করতে হবে-শত্রুদের সাথে অন্তত সমান সমান থাকার।

ইসলামি আন্দোলন একই সাথে উভয়বিধ কাজের আঞ্জাম দেয়। মানুষের চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত জাহেলি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদের জন্য সামরিক শক্তিসহ প্রয়োজনীয় সব রকম উপায়-উপকরণ দ্বারা জিহাদ পরিচালনার আদেশ দেয়। এই পথ অবলম্বন না করে কোনো উপায়ও নেই। কারণ, জাহেলি সমাজের নেতারা তাদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদকে বাধাগ্রস্ত করে। তারা মানুষকে ইসলামের পথে আসতে বাধা দেয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধুঁয়া তুলে তাদের প্রতিষ্ঠিত কুফরী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য করে। সাধারণ ও দুর্বল ঈমানের মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে সেসব জাহেলি নেতাদের আনুগত্য করা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না। তাই কোনো মানুষকে জোর করে তার বিশ্বাস পরিবর্তন করতে ইসলাম যেমন বাধ্য করে না; ঠিক তেমনি, যারা পার্থিব শক্তিপুষ্ট হয়ে মানুষকে ইসলামের পথে আসতে বাধা দেয়, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে শুধু ওয়ায-নসিহতকেই ইসলাম যথেষ্ট মনে করে না; বরং এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়। এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য উল্লিখিত 'দাওয়াত ও সামরিক' উভয় পন্থা প্রয়োগ সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়; বরং জাহেলি নেতাদের গোলামির শেকলে বন্দী বিশ্বমানবতাকে উদ্ধার করে একমাত্র আল্লাহর অনুগত করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

জিহাদের দ্বিতীয় স্তর ঃ আল্লাহর দ্বীনের আরো বৈশিষ্ট্য হলো এই দ্বীন 'এক লাফে তালগাছে ওঠা'র নীতি অবলম্বন করে না। একসাথে সব হুকুম চাপিয়ে দিয়ে মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে না। বরং এই আন্দোলন সুপরিকল্পিতভাবে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় এবং প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে। একটি ধাপ অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই সে পরবর্তী ধাপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। জাহেলি নেতৃত্ব যখন এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত উপায়-উপকরণ নিয়ে মাঠে নামে তখন নিছক ওয়ায-নসিহতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার কথা ইসলাম বলে না। পক্ষান্তরে অলংঘনীয় কোনো বাধাধরা নিয়মের ছকে চলতেও বাধ্য করে না। এমন অনেকেই রয়েছেন যারা জিহাদের আয়াত উদ্ধৃত করেই জিহাদের

আলোচনা করেন, কিন্তু ইসলামি আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক স্তর সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বুঝতে সক্ষম হন না। আন্দোলনের কোন স্তরে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এই পর্যায়ে আয়াতটি নাযিল হওয়ার তাৎপর্য কী–তাও তারা বুঝে উঠতে পারেন না। কুরআনের আয়াত নাযিলের এই স্তরগুলোর সঠিক তাৎপর্য না বুঝার কারণে তারা জিহাদের সঠিক রূপরেখা ও তাৎপর্যকে বিকৃত করে ফেলেন। আন্দোলনের স্তরগুলোর সাথে কুরআনের আয়াতের গভীর সম্পর্কের দিকগুলো না জানার কারণে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন এবং প্রত্যেকটি আয়াতকেই তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মনে করেন।

আসলে বর্তমানের নামসর্বস্ব মুসলমানেরা জাহেলি সমাজে জন্মগ্রহণ করে, অধঃপতিত মুসলমান সমাজের হতাশাজনক অবস্থা ও তাদের দুর্বল সমরশক্তি দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কারণেই তারা এমন পরাজিত মানসিকতার শিকার হয়েছেন। এই পরাজিত মানসিকতার কারণেই তারা বলেন, 'ইসলাম শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধেরই অনুমতি দেয়'। এসব অপব্যাখ্যার দ্বারা আল্লাহর দ্বীনকে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেও তারা মনে করে যে, তারা ইসলামের বিরাট কল্যাণ সাধন করছে। অথচ তাদের এ সব ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে ইসলাম তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে ফেলবে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে তাগুতি শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করে মানুষকে তাদের গোলামি থেকে মুক্ত করার কর্মসূচি বলতে আর কিছু থাকে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম গর্দানে তলোয়ার ধরে কাউকে তার ধর্মমত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। বরং প্রতিটি মানুষ যেন তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার লালন করতে পারে, নিজ ধর্ম পালন করতে পারে সে জন্য ইসলাম যুলুমবাজ তাগুতি শক্তিকে উচ্ছেদ করে জনগণের স্বাধীনতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেয়। তাইতো ইসলাম জিযিয়া দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিধর্মীদেরকে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করারও সুযোগ দেয়। শুধু সৃষ্টিজগতের একচ্ছত্র সার্বভৌম মালিকের জীবন-বিধান গ্রহণ করতে এবং তা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে যারা বাধা দেয় তাদের আমূল উচ্ছেদই ইসলামের জিহাদের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষই স্বাধীনভাবে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, এতে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।

জিহাদের তৃতীয় স্তর ঃ এই আন্দোলনের তৃতীয় আরেকটি দিক হলো যে, যতো যুলুম-নির্যাতন, বাধা-বিপত্তি, হত্যাযজ্ঞ ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই সে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। আল্লাহর নবী তার নবুওয়াতি জীবনে যখন যে স্তরে যাদেরকেই দাওয়াত দিয়েছেন, তাদেরকে একটু খুশি করার জন্য দাওয়াতের মূল বক্তব্য প্রকাশে কোনোরকম লুকোচুরি বা অস্পষ্টতার আশ্রয় নেননি। ইসলামের বাণী সুস্পষ্টভাবে, আপসহীন নীতিতেই তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি যাদেরকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকে প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন যে, এই দাওয়াত হলো প্রতিষ্ঠিত জাহেলি সমাজের মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা

ও আইন প্রণেতা হিসেবে যারা মানুষের প্রভু সেজে বসেছে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার দাওয়াত। এ দাওয়াত হলো মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর গোলামিতে আত্মনিয়োগ করার দাওয়াত। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র নমনীয়তা বা আপসের সুযোগ নেই। এ আহ্বানকে ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবমুখী এবং সুপরিকল্পিত নীতিমালা অনুসরণ করেই আন্দোলন তার প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করে।

জিহাদের চতুর্থ স্তর ঃ এ পর্যায়ে আলোচনা করা হবে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অমুসলিমদের সাথে কোন ক্ষেত্রে কী নীতি অবলম্বন করবে সে সম্পর্কে। অবশ্য ইতেঃপূর্বে উদ্ধৃত 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থের অংশে এ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ইসলাম যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া জীবনবিধান, সেহেতু প্রতিটি মানুষের জন্যই এই জীবনবিধান গ্রহণ করা নীতিগতভাবে বাধ্যতামূলক। তারপরও আল্লাহ তাআলা যেহেতু মানুষকে দুনিয়ার জীবনে চলার পথ নির্ধারণের স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেহেতু যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে অন্য কোনো ধর্মমত নিয়ে জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে ইসলামি শরিয়ত তার ওপর শক্তি প্রয়োগের বৈধতা দেয় না। তবে হাঁ, কোনো অবস্থাতেই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অধিকার পাবে না। প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে অথবা সামাজিক ও রাজনৈতিক কোনো প্রকার শক্তি প্রয়োগ করে কেউ ইসলামের বিরোধিতা করবে'তা কিছুতেই ইসলাম বরদাস্ত করবে না। ভিন্ন-ধর্মীদের অবশ্যই ইসলামের সাথে আপস করে, নত হয়ে এবং জিযিয়া দিয়ে চলতে হবে। যদি কেউ ইসলামের বিরুদ্ধাচরন করে, মানুষের ইসলাম গ্রহণ কিংবা ইসলামি আইনকানুন পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মৃত্যুবরণ অথবা বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত ইসলাম সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখবে।

দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে মুসলমানদের চরম দুরবস্থার কারণে পাশ্চাত্যের হীন প্রপাগাণ্ডার কাছে মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে যেসব অতি পণ্ডিতরা ইসলামি আদর্শ থেকে 'জিহাদ' নামের কলঙ্ক(!) দূর করার চেষ্টা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান তারা মূলত ইসলামের দু'টো নীতি বুঝতে না পারার কারণে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

প্রথম নীতিটি হলো, 'লা ইক্‌রাহা ফিদ্‌দীন' অর্থাৎ ইসলামে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।

দ্বিতীয়টি হলো, যেসব অপশক্তি মানুষকে আল্লাহর গোলামি থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের গোলামি করতে বাধ্য করে, সেসব অপশক্তির বিরুদ্ধে ঘোষিত আপসহীন জিহাদ।

আপনি যদি এই দু'টো মূলনীতি বিশ্লেষণ করেন তাহলে নিজেই বুঝতে পারবেন, এ দু'টির মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই। স্ব স্ব ক্ষেত্রে দু'টি নীতি সমানভাবেই বাস্ত

বায়নযোগ্য। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রভুদের গোলামি করেই যেসব পরাজিত ও দুর্বল মনোভাবাপন্ন 'স্কলাররা' শান্তি পায়, তারা বিভিন্নরকম কথার ফুলঝুরি আর গোঁজামিলের যুক্তি দিয়ে ইসলামের জিহাদকে নিছক 'আত্মরক্ষামূলক জিহাদ' বলে চালিয়ে দিতে চান। তারা তাগুতি শক্তির উচ্ছেদ করতে গিয়ে ঘোষিত জিহাদকে ঝামেলা মনে করেন, কলঙ্ক ভাবেন। তারা বর্তমান পৃথিবীতে ঘটমান স্বার্থভিত্তিক, নোংরা ও হীন উদ্দেশ্যে পরিচালিত নৃশংস যুদ্ধের পাশাপাশি ইসলামের সুমহান 'জিহাদের' তুলনামূলক আলোচনা করেন। অথচ ইসলামের জিহাদের ধরন, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনো দিক থেকেই এসব বর্বর যুদ্ধের মতো নয়; বরং যুদ্ধের কারণ, ধরন সবই ভিন্ন। বর্তমান বিশ্বের এসব নোংরা বর্বর যুদ্ধের সাথে ইসলামি জিহাদের কোনো সামঞ্জস্য নেই। ইসলামি জিহাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি যদি বুঝতে হয় তাহলে আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃতি, বিশ্বজগতে এর ভূমিকা, দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আল্লাহর নবীর রিসালাত ও তাঁর জীবনে অনুসৃত পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবশ্যই যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এসবের মাঝেই ইসলামের জিহাদের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী ঘোষণা

দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার অর্থই হলো, সকল ধরনের অবৈধ দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা। অন্য কোনো মানুষের গোলামি তো দূরের কথা নিজের কুপ্রবৃত্তির গোলামি থেকেও এ দ্বীন মানুষকে মুক্তি দান করে। সকল মানুষ যেহেতু আল্লাহর করুণা নিয়েই বেঁচে থাকে এবং আল্লাহর দেয়া জীবন, শরীর, রিযিক, আলো-বাতাস, তথা সকল নিয়ামত ভোগ করে থাকে, সেহেতু জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ পথে যে বা যারাই বাধা দেবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক জিহাদ ঘোষণার নামই হলো ইসলাম। কেননা, মানুষের জন্য আইনকানুন তৈরি করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবি করা কার্যত আল্লাহর ক্ষমতা দাবি করারই নামান্তর। অর্থাৎ যে সমাজে মানুষই মানুষের জন্য আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখে, যে সমাজে মানুষই বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান দেয়, যে সমাজে মানুষই স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থার ব্যাপারে আইন ও নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখে, (বর্তমানে যেভাবে এমপি, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিরা ক্ষমতা রাখে) সে সমাজের এসব নেতারা মূলত নিজেদেরকে 'রব'ই দাবি করে। তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে। আর যারা এসব নেতাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মেনে নেয়, কুরআনের ভাষায় তারা মূলত ঐসব নেতাদেরকে আল্লাহর বিকল্প 'রব' হিসেবেই গ্রহণ করে থাকে। তাই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে নেয়ার অর্থই হলো, এসব কায়েমী ফেরাউনদের হাত থেকে সকল কর্তৃত্ব ছিনিয়ে এনে আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতা আল্লাহরই হাতে অর্পণ করা এবং এসব ফেরাউনদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করা।

কেননা, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে মানুষকে তাদের হুকুমের গোলাম করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআন দ্বীর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে–

“তিনিই হচ্ছেন (একমাত্র সত্তা) যিনি আসমানেও মাবুদ, যমিনেও মাবুদ, তিনি বিজ্ঞ কুশলী, (তিনিই) সর্বজ্ঞ।” (সূরা যুখরুফ, আয়াত- ৮৪)

“তাঁকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছো তা তো কতিপয় নামমাত্র, (অজ্ঞতাবশত) যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে দিয়েছ; অথচ আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। (মূলত) আইন ও বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। আর (এ বিধানের বলেই) তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো গোলামি করবে না; (কারণ) এটাই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান, কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এটা) জানে না।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০)

“(হে নবী) যাদের ওপর আমি কিতাব নাযিল করেছি (তাদের) তুমি বলো, এসো আমরা (উভয়ে একমত হই) এমন এক কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের কাছে এক (ও অভিন্ন এবং সে কথাটি হচ্ছে এই), আমরা উভয়ই আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো গোলামি করবো না, তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানাবো না এবং (সর্বোপরি) এক আল্লাহ তাআলা ছাড়া নিজেদেরকেও একে অপরের প্রভু বলে মেনে নেবো না। তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের তুমি বলে দাও তোমরা সাক্ষী থেকো যে, আমরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যে মাথা নত করে দিয়েছি।”
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪)

গির্জার শাসন বলতে যেমন খৃষ্টানদের নিজেদের নির্বাচিত পবিত্র (?) মানুষের শাসনকে বুঝায়, পীর-পুরোহিতবাদ বলতে যেমন কিছু লোকের মনগড়া আইনকানুন বুঝায়; ইসলাম কিছুতেই এগুলোর মতো এমন কোনো শাসনব্যবস্থা নয়। ইসলাম হলো গোটা সৃষ্টিজগতের একচ্ছত্র সার্বভৌম স্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত শাসনব্যবস্থা। আল্লাহর শাসন অর্থ হলো, মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর আইনই গৃহীত হবে, সকল বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহর আইনের মাধ্যমেই হতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র বা মুসলিম রাষ্ট্র বলতে এমন রাষ্ট্রকেই বুঝায়, যে রাষ্ট্রে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, শিল্প, বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনে ঘোষিত নীতিমালাই হয় চূড়ান্ত। এমন শাসনব্যবস্থাকেই বলে ইসলামি শাসন, এমন দেশকেই বলে মুসলিম দেশ।

তবে কাগজে-কলমে বিষয়টি বুঝে নেয়া সহজ হলেও বাস্তবে এ ধরনের শাসন, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, বর্তমান সরকারের লোকগুলো তো নিজেদেরকে মুসলমানই দাবি করে। সুতরাং, এদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিলে এরা সাথে সাথে এসে বলবে যে, ‘জ্বি হুযুর আপনি যা

বলেছেন সবই তো সত্য কথা, তাই আমরা তাওবা করে নিলাম। আসুন, আমরা আপনাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিই, আপনারা আল্লাহর আইন দিয়ে দেশ চালান'। এমনটি ইতিহাসে যেমন কখনো হয়নি, তেমনি ভবিষ্যতেও কোনো সম্ভাবনা নেই। তাগুতি সরকারব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা, মানুষের প্রভুত্ব খতম করা, যালিমদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে এনে আল্লাহর হাতে অর্পণ করা, আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা নিছক সুরেলা ওয়ায-নসিহত দিয়ে কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। ওয়াযের সুরে মুগ্ধ হয়ে কিছুতেই তাগুতরা শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেবে না। আল্লাহর নবীদের ইতিহাস আমাদের এমন শিক্ষাই দেয়। নবীদের হাজার বছরের ইতিহাস পাঠে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদেরকে কখনো তাদের জাতি লালগালিচার সংবর্ধনা দেয়নি, তাদেরকে সহজে বরণ করে নেয়নি; বরং তারা অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ কখনোই সহজ হয়নি।

আল্লাহর সার্বভৌমিকতার ঘোষণা এবং প্রতিষ্ঠিত অন্য সবার সার্বভৌমিকতার দাবি অস্বীকার করা নিছক কোনো দার্শনিক মতবাদ বা ওয়ায-নসিহত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের ওপর থেকে প্রতিষ্ঠিত মানুষের শাসনকে সমূলে উচ্ছেদ করা এবং তাদেরকে আল্লাহর দাসত্বের অধীনে নিয়ে আসাই হলো এই বিপ্লবী ঘোষণার লক্ষ্য। সুতরাং, একথা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের সঠিক রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরার সাথে সাথে একটি সুগঠিত ও সুপরিকল্পিত সংগ্রাম পরিচালনা করা অপরিহার্য। এই সংগ্রাম সুপরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী তার প্রতিটি স্তর অতিক্রম করবে এবং প্রতিটি স্তরেই যারা এই সংগ্রাম প্রতিহত করতে চাইবে তাদেরকে যে কোনো উপায়ে প্রতিরোধ করবে।

অতীত বর্তমান সব যুগেই দেখা যায়, এই জাহেলি সমাজে মানুষের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, সামাজিক কুসংস্কার, অর্থবিত্ত, পেশীশক্তি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে কিছু মানুষ সমাজে প্রভু সেজে বসে আছে। পক্ষান্তরে, ইসলাম এসে এ ধরনের সকল শক্তির গোলামি থেকে মানুষের মুক্তি ঘোষণা করেছে। ইসলামের এ বিপ্লবী ঘোষণা যখন এসব অবৈধ প্রভুদের শাসনক্ষমতা ধ্বংস করে সেখানে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন কায়েমী স্বার্থবাদীরা সকল শক্তি ব্যবহার করে ইসলামের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এটা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া সাধারণ মানুষও দীর্ঘদিন ধরে এই গোলামির শেকলে আবদ্ধ থাকার ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা ওই ঘৃণ্য গোলামিকেই তাদের স্বাভাবিক অবস্থা মনে করে। তাদের অধিকাংশই কায়েমী স্বার্থবাদীদের দলে যোগ দেয় এবং ইসলামের পথ রোধ করতে সম্মিলিতভাবে আরো শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

মানুষের সামনে ইসলামের সঠিক রূপরেখা ও মানবজীবনের সঠিক দর্শন তুলে ধরে, অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে জাহেলিয়াতের কু-প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। একই সাথে সুগঠিত, সংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত জিহাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির মোকাবেলা করে যেতে হবে। কেননা, এসব রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ মানুষের মন-মগজ দখল করে আছে। এ সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিই সমাজের অর্থনীতি, জাতীয়তা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিষ্ঠিত জাহেলি সমাজ উচ্ছেদ করে সেখানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই প্রচার অভিযান ও সুপরিকল্পিত জিহাদী পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করতে হবে। মানুষকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত করতে হলে, মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করতে হলে একই সাথে উভয় দিকে সক্রিয় হতে হবে। নিছক ওয়ায-নসিহত দ্বারা কিংবা মানুষকে দ্বীন সম্পর্কে না জানিয়ে রাজনৈতিকভাবে তাদের ওপর মনগড়া হুকুমত চাপিয়ে দেয়া–এর কোনো পদ্ধতিতেই সঠিক অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ইসলাম কোনো গোত্র, বর্ণ ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদীর গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। ইসলাম শুধু আরবদের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। মানবজাতি যে দুনিয়ায় বাস করে সেই দুনিয়ার প্রতিটি ইঞ্চিই ইসলামের কর্মক্ষেত্র। শুধু মানবজাতি ও মানবজীবন কেন, সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টি, ইহকাল পরকাল সর্বত্রই ইসলাম সমানভাবে কার্যকর। কেননা, আল্লাহ তাআলা শুধু আরব বা শুধু মুসলমানদেরই প্রতিপালক নন, তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতেরই স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে সকল ধরনের অবৈধ দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাঁর নিজের দাসত্বের আওতায় আনতে চান। সংসদে বসে হোক বা যেখানে যেভাবেই হোক, নির্দিষ্ট কোনো মানুষ বা কোনো দল মানুষের জন্য আইন বিধান রচনা করা মূলত প্রভুত্ব দাবি করা। আর যদি কেউ তাদের রচিত (বা সংসদ সদস্যদের ভোটে পাসকৃত) শরিয়তবিরোধী কোনো আইন স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে মেনে নেয়, তাহলে সে সংসদ সদস্যদেরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করলো। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর আইন ছাড়া কারো বানানো আইন নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়ার অর্থই হলো তার ইবাদাত করা। অথচ, এই ইবাদাত বা দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট, এটা অন্য কেউ পেতে পারে না। তাই কোনো মানুষ যদি কোনো মানুষের, কোনো দলের বা সংসদের বানানো আল্লাহদ্রোহী আইনকানুন স্বেচ্ছায় নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়, তবে সে প্রকাশ্যে আল্লাহর দ্বীনের সীমারেখার বাইরে চলে যায়। এতে সে নিজেকে যতোই ধার্মিক ভাবুক না কেন, যতোই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতি ইবাদত করুক না কেন, তাতে কিছুই আসে যায় না। ইহুদি খৃস্টানরা যেসব কারণে মুশরিক হয়ে গেছে তার অন্যতম কারণ হলো, তাদের পুরোহিত কিংবা ধর্মযাজকদের তৈরি আইনকানুন বিনা শর্তে মেনে নেয়া।

তিরমিযিতে আদি ইবনে হাতেম (রা) থেকে যে ঘটনাটি আমরা জানতে পারি, তাতে বিষয়টি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হযরত আদি (রা) এর সামনে যখন

আল্লাহর রাসূল (স) সূরা তাওবার ৩২ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করেছিলেন তখন আদি (রা) বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো পুরোহিতদের সামনে রুকু সেজদা করে না। তাহলে তারা তাদেরকে কীভাবে আল্লাহর বিকল্প প্রভু বানিয়ে নিলো?' আল্লাহর রাসূল বললেন, হাঁ, তারা তাদেরকে প্রভু (রব) বানিয়ে নিয়েছিলো। কেননা, তাদের এসব পুরোহিতেরা যখন কোনো কিছুকে বৈধ (হালাল) সার্টিফিকেট দিতো তখন সমাজের সাধারণ মানুষেরা সেটাকে বৈধ মনে করতো, আবার কোনো কিছুকে অবৈধ (হারাম) করলে তারা তা অবৈধ মনে করতো। আল্লাহর কালাম অনুযায়ী তারা এসব যাচাই করতো না। এভাবেই তারা তাদের পীর-পুরোহিত ও ধর্মযাজকদের পূজা করতো।

উল্লিখিত আয়াতের যে ব্যাখ্যা আল্লাহর রাসূল (স) দিয়েছেন তা শরিয়তের অলঙ্ঘনীয় মৌলিক নীতি। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত আইনকানুন কিংবা সংবিধান মানার অর্থ হলো তার/তাদের ইবাদাতে লিপ্ত হওয়া; চাই সে আইন-কানুনের রচয়িতা কোনো একক ব্যক্তি হোক, বা কোনো দল হোক, বা আইন মন্ত্রণালয় হোক, বা সংসদ হোক। এভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতে লিপ্ত হলে, যে কেউ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইসলামের সর্বপ্রধান বাণীই হলো– যমিন আল্লাহর, সৃষ্টিও আল্লাহর; সুতরাং, এখানে আইনও চলবে আল্লাহর। অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্যের ঘৃণ্য গোলামি থেকে মুক্ত করাই ইসলামের মূল মিশন।

সমগ্র পৃথিবী বা পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের মানুষ যদি এভাবে আল্লাহর আইনকানুন বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষের আইনে, কিংবা কিছু আল্লাহর ও কিছু মানুষের আইন দিয়ে জীবন যাপন শুরু করে তাহলে তাদেরকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত করার জন্য একই সাথে প্রচার অভিযান এবং পর্যায়ক্রমে সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে সর্বাত্মক জিহাদ শুরু করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত যেসব রাজনৈতিক শক্তি মানুষকে আল্লাহর শরিয়ত থেকে বঞ্চিত করে তাদের আইনকানুন মানতে বাধ্য করছে, যারা মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে প্রভু সেজে বসেছে, তাদেরকে উৎখাত করার জন্য শাণিত আঘাত হানতে হবে। সমাজে যেসব মানুষ আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদেরকে সংগঠিত করে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত জাহেলি রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতে হবে। কেননা, এসব জাতীয়তাবাদী, গোত্রীয়, বংশীয়, গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী- এককথায় জাহেলিয়াত নির্ভর সকল রাজনৈতিক শক্তিকে উচ্ছেদ করা ছাড়া মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না। এসব জাহেলি শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় ইসলামি শরিয়াহ মেনে চলা কিছুতেই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এদের উৎখাত করে তারপরই ইসলাম সেখানে তার আর্থ-সামাজিক আইনকানুন প্রয়োগ করে মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়।

স্বাধীনতা বলতে ইসলাম কী বুঝায়

জোর করে অনেক কিছুই হয়তো করা যায়, কিন্তু মানুষের মন-মগজে কোনো আকিদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আকিদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন আকিদা-বিশ্বাস দিয়েই করতে হয়। তাই ইসলামও জোরপূর্বক কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না এবং বাধ্য করার নীতিতে বিশ্বাসও করে না। তবে এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, আপনি নিছক কিছু বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে এবং অনুষ্ঠানসর্বস্ব কিছু প্রথা পালন করেই বলতে পারেন না যে, আপনি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। ইসলাম প্রথমে মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়। অর্থাৎ মানুষকে এমন স্বাধীনতা এনে দিতে চায়, যেখানে সে ইসলাম গ্রহণ ও বাস্তব জীবনে তা পালন করলে তার প্রতি চোখ তুলে তাকানোর মতো কেউ না থাকে। এই গ্যারান্টি নিশ্চিত করার পর ইসলাম তাদের সামনে তাদের সৃষ্টিকর্তার পরিচয় তুলে ধরে, তাঁর আইনবিধানে নিহিত ইনসাফের বিষয়টি তুলে ধরে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের মন-মগজ সকল ধরনের নোংরা জাহেলিয়াত থেকে পরিশুদ্ধ করে তাকে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। তবে এই স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, সে ইসলামকে উচ্ছেদ করে মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে এবং বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের দেয়া জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ পাবে।

সমগ্র বিশ্বজগৎ, আসমান, যমিন, যমিনে বসবাসকারী মানুষ, মানুষের বেঁচে থাকার সকল উপায়-উপকরণ যেহেতু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তাই পৃথিবীর যেখানেই কোনো শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে, তাদেরকে আল্লাহর সর্বাত্মক আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েই শাসন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহর সার্বভৌমিকতাকেই শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর শরিয়তই হতে হবে তাদের সকল আইনবিধানের উৎস। তবে ইসলাম কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ইসলামি আদর্শভিত্তিক পরিচালিত রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে কেউ চাইলে ভিন্ন কোনো ধর্ম পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলাম তাকে কোনো বাধা দেবে না। এখানে একটি বিষয় গভীরভাবে বুঝতে হবে যে, ঈমান গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু 'দ্বীন' গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে কাউকে স্বাধীনতা দেননি।

'দ্বীন' শব্দের অর্থ আকিদা-বিশ্বাসের চেয়ে অনেক ব্যাপক। এখানে 'দ্বীন' বলতে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থাকে বুঝায়। মানুষের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি জীবনের সবগুলো দিককে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন করে দেয়ার নামই হলো 'দ্বীন'। আর ইসলামের এই 'দ্বীন' (জীবনব্যবস্থা) ঈমানের ভিত্তিতে রচিত। তাই ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ব্যক্তিগত জীবনে ভিন্ন কোনো ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেও ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক জিহাদ

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা নিশ্চয়ই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি যে, নিছক আত্মরক্ষার নাম জিহাদ নয়। বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য (জিহাদ বিল কওল) দাওয়াত, প্রচার, প্রসার, লিখনী, মেধা, শক্তি ইত্যাদি দ্বারা যেমন জিহাদ করতে হবে, তেমনি এই আন্দোলনকে সফল করতে হলে সশস্ত্র জিহাদও করতে হবে। ইসলামে এই দু'টিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা অলিক কল্পনামাত্র। পাশ্চাত্যের ধূর্ত লেখকদের ভ্রান্তিকর যুক্তির গোলকধাঁধায় পড়ে, পাশ্চাত্যের নোংরা সাহিত্য-সংস্কৃতির কাছে পরাজিত হয়ে কিছুলোক ইসলামের মহান 'জিহাদকে' যেভাবে নিছক আত্মরক্ষামূলক জিহাদের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন আসলে ইসলামের 'জিহাদ' মোটেই তা নয়। তারা পাশ্চাত্যের লেখকদের ধূর্ততাপূর্ণ লিখনীর যথাযোগ্য জবাব দিতে অক্ষম হয়ে পড়ার কারণেই তাদের মাঝে এ ধরনের পরাজিত মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে তারা জিহাদকে শুধু আত্মরক্ষার মত সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আটকাতে চায়। মানবজাতিকে মানুষের ঘৃণ্য গোলামি থেকে মুক্ত করে সত্যিকার স্বাধীনতা দানই ইসলামি জিহাদের মূল উদ্দেশ্য। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। আচমকা সে মানুষের ওপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী নয়। তাই মানুষের আকিদা-বিশ্বাসসহ দৈনন্দিন কর্মজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিশুদ্ধ করার সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ সে ব্যবহার করে, একটি একটি করে স্তর সে অতিক্রম করে এবং প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়ার পদক্ষেপ নেয়।

ইসলামের এই ব্যাপক অর্থবোধক 'জিহাদ' শব্দটিকে যদি সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলে অভিমত দেয়া হয়, তাহলে 'জিহাদ' তার মূল প্রকৃতিই হারিয়ে ফেলে। আর যদি আত্মরক্ষার অর্থে ব্যবহার করতেই চাই তাহলে আত্মরক্ষার সংজ্ঞাকে ইসলামের দৃষ্টি দিয়ে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। আত্মরক্ষা বলতে ইসলাম বুঝায় মানুষের স্বাধীনতা হরণকারী সেসব যালিম শাসকদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করা, যারা বিভিন্ন ধরনের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনা, মনগড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদের নামে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ করছে। আল্লাহর নবী যখন দ্বীন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তখনও যেসব অপশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো, আজও বিভিন্ন নামে সে সব অপশক্তি বিশ্বব্যাপী মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জনের পথে জগদ্দল পাথর হয়ে বসে আছে। আত্মরক্ষার এই সঠিক ও ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে আমরা ইসলামের জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধারে সক্ষম হব। এই আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ হলো, মানুষের দাসত্ব থেকে সর্বাত্মক স্বাধীনতা অর্জন। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, যালিম স্বার্থপর ও সকল ধরনের তাগুতি শক্তি (বিশেষ করে তাগুতি সরকারগুলোকে) উচ্ছেদ করা এবং মানুষের জীবনে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তহীন প্রতিফলন ঘটানো। পাশ্চাত্যের ধ্বজাধারী পরাজিতমনা কিছু লোক ইসলামের জিহাদী চেতনাকে নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তারা

তাদের মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন ধরনের বানোয়াট যুক্তি দিচ্ছে এবং যুক্তিগুলোকে প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামি ইতিহাসের যেসব ঘটনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেশরক্ষার যুদ্ধ বলে চালানো যেতে পারে, তারা এমনসব ঘটনাগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করে সরলমনা অল্পশিক্ষিত মানুষদের কাছে পেশ করছে। এর দ্বারা তারা ইসলামি ইতিহাসের অনেক যুদ্ধকেই দেশ রক্ষার যুদ্ধ বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলতে চায় যে, তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি বা পার্শ্ববর্তী শত্রুদেশগুলোর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণেই বাধ্য হয়ে মুসলমানরা ওসব যুদ্ধগুলো করছেন।

এ ধরনের মতবাদের প্রবক্তারা যে ইসলামকে ভালোবাসেন না, সেকথা আমি বলতে চাই না। তবে এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, হয় তারা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের নীতিগুলোর সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি, অথবা পাশ্চাত্যের ধূর্ত লেখকদের চাতুর্যপূর্ণ লেখায় প্রভাবিত হয়ে রণেভঙ্গ দিয়ে পাততাড়ি গুটিয়েছেন।

এমন কথা কি কেউ বলতে পারে যে, পারস্য সাম্রাজ্য দ্বারা আক্রান্ত না হলে আল্লাহর রাসূলের খলীফারা ইসলামের প্রসারের সংগ্রাম বন্ধ করে দিতেন? কেউ কি বলতে পারে যে, পারস্য সাম্রাজ্য কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার কারণেই শুধু তারা জিহাদ করেছেন?

কিছুতেই নয়। এমনটি হতেই পারে না, বরং বিশ্বব্যাপী আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাদের জীবন-মরণ সংগ্রাম। কারো দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নয়; বরং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা এসব জিহাদ পরিচালনা করেছেন। কেননা, জিহাদ ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্য কোনো উপায় তখনও ছিলো না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এখন কথা হলো, কেন এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা জিহাদ ছাড়া সম্ভব নয়। শুধু তাবলীগ, প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে মানুষের মনে ইসলামের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা দ্বারা কি দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়? কিংবা এই রক্তক্ষয়ী পদ্ধতি ছাড়া ঝামেলামুক্ত ঝুঁকিহীন কোনো পদ্ধতিতে কি দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়? সম্ভব হলে অযথা রক্তপাতের তো কোনো অর্থ হয় না। আর নিছক রক্তপাত তো ইসলামের ঈপ্সিত লক্ষ্যও নয়। এই সব প্রশ্নের সমাধান পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই সমাজের বাস্তব অবস্থার দিকে নজর দিতে হবে।

অত্যাধুনিক সামরিক সাজে সজ্জিত জাহেলি সমাজব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইসলামি আন্দোলনের সামনে একটি বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন একটি সুসংগঠিত বিশাল শক্তিকে উচ্ছেদ করে মানবজাতিকে সত্যিকার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া কি নিছক ওয়ায-নসিহত কিংবা প্রচার-প্রসারের মাধ্যমেই সম্ভব? বর্তমান বিশ্বের চারদিকের পরিস্থিতিও আপনি দেখছেন। শুধু মৌখিকভাবে মুসলমান দাবি করার কারণেও আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নাস্তিক কম্যুনিষ্ট ও বিধর্মীদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর কি অমানবিক যুলুম-নির্যাতন করা হচ্ছে! এদিকে মুসলমান নামধারী তাগুতি শক্তিগুলোও তাদের সাথে এক হয়ে মুসলমান দেশগুলোর ভেতরেও ইসলামের পথের মুজাহিদদের হত্যা করতে কীভাবে উঠেপড়ে

লেগেছে! তারপরও কি আপনি বলবেন, নিছক ওয়ায-নসীহত দ্বারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব? কেউ যদি সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে চায়, মুসলমান হিসেবে তার ওপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে চায়, তখনই আজকের এসব মুসলমান নামধারী তাগুতি সরকারগুলো তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

তবে হাঁ, প্রচার-প্রসারের দিকে ইসলাম গুরুত্ব দেয়নি-এমনটি বলার কোনো অবকাশ নেই। প্রতিষ্ঠিত তাগুতসহ সমাজের যেসব মানুষ জাহেলিয়াতের ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের সবার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়াকে ইসলাম তার প্রথম কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে। সাথে সাথে ইসলাম এটাও নিশ্চিত করতে চায় যে, যদি কেউ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে চায়, তবে তাকে বাধা দেয়ার মতো দুঃসাহস যেন কারো না থাকে। স্বাধীনভাবে প্রত্যেককে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম বদ্ধপরিকর। ইসলাম গ্রহণ ও বাস্তব জীবনে ইসলামি হুকুম-আহকাম পালন করার পথে যদি কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই বাধার প্রাচীর গুঁড়িয়ে দিতে ইসলাম তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পরই ইসলাম তার 'দ্বীনে কোনো জোর জবরদস্তি নেই' এই নীতি অনুসরণ করে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার কাজ করে।

মানবজাতিকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রদানই ইসলামের প্রধান বিপ্লবী ঘোষণা। ন্যূনতম সাধারণজ্ঞান থাকলেও যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, এমন একটি বিপ্লবী ঘোষণার বাস্তবায়ন নিছক ওয়ায-নসিহত বা ইসলামের সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা বর্ণনা দ্বারা সম্ভব নয়; বরং এই ঘোষণার সাথে সাথেই বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য ময়দানে সশরীরে অবতীর্ণ হতে হবে। এ সংগ্রামের ময়দানে প্রতিটি স্তরে যেসব বাধা আসবে তা অতিক্রম করার জন্য যুগ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের সংগ্রামই হলো 'জিহাদ'। এই ক্রমঅগ্রসরমাণ আন্দোলনের প্রতিটি স্তরই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, চাই তা দাওয়াতি পর্যায়ের হোক বা সশস্ত্র যুদ্ধের পর্যায়েই হোক।

কোনো ভূখণ্ডে আল্লাহর দ্বীন রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, সে ভূখণ্ডকে ইসলামের পরিভাষায় 'দারুল ইসলাম' বলা হয়। তবে নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে দারুল ইসলাম কায়েম হয়ে গেলেই মুসলমানদের জিহাদি কর্মসূচি শেষ হয়ে যায় না। দারুল ইসলামের ভুখণ্ড নিরাপদ থাক বা আক্রান্ত হোক-কোনো অবস্থাতেই জিহাদের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় না, বা জিহাদের গুরুত্বও কমে যায় না। কারণ, আল্লাহর যমিনের এক ইঞ্চি জায়গা যতক্ষণ পর্যন্ত তাগুতি শাসনের অধীনে থাকে, অথবা এক ইঞ্চি জায়গায় যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা বাকি থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামে জিহাদের কর্মসূচির কোনো স্থগিতাদেশ নেই। ইসলাম যে শান্তি চায় তা শুধু নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডের মানুষের জন্যই বরাদ্দ নয়, ইসলাম যে স্বাধীনতা চায় তার স্বাদ কিছু মানুষ ভোগ করবে এমনটি নয়; বরং ইসলাম তার শান্তির সুশীতল ছায়াতলে সারা বিশ্বের

মানুষকে আশ্রয় দিতে চায়। ইসলাম এমন শান্তির পায়রা ওড়াতে চায়, যে পায়রা সারা বিশ্বের আকাশে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ওড়ে বেড়াতে পারবে। ইসলাম চায় পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের সকল প্রকার কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে। ইসলাম চায় সারা পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের গণ্ডিতে এনে হাজির করতে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবাগণ যে স্তরটিকে সামনে রেখে জিহাদী কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেই আমাদের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাইয়ুম বলেন, সূরা তাওবা নাযিল হবার পর আল্লাহর রাসূল কাফিরদেরকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেন। ১. যুদ্ধরত কাফির। যারা মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলো। ২. চুক্তিবদ্ধ কাফির যখন ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তখন বাকি থাকে শুধু দুই দল-জিম্মি ও যুদ্ধরত। শেষপর্যায়ে এসে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। ১. মুমিন মুসলিম ২. ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত জিম্মি ও ৩. যুদ্ধরত কাফির। এই হলো ইসলামি জিহাদের পর্যায়ক্রমিক স্তর। আর ইসলামের মূলনীতিটাই এমন যে, বাস্তব ময়দানে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষ এই শ্রেণীগুলোর যে কোনো একটিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলোচিত এই রূপরেখাটিই হলো ইসলামি জিহাদের স্বরূপ। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে পাশ্চাত্য জগতের সফলতার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু লোক এমন হীনম্মন্যতার শিকার হয়েছে, এমন পরাজিত মনোভাব তাদের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা জিহাদের এমন ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করেছে, যা মেনে নিলে ইসলামের জিহাদ তার স্বরূপ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সবই হারিয়ে ফেলে। এ ব্যাপারে জিহাদের পর্যায়ক্রমিক নির্দেশনা নিয়ে কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে আলোচিত বিষয়টির যথার্থ প্রমাণ আমরা দেখতে পাই।

মক্কায় থাকা অবস্থায় মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়–'তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো, এখন শুধু সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দিয়ে যাও।'

এরপর মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করার পর তাদের নিজস্ব আয়ত্তাধীন ভূখণ্ড হওয়ার পর নাযিল করা হয়–

"যাদের বিরুদ্ধে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল, তাদেরও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া গেলো। কেননা, তাদের ওপর সত্যিই যুলুম করা হচ্ছিল, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা এ (মযলুম)-দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (এরা হচ্ছে কতিপয় মাযলুম মানুষ) যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে; শুধু এই কারণে যে, তারা বলেছিলো, আমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। যদি আল্লাহ তাআলা মানবজাতির এক দলকে আরেক দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃস্টান সন্ন্যাসীদের) উপাসনালয় ও গীর্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, (ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদিদের) ইবাদতের স্থান ও (মুসলমানদের)

মসজিদসমূহ ও যেখানে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে (আল্লাহ তাআলার) দ্বীনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে। (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, তবে (অবশ্য) সব কাজের চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তাআলারই এখতিয়ারভুক্ত।" (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ৩৯-৪১)

এই পর্যায় অতিক্রমে মুসলমানদের অবস্থা যখন আরো শক্তিশালী হয়, তখন অর্থাৎ আক্রান্ত হলেই আক্রমণের অনুমতি দেয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলো–

"তোমরা আল্লাহ তাআলার পথে সে সব লোকদের সাথে লড়াই করো, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, (কিন্তু কোনো অবস্থাতেই) তোমরা সীমালংঘন করো না, কারণ আল্লাহ তাআলা কখনো সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯০)

"যাদের প্রতি ইতঃপূর্বে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম বলে স্বীকার করে না, (সর্বোপরি) সত্য দ্বীন (ইসলাম)-কে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (কর) দিতে শুরু করে।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ২৯)

এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো। 'জিহাদ' প্রসঙ্গে কুরআনে প্রায় সাত'শ আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে আল্লাহর নবীর অসংখ্য উৎসাহব্যঞ্জক হাদিস। আরো রয়েছে ইসলামি ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ জিহাদের অমরগাঁথা। এতোসব সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ও বাস্তব ইতিহাস থাকার পরও আর কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না এমন পণ্ডিতদের, যারা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার ঠাঁটবাঁট দেখে তাদের কাছে আত্মিকভাবে পরাজয় বরণ করে বসে আছে। এমন কোনো নব্য চিন্তাবিদদের প্রয়োজন মুসলিম জাতির নেই, যারা পাশ্চাত্যের ধূর্ত লোকদের প্রচারণায় চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে আছেন।

একজন সচেতন মুসলমান কিছুতেই এ ধরনের প্রচারণায় কান দিতে পারে না। যারা আল্লাহর কুরআন পড়ে, রাসূলের হাদিস পড়ে, ইসলামের গৌরবময় বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস জানে, তারা কিছুতেই এসব প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয় না। এসব অপ্রয়োজনীয় তত্ত্বের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও তারা মনে করেন না। 'জিহাদের হুকুম শুধু তৎকালীন সমাজের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতেই দেয়া হয়েছিলো বা জিহাদ শুধু সীমান্ত

রক্ষার প্রয়োজনেই ফরয করা হয়েছিলো' এমন স্বার্থবাদী দর্শন কোনো সচেতন মুসলমানই গ্রহণ করতে পারে না; বরং জিহাদের অনুমতি ও হুকুম দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা একথাও জানিয়ে দিয়েছেন, এটি আল্লাহর দ্বীনের একটি সর্বকালীন ও সার্বজনীন নির্দেশ। কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের এই হুকুম ও জিহাদের প্রয়োজনিয়তা থাকবে। মানবসমাজকে জাহেলিয়াতের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ আল্লাহর ঘোষিত এক অপরিবর্তনীয় নীতি। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে তিনি বলেছেন,

"যদি আল্লাহ তাআলা মানবজাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃস্টান সন্ন্যাসীদের) উপাসনালয় ও গীর্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, (ধ্বংস হয়ে যেত ইহুদিদের) ইবাদতের স্থান ও (মুসলমানদের) মসজিদসমূহও যেখানে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে (আল্লাহ তাআলার) দ্বীনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।" (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ৪০)

এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, জিহাদ ও সংগ্রাম কোনো সাময়িক হুকুম নয়; বরং সকল যুগের জন্যই এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাস আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে যে সত্যটি দেখিয়ে দেয় তা হলো, ইসলাম যখনই বিশ্বমানবতার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, মানুষকে মানুষের ঘৃণ্য গোলামি থেকে মুক্ত করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, তখনই কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসনক্ষমতা ও প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইসলামি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। একমুহূর্তও তারা ইসলামকে বরদাস্ত করেনি। পক্ষান্তরে ইসলামও তাদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাব, জনবল, অস্ত্রবল দেখে রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়নি; বরং, এই যালিমদের হাত থেকে বিশ্বমানবতাকে উদ্ধার করার জন্য আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। সত্য-মিথ্যার এ সংগ্রাম কোনো কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। মিথ্যার সাথে সত্যের, বাতিলের সাথে হকের এ সংগ্রাম সময়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই গোটা বিশ্বব্যবস্থা যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আইনের অধীনে না আসবে ততোক্ষণ এই সংগ্রাম অবিরাম গতিতেই চলবে।

মক্কী জীবনে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কেন নিষেধ ছিল

একটি নতুন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেই যদি মানুষের ওপর সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া হয় তাহলে সেই সংগ্রাম সফলতার মুখ দেখা তো দূরের কথা, শুরুতেই তার মুখ থুবড়ে পড়া অনিবার্য। তাই আল্লাহর রাসূলের মক্কী জীবনে তাঁকে সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই হুকুম কোনো স্থায়ী হুকুম ছিলো না, তা ছিলো সুদূরপ্রসারী ও সুপরিকল্পিত সংগ্রামের প্রাথমিক স্তরের একটি অস্থায়ী হুকুম। এই হুকুম আল্লাহর নবী মদিনাতে হিজরত করে আসার পরও কিছুদিন বহাল ছিলো। এরপর যখন মুসলমানদের হাতে পূর্ণাঙ্গ

রাষ্ট্রক্ষমতা চলে আসে, সার্বিকভাবে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হয়, কুরআনি প্রশিক্ষণ তাদেরকে আরো ধৈর্যশীল ও সুশৃংখল করে তোলে, তখনই কেবল সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ও আদেশ দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো পাশ্চাত্যপন্থী লেখকেরা বলে থাকেন যে, নিছক মদিনার সীমান্ত রক্ষার জন্যই এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে যে কোনো নিরপেক্ষ মানুষ যদি ইসলামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতি, পদ্ধতি পর্যালোচনা করে তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে, মদিনার সুরক্ষার প্রশ্নটি যদিও সেখানে ছিলো, তবে কেবল মদিনার সুরক্ষার জন্যই সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং এটা ছিলো সর্বজনীন ও সর্বকালীন নির্দেশ। মদিনার সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ থাকলেও তা ছিলো ইসলামের ঈপ্সিত মানযিলে পৌঁছানোর একটি স্তর বা অধ্যায়মাত্র। কেননা, সংগ্রাম পরিচালনার (হেড কোয়ার্টার) কেন্দ্রস্থলকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখা কিছুতেই কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে না। বিশ্বব্যাপী এই বিপ্লবী কালেমাকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এটা ছিলো একান্ত অপরিহার্য বিষয়।

মক্কী জীবনের সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি না দেয়ার কারণ সম্পর্কে তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনে 'আলাম তারা ইলাল্লাযীনা কীলা লাহুম কুফ্ফু আইদিয়াকুম' (আন নিসা- আয়াত ৭৭) আয়াতের প্রেক্ষিতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের দাবির প্রেক্ষিতে আমি এখানে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

১. আল্লাহর নবী মক্কাতে একেবারে অসহায় ছিলেন তা নয়; তিনি মক্কার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু হাশিমের যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতাও পাচ্ছিলেন। তাই সকল মক্কাবাসী তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে পারছিলেন। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে, আলোচনা মজলিস করে, লোক জড়ো করে বিভিন্নভাবে তিনি মানুষের আকিদা-বিশ্বাসকে শেরেক ও জাহেলিয়াত থেকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

২. বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখতে পাই বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাদের সশস্ত্র সামরিক বাহিনীও রয়েছে। কিন্তু তৎকালীন মক্কায় কেন্দ্রীয়ভাবে ও সুসংগঠিতভাবে এমন কোনো সরকার ব্যবস্থা ছিলো না যে, তারা প্রশাসনিকভাবে মুহাম্মদ (স)-কে দমন করার জন্য চেষ্টা করবে।

৩. সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য কিছু প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে। তৎকালীন আরবের লোকেরা যে ধরনের জাহেলিয়াতের পঙ্কে নিমজ্জিত সমাজে বসবাস করতো, তাতে তাদের মধ্যে এমন অনেক বদস্বভাব ছিলো যা ইসলামে একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। তাই যারা বিশ্বনবীর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছিলেন তাদেরকে এই সব জাহেলিয়াতের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তোলারও প্রয়োজনীয়তা ছিলো। আল্লাহর রাসূল তাঁর মক্কী জীবনে এই মহান কাজটিরই আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। কেননা, আরবরা ছিলো চরম অসহিষ্ণু, ধৈর্যহীন ও বর্বর

ধরনের। তারা সামান্য উস্কানিতে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতো। অহঙ্কার, গর্ব, প্রতিশোধপরায়ণতা, আত্মপূজা, প্রবৃত্তির গোলামি-এগুলো তাদের স্বভাবের অত্যন্ত গভীরে মিশে গিয়েছিলো। অথচ ইসলামে এগুলো মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। একজন মুমিনের চরিত্রে এসব বদস্বভাবের বিন্দুমাত্র প্রভাব ইসলাম বরদাশত করে না। তাই এসব বিষয় সম্পর্কে ইসলাম গ্রহণকারীদের কাছে ইসলামের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন ছিলো। তাদেরকে জীবনের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করে তাদেরকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিলো। কেননা, পূর্বেকার জাহেলি সময়ে অকারণে যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি করা ছিলো তাদের জীবনের নিত্য কর্মসূচি। কিন্তু এখন তারা ইসলামের মহান বাণীর ধারক-বাহক। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বেকার ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি এখন তাদের মাঝে নেই। তারা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ, মূল্যবান ও মহান বার্তাবাহক। যে দায়িত্ব তারা এখন কাঁধে তুলে নিয়েছে তা আঞ্জাম দিতে হলে অনেক ধৈর্য ও সংযমের প্রয়োজন। উত্তেজনার বশে জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করা তাদের সাজে না। এমনটি করলে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তারা কিছুতেই পালন করতে পারবে না। তাই নেতার আনুগত্য, শৃংখলা, ধৈর্য, সংযম এক কথায় একটি আদর্শ কর্মীবাহিনীর প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দান করা ছিলো অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কেননা, ইসলাম যে সমাজ গড়তে চায় সেখানে বিশৃংখলা, বদস্বভাব, অসভ্যতা, পশুবৃত্তি, সংকীর্ণতা, গোত্রীয় ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা সমর্থিত নয়।

৪. মক্কীজীবনে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে যে, তৎকালীন আরবসমাজে কুরাইশদের গোত্রীয় আধিপত্যের কারণে তাদের ভেতরে বেশ অহমিকাবোধ জন্মেছিলো। আর অহঙ্কারী মানুষদের উস্কে দেয়ার চেয়ে বুঝের মাধ্যমে সংশোধনের প্রচেষ্টাই বেশি ফলপ্রসূ। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ তাদেরকে আরো অহঙ্কারীতে পরিণত করতে পারে। আমাদের অজানা নয় যে, ইতঃপূর্বে গোত্রীয় কলহের কারণে সংঘটিত দাইস, বাসুস ও গাবরার যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। ইসলাম যদি তাদের মাঝে আবার এ ধরনের উস্কানী দিতো, তাহলে তো তাদের স্বভাবগত রক্তপিপাসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। ইসলাম এ ধরনের গোত্রীয় কলহের সমর্থক হলে তার আদর্শিক দাওয়াতের আবেদনটুকু নষ্ট হয়ে যেতো এবং যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ হিসেবে পরিগণিত হতো। পরিণতিতে ইসলামের মহান আদর্শ চাপা পড়ে যেতো সংকীর্ণ গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের নিচে।

৫. গৃহযুদ্ধের বিস্তাররোধও মক্কী স্তরে যুদ্ধ অনুমোদিত না হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। তৎকালীন মক্কায় যদি কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা থাকতো, তাহলে বিষয়টি অন্যরকম হতো এবং গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা থাকতো না। কেন্দ্রীয় কোনো শাসনব্যবস্থা না থাকার কারণে মুহাজিরদের ওপর নেমে আসা যুলুম-নির্যাতনও কোনো প্রশাসনিকভাবে করা হচ্ছিলো না; বরং মুহাজিরদের আত্মীয়স্বজন ও গোত্রীয় লোকেরাই ইসলাম থেকে

ফিরে আসার জন্য তাদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিলো। এমতাবস্থায় মুমিনরা শুরুতেই অস্ত্রধারণ করলে ঘরে ঘরে, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থেকে যেতো। এক্ষেত্রে আবু জাহিলরা সাধারণ জনগণকে বলে বেড়াতো যে, ইসলাম আমাদেরকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে, এমন ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি করাই ইসলামের কাজ। সুতরাং, তোমরা ইসলাম থেকে দূরে থাকো। অমানবিক যুলুম নির্যাতনের মুখে অবিচল ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের পরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হয়েছে। হজ্জের সময় আগত লোকদের কুরাইশ নেতারা বলতো, মুহাম্মদ শুধু গোত্রীয় কলহ লাগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, এমনকি পিতা-পুত্রের মধ্যেও বিবাদ সৃষ্টি করেছে। অথচ মুসলমানদের ওপর অস্ত্রধারণ তখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিলো। এ প্রেক্ষাপটে সংযমের নির্দেশ না দিয়ে ইসলাম যদি ছেলেকে তার বাপের, আর গোলামকে তার মনিবের শিরোচ্ছেদের নির্দেশ দিতো, তাহলে কি অবস্থাইনা সৃষ্টি হতো! কি অপপ্রচারইনা চালানোর সুযোগ পেতো ইসলামবিরোধীরা!

৬. মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা হলো সীমিত। আল্লাহর জ্ঞান সীমাহীন। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের বিরোধিতাকারী অনেক লোকই পরবর্তীতে ইসলামি আদর্শ গ্রহণ করবে। সুতরাং, তাদেরকে আগেই যদি হত্যা করা হয়, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করবে কারা? এক্ষেত্রে অসংখ্য সাহাবির নাম উল্লেখ করা যায়। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কথা চিন্তা করুন। তিনি ইসলামের প্রবল বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৭. যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে যে, তৎকালীন আরবদের স্বভাব ছিলো তারা যদি কাউকে যুলুম-নির্যাতনের মুখে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে দেখতো, তাহলে এই সংযমী লোকটির প্রতি একটা সহানুভূতি জেগে উঠতো। আর যদি নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিটি হতেন সমাজের সম্ভ্রান্ত ও ভালো লোক, তাহলে সহমর্মিতা আরো প্রবল হয়ে উঠতো। এমন প্রমাণ বিভিন্ন ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। আবু বকর (রা)-এর মতো নামী-দামী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন মক্কা ছেড়ে হিজরত করতে যাচ্ছিলেন, তখন ইবনু দাগানার কাছে বিষয়টি মক্কাবাসীর জন্য চরম লজ্জাজনক মনে হয়েছিলো। সে ভেবেছিলো, এমন ভালো মানুষগুলোর সমাজ ছেড়ে চলে যাওয়া নিশ্চয়ই সমাজের জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার। তাই সে তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে। আরেকটি ঘটনা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আল্লাহর রাসূলকে সহযোগিতা করার কারণে তাঁর গোত্র বনু হাশিমকে এক পর্যায়ে শি'আবে আবি তালেবে চুক্তির মাধ্যমে অন্তরীণ করে রাখা হয়। মক্কার লোকেরাই তাদেরকে এই দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। অথচ বয়কটের কারণে তাদের দুঃখ-দুর্দশা যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন তারাই সেই চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল। অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন ধরে যদি কারো ওপর যুলুম-নির্যাতন করা হতো, তাহলে মাযলুমদের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ পেতো। এটা ছিলো প্রাচীন আরবীয় সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। অথচ আজকের আরববিশ্বে মাযলুমদের প্রতি

কোনো সহানুভূতি দেখানো হয় না। ধৈর্যশীলদেরকে উল্টো বিদ্রূপ করা হয়। আর যালিমদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

৮. সর্বশেষ কারণটি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। যুদ্ধবিগ্রহের জন্য অস্ত্র ও জনবলের বিষয়টি অনস্বীকার্য নয়। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, মক্কী সময়ে খুব সামান্যসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। চারদিকে তখনও ইসলামের দাওয়াত তেমন প্রচার হয়নি। দূরদুরান্তের যারা দাওয়াত পেয়েছিলো, তাদের অনেকে মনে করেছিলো, এটা হয়তো কুরাইশদের গোত্রীয় কোনো দ্বন্দ্ব। তাই ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণের কোনো পরিবেশ তখনো সৃষ্টি হয়নি। মুষ্টিমেয় কিছু লোক তখন ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র। এ গুটিকয়েক মানুষ যদি জোশে হুঁশ হারিয়ে গোটা জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতো, তাহলে তারা একেকজন অনেকজনকে হত্যা করলেও তাদের পরাজয় ছিলো অবধারিত। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হাতে তারা নির্ঘাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এতে ফলাফল কী হতো?

ফলাফল এই হতো যে, শেরেক, জাহেলিয়াত সব বহাল থাকতো। শুধু তা-ই নয়, মুসলমানরাই উল্টো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো এবং ইসলাম কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। এ ধরনের পরিস্থিতি মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। কেননা, নিছক একটা গোলযোগ সৃষ্টি, অথবা অযথা, হাঁকডাক ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম পৃথিবীতে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতেই এসেছে। তাই অবাস্তব কোনো পদক্ষেপ নেয়াকে ইসলাম কখনও সমর্থন করে না।

হিজরতের পরও কিছুদিন যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকার তাৎপর্য

হিজরতের সাথে সাথেই যে মুসলমানদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিলো তা নয়; ধৈর্যের সাথে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া বাঞ্ছনীয়। তাই হিজরত করে মদিনায় আসার পরও বেশ কিছুদিন সশস্ত্র যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। কেননা, প্রথমে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা ও নিজেদের ঘর গোছানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ছিলো। এই পদক্ষেপের আওতায় আল্লাহর রাসূল মদিনা ও মদিনার আশেপাশে বসবাসরত ইহুদী ও মুশরিকদের সাথে সাময়িক শান্তিচুক্তি করেন। এই চুক্তিতে তাদের সবার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও একে অপরের প্রতি কোনোরকম উস্কানি বা আক্রমণ না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য এমন চুক্তি যে কতোটা বাস্তবসম্মত ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিলো, তা বুদ্ধিমান মাত্রের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। চুক্তিনামার পটভূমি এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়–

প্রথমতঃ এই চুক্তিনামার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথের সকল বাধা দূরীভূত হয়েছিলো। ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে মুসলমানরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিলো। মদিনায় অন্য কোনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকার কারণে কেউ ইসলাম

গ্রহণ করতে চাইলে বাধা দেয়ার মতো কোন লোক ছিলো না। তাই ইসলামের সুমহান বাণী শুনে অসংখ্য মানুষ ইসলামের কোলে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে। তাছাড়া চুক্তিনামার মাধ্যমে মদিনায় আল্লাহর রাসূলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মদিনার সকল অধিবাসী আল্লাহর রাসূলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাহ্যিকভাবে মেনে নিয়েছিলো।

নবজাত ইসলামি রাষ্ট্রের স্বার্থে আল্লাহর রাসূল মদিনার ইহুদী ও মুশরিকদের সাথে বেশ কিছু চুক্তি সম্পাদন করেন। যেমন আল্লাহর নবীর অনুমতি ছাড়া মদিনার কোনো অধিবাসী মদিনার বাইরের কারো সাথে শান্তিচুক্তি করতে পারবে না এবং কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারবে না। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে সবার অজান্তেই মদিনার প্রধান ও কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে চলে আসে। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হলো, ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনে একমাত্র কুরাইশরাই নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। আর আরব অঞ্চলে কুরাইশদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছিলো না। কেউবা অপেক্ষা করছিলো, মুহাম্মদ (স)-এর সাথে কুরাইশদের নতুন ধর্ম নিয়ে বাদ-বিবাদের গতিবিধি দেখার জন্য। এ কারণে আল্লাহর নবীর মাঝে আল্লাহর দেয়া রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই তাকে বলে দিয়েছিলো যে, আভ্যন্তরীণ সকল দিক থেকে নিজেদেরকে গুছিয়ে নিয়ে সর্বপ্রথম কুরাইশদের সাথে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার, একটি সুস্থির অবস্থানে আসা দরকার। এ লক্ষ্যেই আল্লাহর রাসূল হিজরতের ছয়মাস যেতে না যেতেই হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে প্রথম সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। এরপর ছোট ছোট বিভিন্ন গোত্রের কাছে আল্লাহর নবী দাওয়াতী অভিযানে সেনাদল পাঠান। প্রথমটি ছিলো হিজরতের ছ' মাসের মধ্যে, দ্বিতীয়টি তের মাস পর এবং তৃতীয়টি ষোল মাসের প্রথম দিকে। এসব দাওয়াতী অভিযানের কোনোটিতেই রক্তপাতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটে হিজরতের সপ্তদশ মাসে পাঠানো আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের অভিযানে। অথচ রমযান মাসে যুদ্ধবিগ্রহ না করা, রক্তপাত না ঘটানো জাহেলি যুগেও আরবের সর্বজন স্বীকৃত ছিলো। এ কারণে আরব মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি অপপ্রচার চালানোর সুযোগ পায় এবং এ সুযোগে তারা উঠেপড়ে লেগে যায়। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে তাদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন।

"সম্মানিত মাস ও তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে; তুমি তাদের বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা অনেক বড় গুনাহের কথা। (কিন্তু আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বড় গুনাহ হচ্ছে) আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখা, তাঁর সাথে কুফরি করা, খানায়ে কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের বের করে দেয়া; আর (আল্লাহদ্রোহিতার) ফেৎনা তো হত্যাকাণ্ডের চেয়েও অনেক বড় অন্যায়।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৭)

এরপর হিজরতের দ্বিতীয় বছরের রমযান মাসে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের সকল দর্প চূর্ণ করে দেন। হক প্রতিষ্ঠিত করেন, বাতিল পরাজিত করেন। এর মাধ্যমে দোদুল্যমান মানুষের সন্দেহ-সংশয় অনেকাংশেই দূরীভূত হয়। ইসলাম একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে সূরা আনফালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

ইসলামে জিহাদের পর্যায়ক্রমিক স্তর প্রসঙ্গে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তাতে আমি আশাবাদী যে, নিরপেক্ষ মানসিকতাসম্পন্ন প্রত্যেক সত্যসন্ধানী ব্যক্তিই ইসলামের জিহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন। এ আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামের জিহাদকে নিছক আত্মরক্ষামূলক কোনো যুদ্ধ বলার অবকাশ নেই। ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-দর্শন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে যাদের আত্মিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, যারা মুসলমানদের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের ইতিহাস ভুলে আজ জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে আছে তারাই ইসলামের জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চায়। এরা সত্যিকার অর্থে পাশ্চাত্যের ধূর্ত শাসক ও লেখকদের আদর্শিক গোলাম। অবশ্য আল্লাহ এমন কিছু বান্দাকেও জীবিত রেখেছেন, যারা কাফির মুশরিকদের সকল যুলুম-নির্যাতনের মুখেও অবিচলভাবে ইসলামের সঠিক আদর্শ প্রচার করে চলেছেন। তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, মানবরচিত শাসনব্যবস্থাসহ যতো ধরনের অবৈধ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানুষের ওপর চেপে বসেছে তার সব ক'টির শেকল ছিন্ন করে সকলকে একমাত্র আল্লাহর গোলামির আওতায় আনার নামই হলো ইসলাম।

যারা ইসলামবিরোধী শক্তির আদর্শিক গোলাম তারাই শুধু ইসলামের নামে বিভিন্ন প্রকার অপপ্রচার চালায়। অবশ্য যারা সত্যের সন্ধান করে, কুরআনের কাছে সত্যপথের দিশা চায় তারা কখনোই বিভ্রান্ত হয় না। আমি এখানে সামান্য কয়েকটা আয়াত তুলে ধরছি। এতে আল্লাহ তাআলা জিহাদের যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তাদের ওসব অপপ্রচার আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

“যে সব লোক পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিক্রি করে দিয়েছে সে সব মানুষের উচিত আল্লাহ তাআলার পথে লড়াই করা। আর যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে এ পথে জীবন দিক কিংবা বিজয় লাভ করুক, অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব। তোমাদের এ কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে সে সকল অসহায় নর-নারী ও (দুঃস্থ) শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্য লড়াই করো না! যারা (নির্যাতনে কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের মালিক, এই যালিমদের জনপদ থেকে আমাদের বের করে (অন্য কোথাও) নিয়ে যাও; অতঃপর তুমি আমাদের জন্য তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক (পাঠিয়ে) দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাও। যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান

এনেছে তারা সর্বদা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তাআলাকে) অস্বীকার করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের সপক্ষে। অতএব তোমরা যুদ্ধ করো এসব শয়তান ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে, (তোমরা সাহস হারিয়ো না, কারণ) শয়তান চক্রের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ৭৪-৭৬)

"(হে মুহাম্মদ) যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরি করেছে তাদের তুমি বলো, তারা যদি এ থেকে (এখনো) ফিরে আসে তাহলে তাদের অতীতের সবকিছুই ক্ষমা করে দেয়া হবে; তবে যদি তারা (তাদের আগের কার্যকলাপের দিকে) ফিরে যায় তাহলে তাদের (সামনে) আগের (জাতিসমূহের ভয়াবহ) পরিণামের দৃষ্টান্ত তো রয়েছেই। (হে ঈমানদার লোকেরা) তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো যতক্ষণ না (আল্লাহ তাআলার যমিনে কুফরির) ফেতনা বাকি থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার জন্যই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে। (হ্যাঁ) তারা যদি (কুফর থেকে) নিবৃত্ত হয় তাহলে আল্লাহ তাআলাই হবেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী। (এসব কিছু সত্ত্বেও) যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক (আল্লাহ তাআলা), কতো উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)।" (সূরা আল আনফাল, আয়াত ৩৮-৪০)

"আহলে কিতাবদের মাঝে যারা আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম বলে স্বীকার করে না, (সর্বোপরি) সত্য দ্বীন (ইসলাম)-কে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না; তাদের বিরুদ্ধে তোমরা অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাও–যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (কর) দিতে শুরু করে।"

(সূরা তাওবা, আয়াত ২৯-৩০)

উল্লিখিত আয়াতে আলোচিত বিষয়টি পর্যালোচনা করলে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি। যেমন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আধিপত্য, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের জিহাদ নয়; বরং মানবজাতির জীবনে ও আল্লাহর যমিনে আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামের এ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে যেসব তাগুতি শক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের মূলোৎপাটন করাই জিহাদের লক্ষ্য। কারণ, কোনো ব্যক্তি, পার্লামেন্ট বা কোনো দল মানুষের ওপর নিজেদের ইচ্ছামতো রচিত আইন-কানুন ও সংবিধান চাপিয়ে দেয়ার অধিকার রাখে না। কেননা, প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, তাই তাদের প্রত্যেকের কাজ হলো শুধু স্রষ্টার দাসত্ব করা। প্রভুত্ব করার কোনো অধিকার তাদের নেই। এসব বিষয়গুলো নিশ্চিত করাই ইসলামি জিহাদের লক্ষ্য।

ইসলামি জিহাদ কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। মানুষের গোলামি থেকে মানুষকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুক্তি দান করার পর প্রত্যেককেই ইসলাম স্বাধীনভাবে যে কোনো ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা দান করে এবং 'লা-ইকরাহা ফিদ্দীন'

এর নীতিকে ইসলাম সকল অবস্থাতেই শ্রদ্ধা করে। কারো ওপর কখনো জোর করে ইসলাম তার আকিদা-বিশ্বাস চাপিয়ে দেয় না। তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিশ্বজাহানের মালিকের পক্ষ থেকে দেয়া একমাত্র ইসলামি জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ীই পরিচালিত হবে।

জিহাদ প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষকে সকল ধরনের অবৈধ গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যিকার স্বাধীনতা দান করাই ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য। আর একক স্রষ্টা এবং নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব মেনে নেয়ার মাধ্যমেই মানুষ অন্য সকল গোলামি থেকে মুক্তি পেয়ে সত্যিকার স্বাধীনতা পেতে পারে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই মুজাহিদরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। তারা কোনো স্বার্থ উদ্ধার বা নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের জন্য জিহাদ করেননি। তাই জিহাদ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা কখনো বলতেন না যে, 'আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে, তাই যুদ্ধ করছি' অথবা 'পারস্য ও রোমের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করেছি' অথবা সাম্রাজ্য বিস্তার ও ধনসম্পদের লোভে আমরা যুদ্ধ করেছি'। বরং তারা একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, তাগুতের উচ্ছেদ ও মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দান করার জন্যই জিহাদ করেছেন।

একটি ঘটনা থেকে আমরা এ ব্যাপারে প্রথম যুগের মুসলমানদের চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। কাদেসিয়ার যুদ্ধের পূর্বে পারস্য সেনাপতি রুস্তম হযরত রাবী ইবনে আমর, হোযায়ফা বিন মুহসিন এবং হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা)-কে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তোমরা কী জন্য এভাবে জীবনবাজি রেখে এই সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে এতো বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছ? তারা প্রত্যেকেই সমস্বরে বলেছিলেন,

'আল্লাহ তাআলা আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন মানবজাতিকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে লা শারীক আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের অধীনে নিয়ে আসি, ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের করে তাদেরকে যেন ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসি। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার পথের সকল বাধা দূর করার জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন, তাই আমরাও সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করি। যারা আল্লাহর নাযিল করা জীবনবিধান মেনে নেয় আমরা তাদের রাজ্য ছেড়ে দিই। আর যদি কেউ এ দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাহলে আমরা হয় বিজয়, নয় শাহাদাত পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাই।'

ইসলাম এমনই এক জীবনব্যবস্থা যার মৌলিক নীতির সাথে জিহাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিষয়টি এমন নয় যে, দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করার পর ইচ্ছে হলে জিহাদে অংশগ্রহণ করলাম–ইচ্ছে না হলে করলাম না। বরং এই দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করা অর্থই হলো জিহাদের ঘোষণা দেয়া; চাই কাফিরদের পক্ষ থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে আক্রমণের কোনো আশংকা থাকুক বা না থাকুক; পৃথিবীর এক ইঞ্চি ভূখণ্ডেও যদি জাহেলি সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে তাহলে ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে তার সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই জিহাদকে শুধু দেশরক্ষার বা সাময়িক প্রয়োজনের যুদ্ধ বলে চালিয়ে দেয়ার কোনো অবকাশ নেই। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ উদ্ধার বা কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে মুসলমানরা জিহাদ করে না। কেননা, এই অস্ত্রের ময়দানের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এক কঠিন যুদ্ধে বিজয়ী হতে হয়। আল্লাহর পথে যাতে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে না পারে সে জন্য অর্থ-সম্পদ স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনের ভালোবাসা, জীবনের মায়া তথা আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য যতো ধরনের মোহনীয়-লোভনীয় জিনিস রয়েছে তার সবই শয়তান একে একে তার সামনে তুলে ধরে। এসব ক্ষুদ্র চিন্তা থেকে যে মুমিন নিজের অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ করতে পারে সে-ই কেবল যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হতে পারে। দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবী থেকে বাতিল জীবনব্যবস্থা, জাহেলি চিন্তা-ধারা ও তাগুতি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করাই মুমিন মুজাহিদের লক্ষ্য।

দেশ রক্ষার যুদ্ধ বনাম ইসলামের জিহাদ

যারা জিহাদকে 'শুধু দেশরক্ষার যুদ্ধ' হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায় তারা ইসলামের মাহাত্মে কালিমা লেপন করতে চায়। কেননা, আধুনিক কিংবা প্রাচীন জাহেলিয়াতে মাতৃভূমিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দেয়া হতো ইসলাম সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দেয় না এবং এ ধরনের ক্ষুদ্র চিন্তাকে মোটেই সমর্থন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভূমি কেন পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে ইসলামি আদর্শ বেশি মূল্যবান। সবকিছু বর্জন করে মাতৃভূমিকে সবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তার পূজা করা কিছুতেই বৈধ নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নিছক কোনো ভূখণ্ডের তেমন কোনো মর্যাদা বা মূল্য নেই। কোনো ভূখণ্ড ইসলাম তখনই মূল্যবান মনে করে যখন সেই ভূখণ্ডে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে ভূখণ্ডে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য ইসলাম তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। সেই ভূখণ্ড ইসলাম এ কারণে রক্ষা করে না যে, সেটা কারো 'মাতৃভূমি বা দেশমাতৃকা; বরং সেই ভূখণ্ড ইসলামি আদর্শের কেন্দ্রভূমি হওয়ার কারণেই রক্ষা করা তার অপরিহার্য্য দায়িত্ব বলে মনে করে। নিছক ভূখণ্ড হিসেবে এর কোনো মূল্যই নেই। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মিশনের একটা স্তর হিসেবেই ইসলামের কাছে ভূখণ্ডটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ, এ ভূখণ্ডকে কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে গোটা বিশ্বে ইসলাম আলো ছড়িয়ে দিতে চায়, মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সংগ্রাম পরিচালনা করতে চায়। ইসলামের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কোনো দেশেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং গোটা বিশ্বই ইসলামের কর্মক্ষেত্র।

ইসলামের সাথে জিহাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য

ইসলাম অকারণে কিংবা কোনো খোঁড়া অজুহাতে কাউকে আক্রমণ করার পক্ষপাতী নয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর শুধু এ কারণেই সে আক্রমণ করে না যে, সে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেককেই তার পছন্দ অনুযায়ী ধর্মমত পালন করার স্বাধীনতা ইসলাম নিশ্চিত করে। কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি, কিংবা কোনো ব্যক্তি যখন ইসলামের বাণী প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখনই কেবল ইসলাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম দেয়। কেননা, এ পর্যায়ে এসে সেই ব্যক্তি বা দল মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই বাধা অপসারণ করে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই ইসলামি জিহাদের লক্ষ্য। মানবসমাজের ওপর যেসব মানুষ তাদের মনগড়া শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে তাদের আদর্শের গোলাম বানিয়ে রেখেছে, সেসব শক্তির মূলোৎপাটন করাই ইসলামি জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিবেশের কারণে, বিশ্বজুড়ে ইসলামবিরোধীদের তোড়জোড় ও হুমকি-ধমকিতে ভয় পেয়ে তাদেরকে খুশি করার জন্য, কিংবা পাশ্চাত্যের ধূর্ত লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত ও নমনীয় হওয়ার কারণে কোনো ব্যাখ্যা দিলে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, জিহাদ ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম যতোদিন আছে জিহাদও ততোদিন থাকবে। দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, যুদ্ধ করার অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম কিছু না থাকলেও জিহাদের হুকুম বহাল থাকবে। ইতিহাসের অমুক স্তরে অমুকেরা জিহাদ করেনি এমন কথা বলে কোনো লাভ নেই। যারা করেনি সেটা তাদের ব্যাপার। এতে ইসলামে জিহাদের হুকুম রহিত হয়নি; বরং তারাই ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। ইতিহাসের উত্থান-পতনের ঘটনা পর্যালোচনার সময় এটা কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলাম বিশ্বমানবতার সার্বজনীন মুক্তির ঘোষণা দিয়েছে এবং সেজন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। জিহাদ এ কর্মপন্থারই নাম। নিছক দেশরক্ষার প্রয়োজনে জিহাদ করা কিংবা উপায় উপকরণের সাথে জিহাদকে শর্তযুক্ত করে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। গায়রুল্লাহর দাসত্ব থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করা, গোটা পৃথিবীকে আল্লাহর আইনের অধীনে নিয়ে আসা এবং সমাজের স্বার্থপর, ধোঁকাবাজ ও প্রতারক নেতাদেরকে হটিয়ে সেখানে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য।

জাহেলি সমাজের স্বার্থপর নেতারা জানে যে—আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলে তথা ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়িত হলে তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও স্বার্থ বজায় থাকবে না। তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই এসব নেতারা ইসলামি আন্দোলনকে দমন করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তারা ভালো করেই জানে যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মতো দুশ্চরিত্র, স্বার্থপর, লম্পট ও প্রতারকদের কোনো অস্তিত্ব সমাজে থাকবে না। তাই তারা ইসলামি আন্দোলনকে নিজেদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে

হুমকিস্বরূপ মনে করে এবং ইসলামি আন্দোলনকে অংকুরেই ধ্বংস করে দিতে চায়। এক্ষেত্রে ইসলামি আন্দোলনকে তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থেই আত্মরক্ষামূলক কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়। ইসলাম কারো সাথে অকারণে সংঘর্ষে যাওয়া পছন্দ করে কিনা–এ প্রশ্ন এখানে একেবারেই অবান্তর। কেননা, তাকে জোর করেই এখানে সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। ইসলামি আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে সমাজে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ সংঘাত এক অনিবার্য পরিণতি। কেননা, এটা উভয়েরই অস্তিত্বের লড়াই। ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও মানবরচিত জীবনব্যবস্থা এমনই দুটো সাংঘর্ষিক বিষয়, যার সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়। তাই অনিবার্য ও সংগত কারণেই ইসলামি আন্দোলনকে এ স্তরে প্রতিরক্ষামূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

ইসলামের আপসহীন চরিত্র

আপসহীনতা ইসলামি জীবনবিধানের একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। কোনো অবস্থাতেই ইসলাম কখনো আপসকামী নীতি পছন্দ করে না। সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ ছাড়া সকল ধরনের গোলামি থেকে মুক্ত করার নীতিতে ইসলাম আপসহীন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের ব্যাপারে ইসলাম বদ্ধপরিকর। তাই ইসলাম নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে, কোনো গোত্রীয় বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ হওয়ার কোনো নীতি কখনোই সমর্থন করে না। পৃথিবীর এক ইঞ্চি যমিনেও যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামি চলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের সংগ্রাম চলতে থাকবে। এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো–কখনো এমনও হতে পারে যে, কোনো অঞ্চলের ইসলামবিরোধী জাহেলি নেতৃত্ব কোনো ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মুসলিম নেতৃত্বকে হয়তো বলতে পারে, 'আমরাও আপনাদের ওপর কোনো আক্রমণ করবো না, আমাদের ওপরও আপনারা কোনো আক্রমণ করবেন না, আমাদেরকে আমাদের যার যার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন'। এক্ষেত্রে ইসলাম কখনো তাদের সাথে এ ধরনের চিরস্থায়ী চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। একমাত্র জিযিয়া-কর দিয়ে যদি তারা ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নেয় এবং দ্বীন প্রচারের ও দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি না করে তবেই ইসলাম এ ধরনের চুক্তি করতে পারে।

জিহাদ দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থেকে শুরু করলেও এ দ্বীনের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মনে রাখতে হবে যে, নিজেকে জাতীয়তাবাদের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা আর নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করা কখনো এক কথা নয়। ইসলাম নিজেকে কখনোই নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সম্মত নয়; বরং আল্লাহর যমিনের এক ইঞ্চি জায়গা কিংবা আল্লাহর সৃষ্ট একজন বান্দাকে এই দ্বীনের বাইরে রেখে ইসলাম তার সংগ্রাম বন্ধ করতে রাজি নয়। ইসলামের অবিরাম জিহাদের যৌক্তিকতা খোঁজার পূর্বে আপনাকে

মনে রাখতে হবে যে, এই দ্বীনের কোনো একটি অংশ সম্পর্কেও মন মতো কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার কোনো মানুষের নেই। এ দ্বীন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন এবং তিনিই জিহাদকে এই দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। দ্বীন কোনো দলের মেনুফেস্টো নয়, কোনো মানুষের রচিত জীবনবিধানও নয় যে, মন চাইলেই এর কোনো বিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করা যায়। আসলে জিহাদবিমুখ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পেছনে তারাই পড়ে, যারা জানে না যে, আল্লাহর যমিনের প্রতিটি ইঞ্চি মানবরচিত শাসনব্যবস্থার জঞ্জাল থেকে মুক্ত করা এবং সেখানে আল্লাহর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এই দ্বীনের সর্বপ্রধান কর্মসূচি। ইসলামের এ মৌলিক কর্মসূচির ব্যাপারে যারা সজাগ তারা অযথা এসব অবান্তর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পেছনে পড়ে না।

জিহাদ সম্পর্কে দ্বিমুখী চিন্তা

উপরে আলোচিত বিষয়টিকে এতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করার মূল কারণ হলো, দুর্নীতিপরায়ণ স্কলারদের অপব্যাখ্যা। যার কারণে ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে মানুষের মাঝে দু'ধরনের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে উভয়টিকে এক রকম মনে হলেও উভয়টির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথম চিন্তাটি হলো ইসলাম কখনোই কারো বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায়নি। কিছু মানুষ ইসলামকে হটিয়ে দেয়ার জন্য মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার কারণে নিতান্ত আত্মরক্ষার স্বার্থে বাধ্য হয়েই ইসলাম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় চিন্তাটি হচ্ছে যে, কোনো কারণে বাধ্য হয়ে নয় বরং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই ইসলাম জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এ দু'টি চিন্তার ব্যাবধানটি হঠাৎ করে চোখে না পড়ার কারণ হলো যে, উল্লিখিত উভয় অবস্থাতেই ইসলাম জিহাদে লিপ্ত। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ দু'ধরনের চিন্তাধারার মধ্যে বাস্তবে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আল্লাহর অনুমোদিত ও মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা এবং ইসলামকে কোনো ধরনের জাতীয়তাবাদী জীবনব্যবস্থা মনে করা এই দু'য়ের যেমন বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান, এখানেও একই পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার অনিবার্য দাবি হলো দুনিয়াতে আল্লাহর আইনের শাসন ছাড়া অন্য সকল মানবরচিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করা। গোটা বিশ্বের মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়ার জন্য আহ্বান করা এবং 'এক আল্লাহর দাসত্বের' নীতিতে এমন একটি সমাজ গঠন করা, যেখানে সামষ্টিকভাবে সকল মানুষ জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর আইন-কানুন মেনে চলতে পারে। এরপর পর্যায়ক্রমে গোটা পৃথিবী থেকে মানুষের প্রভুত্ব ও মানুষের বানানো আইন-কানুন সমূলে

উচ্ছেদ করার জন্য জিহাদ ঘোষণা করা। কারণ, এসব নোংরা সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলে মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষের গোলামি থেকে কখনোই মুক্তি লাভ করতে পারে না।

দ্বিতীয় যে মতটি আমি উপরে তুলে ধরেছিলাম সেভাবে চিন্তা করলে ইসলামকে নিছক একটি আঞ্চলিক মতবাদই মনে করা হয় এবং এক্ষেত্রে বলা হয় যে, মুসলমানরা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ এলাকার জনগণের আত্মরক্ষার জন্যই কেবল যুদ্ধ করে থাকে। আমার মনে হয় না যে, উভয় চিন্তার পার্থক্যটি বুঝানোর জন্য আলোচনার প্রয়োজন। কেননা, উভয় অবস্থাতে যদিও ইসলাম যুদ্ধে লিপ্ত তবে দু'টি চিন্তার মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য সুস্পষ্ট। যুদ্ধের বাহ্যিক দিক একই রকম হলেও এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বিশ্বমানবতার কল্যাণের স্বার্থেই আল্লাহ তাআলা দ্বীন নাযিল করেছেন। তাই যেসব অবৈধ শাসনব্যবস্থা আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে সেগুলো উচ্ছেদ করা দ্বীনের প্রথম কর্মসূচি। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্বার্থে ইসলাম নিজেই মানবরচিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মনে রাখতে হবে এ সংগ্রাম সাধারণ মানুষকে জোর করে ইসলামি আকিদা গ্রহণ করানোর জন্য নয়; বরং যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলো মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে আল্লাহর প্রভুত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধেই ইসলামের জিহাদ। কারণ, ইসলাম বিশ্বাস করে যে, এসব স্বার্থপর সুবিধাভোগী ও ক্ষমতালিপ্সুদের ঘৃণ্য গোলামি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারলেই ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা থেকে সমাজের সাধারণ মানুষদের মুক্ত করা সম্ভব।

ইসলামি জীবনব্যবস্থার মৌলিক কথাই হলো মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে একমাত্র আল্লাহর গোলামিতে নিয়ে আসা । এ লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে ইসলাম আপসহীন। এ উদ্দেশ্য থেকে ইসলাম কখনো বিচ্যুত হতে পারে না। কেননা, এর মাধ্যমেই মানবজাতি সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। এই ব্যবস্থায় কেউ কারো হুকুমের গোলাম নয়, কেউ কারো হুকুমদাতা বা আইনদাতা বা মনিবও নয়। সবাই আল্লাহর গোলাম। এখানে সাদা-কালো, ধনী-গরীব, আপন-পর সবার জন্য একই রকম আইন প্রয়োগ করা হয়। কারো কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে প্রতিটি মানুষই এই ব্যবস্থায় সমান অধিকার ভোগ করে। পক্ষান্তরে মানবরচিত শাসনব্যবস্থায় মানুষের মধ্য থেকেই একটি বিশেষ শ্রেণী অন্যসব মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে বসে। তারা সাধারণ মানুষের জন্য আইন-কানুন রচনার অধিকার দাবি করে। অথচ মানুষের জন্য আইন-কানুন রচনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবি করা মূলতঃ আল্লাহর ক্ষমতায় নিজেদের ভাগ দাবি করারই নামান্তর। 'আল্লাহর মতো আমাদেরও আইন রচনা করার ক্ষমতা আছে' এ কথা মুখে না বললেও কার্যক্ষেত্রে তাদের এ দাবি প্রকাশ পায়।

জিহাদ নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার

জিহাদ সম্পর্কে এতোসব তর্ক-বিতর্ক উত্থাপনের মূল কারণ হলো পাশ্চাত্যের অপপ্রচার। পাশ্চাত্যের অপপ্রচারে মুসলমান সমাজের কিছু কলমধারীও আজ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের লেখকরা অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে ইসলামের জিহাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও রূপরেখার বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত। তারা এই জিহাদের মাহাত্ম ও কল্যাণকামিতার দিকগুলোকে চাপা দিয়ে এমন একটি চিত্র তুলে ধরেছে যে, জিহাদের কথা মনে হলে মানুষের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে– 'একদল রক্তপিপাসু হায়েনা এসে গলায় তলোয়ার ঠেকিয়ে বলছে, হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নয়তো তোর কল্লা এখনই ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে'। আর তাদের এই অপপ্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে মুসলিম সমাজে বসবাসরত পাশ্চাত্যের আদর্শিক গোলামেরা উঠেপড়ে লেগেছে ইসলামের কপাল থেকে জিহাদনামক এই কলংকের! ছাপ মুছে দিতে। তাদের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয়, তারা যেন দ্বীনের মহাকল্যাণ সাধন করছে। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চাচ্ছে যে, 'ইসলাম তো ভাই শান্তির ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহের আবার দরকারটা কী? তোমরা যা খুশি তাই করো, আমাদের গায়ে এসে না পড়লে তোমাদের আমরা কিছুই বলতে যাবো না।' আসলে এসব নামধারী মুসলিম দার্শনিকদের মনে পাশ্চাত্যের চিন্তাদর্শনই কাজ করে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা যেমন মনে করে, ধর্ম নিছক অন্তরে পুষে রাখা কিছু ধ্যানধারণার নাম; কর্মজীবনের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক তেমনি তাদের এসব আদর্শিক পোষ্যপুত্ররাও আজকাল ইসলামকে নিছক নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, খৎনা, ঈদ পালন, কোরবানীর গরুর গোশত খাওয়া–এ রকম কিছু অনুষ্ঠানসর্বস্ব কাজকর্মে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় ।

কিন্তু ইসলাম কখনোই এ ধরনের নিছক কোনো 'ধর্ম' নয়। ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা জীবনের ছোট থেকে নিয়ে বড়, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিকসহ জীবনের সকল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান দেয়। এর প্রতিটি বিধান মানবজাতির জন্য শুধু কল্যাণই বয়ে আনে, অকল্যাণ নয়। আর এ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামের প্রতিটি স্তরই ইসলামে 'জিহাদ' বলে স্বীকৃত। ব্যক্তিগত জীবনে যে কোনো ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে এই জীবনব্যবস্থা যেমন উদার, ঠিক তেমনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টিকারী সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির মূলোৎপাটন করার ব্যাপারেও ইসলাম বদ্ধপরিকর।

আল্লাহর রাসূলকে মক্কী জীবনে সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য বিরত থাকার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা ছিলো একটি সুদূরপ্রসারী ও সুপরিকল্পিত জিহাদ শুরু করার একটি স্তরমাত্র। সশস্ত্র যুদ্ধ পরিহার করে চলার এ নির্দেশ নীতিগতভাবে

কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়' বরং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার একটি স্তর বিশেষ। জিহাদ সম্পর্কে নাযিল হওয়া আয়াতসমূহের পটভূমি ও পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পর্যালোচনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হলে আয়াতের সার্বিক শিক্ষণীয় দিক এবং নাযিলের স্তর ও পটভূমি–এই দু'টি বিষয়কে সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। এর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেললে বিভ্রান্তি বৈ কিছুই জুটবে না। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে হিফাযত করুন।

বর্তমান সমাজের মানুষেরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিয়ে-তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন-কানুনের কিছু মানলেও তাদের সমাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, কোর্ট-কাচারি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই নির্বাচিত কিছু লোকের রচিত আইন-কানুন মেনে চলছে-এটা প্রচ্ছন্ন শিরক।

যে সমাজের মানুষের ছোট থেকে বড়, ব্যক্তি থেকে রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক, কোর্ট-কাচারি, অর্থনীতিসহ সকল বিষয় আল্লাহর গোলামির মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় সেই সমাজকেই সত্যিকার অর্থে ইসলামি সমাজ বলা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামি আন্দোলনের মৌল চেতনা

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই কালেমার ওপরই ইসলামি জীবন দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত। এই কালেমার দু'টো অংশ রয়েছে। দু'টো অংশকে একত্রে কালেমায়ে শাহাদাত বলে। এর প্রথম অংশ অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ হলো–আল্লাহ তাআলা ছাড়া নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও দাসত্ব পাওয়ার অধিকার আর কারো নেই। কালেমার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর অর্থ হলো–মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, তাই আল্লাহর দাসত্বের জন্য তিনি যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তা-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। এই কালেমার দুটো অংশই সমান গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষকে সত্যিকার অর্থে মুমিন বা ঈমানদার হতে হলে তাকে অবশ্যই এই কালেমাকে অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে হবে। এ কালেমা-ই হলো ঈমানের মূল ভিত্তি। বাকি সব আমল ও সকল হুকুম-আহকাম এ কালেমার দাবির বাস্তবায়ন। ঈমানের অন্য সব শাখা-প্রশাখার প্রতি ঈমান আনয়ন এ কালেমারই দাবি। যেমন, ফেরেশতা, নবী, পরকাল ও তকদিরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল, হারাম আইন-বিধান–এর সবই আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তবায়নমাত্র। কালেমা শাহাদাতই হলো ইসলামি জীবনাদর্শের প্রধান ভিত্তি। এই ভিত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত মজবুত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ ভিত্তির ওপর কোনো সমাজব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না। এই বুনিয়াদ বাদ দিয়ে বা এই বুনিয়াদের সাথে অন্য কোনো নীতি-আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যে সমাজ গড়ে ওঠে, তাকে কিছুতেই ইসলামি সমাজ বলা যেতে পারে না। ইসলামি সমাজ শুধু সেই সমাজকেই বলা যেতে পারে, যেখানে আপসহীনভাবে কালেমার সকল দাবির যথার্থ বাস্তবায়ন হয়। যে সমাজ কালেমা শাহাদাতের তাত্ত্বিক দিকগুলোর বাস্তবচিত্র পেশ করে, সে সমাজকেই শুধু ইসলামি সমাজ বলা যেতে পারে। যে সমাজে এই কালেমার নির্ভেজাল প্রতিফলন নেই' তা কিছুতেই ইসলামি সমাজ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

"আর (এ বিধানের বলেই) তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো গোলামি করবে না, (কারণ) এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক জীবনবিধান"
(সূরা ইউসুফ, আয়াত-৪০)

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে (যেন) আল্লাহরই আনুগত্য করে।"
(সূরা আন নিসা, আয়াত-৮০)

আয়াত দু'টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এর মাঝে নিহিত রয়েছে ইসলামি জীবনাদর্শের সার্বিক নির্দেশনা। আয়াত দু'টিতে সংক্ষেপে হলেও এর মাঝে আল্লাহর দ্বীনের সিদ্ধান্ত কারী ঘোষণার সঠিক রূপ নিখুঁত ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়,

ইসলামি আন্দোলন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় যে মৌলিক নির্দেশনাগুলো আমাদের সামনে পেশ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো,

১. ইসলামি সমাজের বাস্তব রূপরেখা।

২. ইসলামি সমাজ গঠন করার পদ্ধতি।

৩. জাহেলি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি।

৪. কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবরচিত আইনের বেড়াজাল থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে সেখানে সফলভাবে ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ইসলামি আন্দোলনের জন্য উল্লিখিত বিষয়সমূহ অতীতেও যেমন মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, আজও তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

প্রকৃত ইসলামি সমাজের বৈশিষ্ট্য

যে সমাজের মানুষের ছোট থেকে বড়, ব্যক্তিগত থেকে রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক, কোর্ট-কাচারি, অর্থনীতিসহ সকল বিষয় আল্লাহর গোলামির মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর আইন দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সমাজকেই কেবল সত্যিকার অর্থে ইসলামি সমাজ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, আইন-কানুন তথা সকল কাজের মধ্য দিয়েই যারা প্রমাণ করে যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই গোলামি করে যাচ্ছে—এমন সমাজই হলো ইসলামি সমাজ। আর কালেমা শাহাদাত এ ধরনের আল্লাহর দাসত্বমূলক জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে নেয়ার মৌখিক স্বীকৃতি দেয় এবং বাস্তব জীবনে তা পালনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেছেন—

"(হে মানুষ) আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ করেছেন যে, তোমরা (নিজেদের জন্য) দু'জন মাবুদ বানিয়ো না, মাবুদ তো শুধু একজন; সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো। আকাশমণ্ডলী ও যমিনের (যেখানে) যা কিছু আছে তা সবই তাঁর জন্য (নিবেদিত)। জীবন বিধানকে (হামেশা) তাঁর অনুগত করে দেয়াই (সকলের) কর্তব্য, (এরপরও কি) তোমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে?"

(সূরা আন নাহল, আয়াত ৫১-৫২)

ঠিক তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর শক্তিক্ষমতা ছাড়া অন্য কারো শক্তিক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রতিপত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে কিংবা কোনো ধরনের জাহেলি আদর্শের সাথে আপস করে অথবা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক স্থাপন করে, তাহলে সে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর গোলামি স্বীকার করে নেয়নি। কেননা, আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন,

"তুমি (একান্ত বিনয়ের সাথে) বলো, আমার নামায, আমার এবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ–সবকিছুই সারা জাহানের মালিক আল্লাহ তাআলার জন্য (নিবেদিত)। তাঁর শরীক সমকক্ষ কেউ নেই; আর একথা (বলার জন্যই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, (আত্মসমর্পণকারী) মুসলমানদের মধ্যে আমিই হচ্ছি সর্বপ্রথম।"

(সূরা আনআম, আয়াত ১৬২-১৬৩)

এরপর যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবনের কিছু অংশে আল্লাহর আইন মানে, আর কিছু অংশ মানুষের বানানো আইনানুসারে পরিচালনা করে তাহলে সেও আল্লাহর দাসত্ব থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। যেমন বর্তমান সমাজের মানুষেরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিয়ে-তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন-কানুনের কিছু মানলেও তাদের সমাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, কোর্ট-কাচারি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই নির্বাচিত কিছু লোকদের রচিত আইন-কানুন মেনে চলছে। যা প্রচ্ছন্ন শিরক। তারা এসব নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে আইন রচনার ক্ষমতায় সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে। এদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন,

"এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্য এমন কোনো জীবন-বিধান প্রণয়ন করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তাআলা দেননি?" (সূরা শূরা, আয়াত ২১)

"(আল্লাহর) রাসূল তোমাদের জন্য যা কিছু (বিধিবিধান) নিয়ে এসেছেন তা তোমরা আঁকড়ে ধরো এবং যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"

(সূরা হাশর, আয়াত-৭)

এই মূলনীতি থেকে ইসলামি সমাজের সদস্যরা জীবন চলার নীতি নির্ধারণ করবে এবং সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর দাসত্বের প্রতিফলন ঘটাবে। আকিদা-বিশ্বাস, আইন-কানুন, রীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি–এর কোনো একটি অধ্যায়ও যদি আল্লাহর দাসত্বের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে ওই সমাজের ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘটে। কারণ, এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সাথে কালেমায়ে শাহাদাত-এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এ সম্পর্কের মাঝে সামান্য কোনো ফাটল সৃষ্টি হলেও তা চরম পরিণতি বয়ে আনে। সমাজের সকল স্তরে এ কালেমার শর্তহীন ও পুংখানুপুংখ বাস্তবায়ন ছাড়া ইসলামি সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়।

তাই এসব সমাজের গতানুগতিক সদস্য হয়ে এবং মুখে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে মানুষকে হয়তো বোকা বানানো যেতে পারে; কিন্তু যিনি সব দেখেন, সব শোনেন, তাঁর কাছে এগুলো কোনো মূল্যই বহন করে না। যারা নিজেদের মন ও জীবনকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল শক্তির আনুগত্য থেকে পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র করেছে তাদেরকে নিয়ে একটি উম্মাহ গড়ে তুলতে হবে এবং তারাই ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য হওয়ার যোগ্য। তাদের সমাজই কেবল ইসলামি সমাজ হতে পারে, যাদের জীবন হবে কালেমার বাস্তবচিত্র; তারাই হবে এই সংগ্রামী কাফেলার অগ্রনায়নক।

ইসলামের প্রথম সোনালি সমাজ এ প্রক্রিয়াতেই গঠিত হয়েছিলো এবং ভবিষ্যতে হলেও এ পদ্ধতিতেই হতে হবে। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার এটাই শাশ্বত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ইসলামি সমাজ গঠন হতে পারে না।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন আনুগত্য-(তা পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য হোক বা আংশিক) নিঃসন্দেহে শিরক। তাই সামষ্টিকভাবে সমাজের মানুষেরা সকল অপশক্তির আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে পারলে তারপরই ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সামষ্টিকভাবে যখন কোনো সমাজের মানুষেরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে সমাজ পরিচালনা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তখন সে প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করেই একটি উম্মত গঠিত হয়। এভাবে তারা জাহেলি সমাজের কবর রচনা করে সেখানে তাওহিদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে। এ পর্যায়ে এসে পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত জাহেলি সমাজের কয়েকটি পরিণতি এমন হতে পারে।

১. মুসলিম সমাজের আলোর মাঝে এমনিতেই এই জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিলীন হয়ে যেতে পারে।

২. ইসলামি সমাজের সাথে আনুগত্যমূলক আপসরফাও হতে পারে।

৩. কিংবা ইসলামি সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারে।

তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ইসলামি সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করাটাই স্বাভাবিক। মুহাম্মদ (স) যখন একা দাওয়াত দিয়েছেন তখন প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছেন, তেমনিভাবে যখন তাঁর আহ্বানে কিছুসংখ্যক লোক সাড়া দেন তাদের ওপরও নেমে আসে অমানবিক যুলুম-নির্যাতন। এমনকি রাজনৈতিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরও জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা ইসলামি সমাজকে উচ্ছেদ করার লড়াই অব্যাহত রাখে। এটা শুধু শেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এরই ইতিহাস নয়, বরং নূহ (আ.) থেকে মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত যতো নবী-রাসূল এসেছেন তাদের প্রত্যেককে একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বাতিল সব সময়ই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

জাহেলি সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীরা যেহেতু সব সময়ই ইসলামি সমাজ ধ্বংসের জন্য সংকল্পবদ্ধ, সেহেতু ইসলামি সমাজের ধারক-বাহকদেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উদাসীনতা চরম ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। তাই জাহেলি রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। এ শক্তি অর্জন ছাড়া ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠিত হলেও তার পতনও অবশ্যম্ভাবী। তবে এই শক্তি-ক্ষমতা বলতে বস্তুবাদীদের মতো শুধু সামরিক শক্তিকেই বুঝানো হয়নি; বরং এখানে সর্বপ্রধান শক্তি হলো ঈমানি শক্তি। এরপর রয়েছে নৈতিক শক্তি, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, শৃংখলা, আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতাসহ আরো অনেক কিছু। তবে হাঁ, এই সব চারিত্রিক, ঈমানি ও সাংগঠনিক শক্তির সাথে সাথে যথাসাধ্য অস্ত্রবল ও সামরিক শক্তি অর্জন করাটাও জরুরী। এর কোনোটিকেই সামান্যতম অবহেলার দৃষ্টিতে দেখার উপায় নেই।

জাহেলিয়াতের মোকাবেলা

চিন্তা-দর্শন, মতবাদ কিংবা কোনো বস্তুবাদী বিষয়ই হোক না কেন, মোকাবেলা করতে হলে অবশ্যই তার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। এখানে জাহেলিয়াতের স্বভাবপ্রকৃতি নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

ইসলামি সমাজ ছাড়া অন্য সকল সমাজই জাহেলি সমাজ। যদি আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই তাহলে বলতে পারি, যে সমাজের আকিদা-বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, রাজনীতি এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না সে সমাজই হলো জাহেলি সমাজ। এই মূলনীতি অনুযায়ী আমরা সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাই যে, বর্তমান বিশ্বের সকল দেশ ও রাষ্ট্রগুলোই জাহেলি রাষ্ট্র ও জাহেলি সমাজ। চাই তা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কিংবা যে নামেই হোক না কেন।

বর্তমান বিশ্বের এসব জাহেলিয়াতের শীর্ষে রয়েছে কম্যুনিষ্ট সমাজ। এরা সরাসরি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এরা এমন চরম বস্তুবাদী যে, এদের বিশ্বাস, প্রকৃতি কিংবা বস্তু থেকে এমনি এমনিই এ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাস, মানুষের কাজকর্ম সবকিছুর মূল ভিত্তি হলো অর্থ ও বস্তুবাদিতা। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি তাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য সমর্পণ করেছে। সকল কম্যুনিষ্ট দেশের শাসক কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চমানের নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা রাখে। এসব বস্তুবাদী দর্শনের কারণে তারা মানুষকেও মনুষ্যত্বের মর্যাদাপূর্ণ আসন থেকে নামিয়ে বস্তু কিংবা জন্তু জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে। এ কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোকেও এরা পশুর চাহিদার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, বাসস্থান ও যৌন চাহিদার প্রয়োজনকেই মানুষের মৌলিক চাহিদা মনে করে। অথচ যে আত্মিক উৎকর্ষ ও মানবীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য নির্ণিত হয়, সেই মৌলিক বিষয়টা এরা উপেক্ষা করে বসে আছে। মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ ও মানবীয় মূল্যবোধের শুরুই হয় আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে। তাই মানুষের এ মনুষ্যত্ববোধের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, প্রকাশ্যে ঘোষণা ও এ বিশ্বাসের দাবি পূরণের স্বাধীনতা ও সুযোগ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এই স্বাধীনতা ও অনুকূল পরিবেশ না থাকলে মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে না। মানবজাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ আবির্ভূত কম্যুনিষ্ট সমাজ মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে হরণ করে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবোধ বিকাশের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়। যেসব অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিসত্তা বিকাশ লাভ করে তার অন্যতম কয়েকটি হলো,

১. ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করা।
২. পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা ও পছন্দনীয় পেশায় বিশেষ যোগ্যতা অর্জনের জন্য সার্বিক সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা।
৩. ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।

কম্যুনিজম মানুষকে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জীবজন্তু ও পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। অথচ এসব অধিকারের যথার্থ প্রয়োগের মধ্য দিয়েই মানুষ পশু ও যন্ত্রের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে সেখানকার মানুষ তাদের মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে জন্তু-জানোয়ারের মতো নিছক কোনো যৌনজীব অথবা যন্ত্রের পর্যায়ে নেমে আসে।

কোনো কোনো দিক থেকে বাহ্যিক চালচিত্র ভিন্ন হলেও মৌলিক দিক থেকে পৌত্তলিক জাহেলিয়াতও একই রকম। এর বাস্তব উদাহরণ দেখার জন্য ভারত, জাপান, ফিলিপাইন ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়। এদের মাঝে বিদ্যমান জাহেলিয়াতের রূপরেখা সাধারণত এমন হয়ে থাকে–

অনেক ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে কাল্পনিক উপাস্য বিশ্বাস করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব উপাস্য গ্রহণ করতে গিয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়।

তারা এসব উপাস্যদের পূজা-উপাসনা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে নিয়েছে।

আর বাস্তব কর্মজীবন পরিচালনার জন্য তারা শরিয়ত বাদ দিয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে আইন-কানুন, রীতিনীতি গ্রহণ করেছে। সমাজ রাষ্ট্র ও তাদের কর্মজীবন পরিচালনার জন্য সাধারণত যেসব উৎস থেকে তারা আইন-কানুন গ্রহণ করে তন্মধ্যে সর্বপ্রধান হলো, রাজনৈতিক নেতৃত্ব। নেতাদেরকে তাদের সমাজে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত করে এদের হাতে দেশ ও সমাজ পরিচালনার দায়-দায়িত্ব তুলে দেয় এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করার অধিকারও তারা তাদেরকে দান করে।

এছাড়াও রয়েছে ধর্মযাজক, জ্যোতিষী, যাদুকরসহ আরো অনেক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। এক সময়ের আসমানি কিতাবের ধারক-বাহক ইহুদী-খৃষ্টানরাও আজ জাহেলিয়াতের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। তাদের সমাজও নিঃসন্দেহে জাহেলি সমাজ। আইন-কানুন রচনার ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়া তো আছেই–সাথে সাথে তারা আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে এমন সব বিভ্রান্তিমূলক আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে যা সত্যিই সীমাহীন পাপাচার। তারা আল্লাহর সাথে মানুষের চরম ভ্রান্তিকর সম্পর্ক নির্ণয় করে। মানুষকেও এরা আল্লাহর পুত্র বলে। আবার আল্লাহকে তিনভাগে ভাগ করে অদ্ভুত ধরনের এক ত্রিত্ববাদের আবিষ্কার করেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা একক, শরীকবিহীন ও নিরঙ্কুশ। তিনি কোনো সন্তান জন্ম দেননি, তিনি নিজে কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি চিরকাল ছিলেন, সব সময় আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনিই একমাত্র চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর ও চিরন্তন। এই যালিম পাপিষ্ঠ ইহুদী

খৃষ্টানদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের কথা তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে বলেন,

"ইহুদীরা বলে, ওযায়র আল্লাহর পুত্র, (আবার) খৃষ্টানরা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র। (আসলে) এ সবই হচ্ছে তাদের মুখের বানোয়াট কথা। তাদের আগে যারা কুফরী করেছে এরা তাদেরই অনুকরণ করছে মাত্র। আল্লাহ তাআলা এদের (সবাইকে) ধ্বংস করুন। (তাকিয়ে দেখো) এরা কীভাবে (আজ দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাচ্ছে।"

(সূরা আত তাওবা, আয়াত ৩০)

"ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত বাঁধা পড়ে গেছে। (আসলে) তাদের নিজেদের হাতেই বাঁধন পড়ে গেছে, আর (এ ধৃষ্টতামূলক) কথায় তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর তো (দুনিয়া ও আখেরাতের) উভয় হাতই উদার, যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন।"

(সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ৬৪)

"ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র। তুমি (তাদের) বলো, তাহলে তিনি কেন তোমাদের গুনাহের জন্য তোমাদের শাস্তি প্রদান করবেন? (মূলত) তোমরা সবাই হচ্ছো আল্লাহর সৃষ্ট (কতিপয়) মানুষ।"

(সূরা-আল মায়েদা, আয়াত ১৮)

এসব সমাজ যে সম্পূর্ণ জাহেলি সমাজ এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কেননা, তাদের আচার-আচরণ, চালচলন, রীতিনীতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন সবকিছুর উৎস হলো জাহেলিয়াত ও ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস। তাদের সমাজ কাঠামো, আর্থসামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক জীবনের কোনো অধ্যায়ই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারা তাদের নির্বাচিত কিছু ব্যক্তিবর্গকে আইন-কানুন রচনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে আল্লাহর আইন অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহর কালাম একমাত্র আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অথচ আইন রচনার এ ক্ষমতা আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত। এ ক্ষমতা অন্য কাউকে দেয়ার অর্থই হলো তাকে/তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ ক্ষমতার আসনে বসানো। যখন কুরআন নাযিল হয় তখনও এরা একই অপরাধে লিপ্ত ছিলো। তারা তাদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতদেরকে আইন-কানুন, বিধিবিধান প্রণয়নের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলো। এ কারণে তাদেরকে মুশরিক আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"এই লোকেরা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্ম যাজকদের 'রব' বানিয়ে নিয়েছে, মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও (কেউ কেউ) 'রব' বানিয়ে রেখেছে। অথচ এদের এক আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারোরই আনুগত্য করতে আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি

ছাড়া (তো আসলেই) আর কোনো মাবুদ নেই। তারা যাদের সাথে আল্লাহর শরীক করে তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র।"

(সূরা তাওবা, আয়াত ৩১)

এরা বোধ হয় তাদের এ সব ধর্মযাজক ও পুরোহিতদেরকে খোদা বা সৃষ্টিকর্তা মনে করতো, তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুশরিক বলেছেন। কিন্তু না, এ ধারণা ভুল। তারা আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা মনে করতো। কিন্তুতাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আল্লাহর আইন-কানুন বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে আইন-কানুন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছিলো। ধর্মযাজকরা আল্লাহর আইন-কানুন অনেক ক্ষেত্রে বাদ দিতো, অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতো এবং সাধারণ জনগণ তাদের এসব আইন-কানুন মেনে নিতো। এদিক থেকে বর্তমান যুগের অবস্থা তো আরো খারাপ! তারা তো এ ক্ষমতা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদের হাতে দিয়েছিলো, আর বর্তমানে এই ক্ষমতা যেসব আইন পরিষদের সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে তারা তো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্বও নয়; বরং আরো ইতর শ্রেণীর বদমাশ, সুদখোর, মদখোর ও স্বার্থপর। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ভালো মানুষ হলে তাদের হাতে এই ক্ষমতা তুলে দেয়া যায়। মানুষ সে যে-ই হোক, যেমনই হোক, যে শ্রেণীরই হোক, গোটা পৃথিবীর মানুষের সমর্থিতই হোক না কেন, তার হাতে আইন-কানুন রচনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করা আল্লাহকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে যে, ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও বর্তমান বিশ্বের নামধারী মুসলিম সমাজগুলোও একই রকম জাহেলি সমাজে পরিণত হয়েছে। তারা কিছুক্ষেত্রে আল্লাহকে মেনে চলছে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের মতো কিছু আনুষ্ঠানিক হুকুম-আহকাম পালনও করছে। তারা মাটির বানানো মূর্তির পূজায় লিপ্ত নয়; তবুও এই সমাজ জাহেলি সমাজ। কারণ, তারা আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানুষের মনগড়া আইন-কানুন অনুযায়ী জীবন যাপন করছে। তারা সুর করে কুরআন পড়লেও রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে কুরআনকে বর্জন করে মানুষের রচিত সংবিধান গ্রহণ করেছে। মৌখিকভাবে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের দাবি করা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে সংবিধান রচনার ক্ষমতাটি আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত না রেখে কিছু মানুষের কাছে সমর্পণ করেছে। চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ জীবনের প্রায় সব বিষয়েই নিজেদের মনমতো আইন-বিধান রচনা করে নিয়েছে। অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা (হচ্ছে) কাফির।" (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত-৪৪)

"(হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যারা মনে করে যে, তারা তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের ওপর নাযিলকৃত বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে, অথচ (ফয়সালার

সময় আমার কিতাবের বদলে) এরা তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা চায়, যদিও এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এসব তাগুতকে অস্বীকার করতে,”

(সূরা আন-নিসা, আয়াত ৬০)

“না, আমি তোমার রবের শপথ করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে; অতঃপর তুমি যা ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না, উপরন্তু তোমার সিদ্ধান্তকে তারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৬৫)

ইহুদীজাতি কর্তৃক ওযায়েরকে এবং খৃষ্টানজাতি কর্তৃক ঈসা বিন মারইয়ামকে আল্লাহর পুত্র বলাকে আল্লাহ তাআলা যে স্তরের শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন, ধর্মযাজক বা রাজনৈতিক নেতাদের হাতে আইন-কানুন রচনার ক্ষমতা তুলে দেয়াকেও একই স্তরের শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, উভয় শ্রেণীর কর্মকাণ্ড দ্বারাই আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুতি ঘটে। অথচ বর্তমান বিশ্বে যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করছে, তারাও তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান ও আইন-কানুন রচনার দায়িত্ব কিছু মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। অত্যন্ত লজ্জাস্কর ও দুঃখজনক বিষয় হলো, আজকাল অনেক নামধারী মুসলমানদেরকে গর্বভরে বলতে শোনা যায় যে, ‘আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী’। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা। আবার কাউকে দেখা যায়, মুখে ইসলামি কথাবার্তার খই ফোটে কিন্তু কাজের বেলায় ঠন্‌ঠন্‌। কেউ আবার গায়ে আধুনিকতার প্রলেপ মেখে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে আছে। যাদেরকে বিজ্ঞানের জনক বলা হয় তাদের কেউ কেউ বলে গেলেন, “বিশাল সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনভর সামান্য কয়েকটি বালুকণা নিয়েই নাড়াচড়া করে গেলাম মাত্র”, কেউ বললেন, ‘সারা জীবন জ্ঞান-গবেষণা করে বুঝলাম যে, কিছুই বুঝতে পারলাম না।’ অথচ দু’চার পৃষ্ঠা বিজ্ঞান পড়ে আজকাল কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস করা নাকি বিজ্ঞানবিরোধী। তারা শুধু দৃশ্যমান বিষয়ের আলোকে সমাজবিজ্ঞান রচনা করতে চান। এ সবই জাহেলিয়াত, অজ্ঞতা, ও মূর্খতা। সবই হলো দীর্ঘকালের নাস্তিক্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার কুফল। এসব চিন্তা-চেতনার ধরন-প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার হলেও সবগুলোর মাঝে একটা সংযোগসূত্র রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, সেই যোগসূত্র হলো জাহেলিয়াত, অহংকার ও সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি। উল্লিখিত সকল সমাজের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইসলাম এসব সমাজকে অনৈসলামিক ও জাহেলি সমাজ হিসেবে সাব্যস্ত করে। কেননা, এর

কোনোটির আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-দর্শন, আইন-কানুন কোনোকিছুই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি।

শেষ পর্যায়ে আমরা কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি। প্রথম প্রশ্ন—মানুষ ও মানব সমাজকে পরিশুদ্ধির জন্য ইসলাম কোন নীতি অবলম্বন করে? এর উত্তরে বলা যায় যে, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমান্বয়ে ইসলাম তার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে তাকে ও মানব সমাজকে পরিশুদ্ধ করে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—মুসলিম সমাজের মূল ভিত্তি কী হবে? এর উত্তর হলো, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণই হলো মুসলিম সমাজ গঠনের মূলনীতি। তৃতীয় প্রশ্ন হলো—মানবজাতির বাস্তব জীবন পরিচালনার জন্য কোন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে? এই জীবনব্যবস্থা রচনার ক্ষেত্রে মানুষের কি কোনো কর্তৃত্ব আছে; না এটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার জন্যই সংরক্ষিত থাকবে? এ প্রশ্নের জবাব ইসলাম অত্যন্ত জোরালো ও বলিষ্ঠভাবে প্রদান করে বলেছে যে, মানুষের জন্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান রচনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত। এই মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত জীবনব্যবস্থাই মানবজাতির জন্য একমাত্র কার্যকর ও কল্যাণধর্মী জীবনব্যবস্থা। এই জীবনবিধানের নামই হলো 'ইসলাম'। কালেমায়ে শাহাদাতের অর্থই হলো এই জীবনবিধানকে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করে নেয়া। জীবনের ছোট-বড় সকল ক্ষেত্রে দ্বীনের বাস্তবায়ন ছাড়া কালেমার দাবি পূরণ হতে পারে না। দ্বীনকে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ ও রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী চলা ব্যতীত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন,

"(আল্লাহর) রাসূল তোমাদের যা কিছু (শিক্ষা) দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং সে যা কিছু নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর, আয়াত-৭)

মানুষের জন্য কোন জীবনব্যবস্থা কার্যকরী হতে পারে? কোন জীবনব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে? এ প্রশ্নগুলোর জবাব ইসলাম খোলামেলাভাবে প্রদান করেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক, যুক্তিভিত্তিক ও বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতিতে। এ কথা আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবো যে, মানুষের জন্য জীবনবিধান রচনার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ পর্যাপ্ত জ্ঞান কার রয়েছে? বিশ্বজগতের এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানুষ কি দাবি করতে পারে যে, এই বিশ্বজগৎ, আসমান, যমিন, পাহাড়-পর্বত, সাগর, মহাসাগর তথা সারা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার চেয়েও তার জ্ঞান বেশি? (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্যই কুরআন সুন্দরভাবে মানুষের কাছে এই প্রশ্নটি রেখেছে,

"কে বেশি জানে? কে বড়ো জ্ঞানী? তোমরা না আল্লাহ?"

অন্য আয়াতে এ প্রশ্নের জবাবও তিনি দিয়েছেন—

"তোমাদেরকে খুব সামান্য পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

সুতরাং, প্রত্যেক সুস্থ বিবেকবান মানুষ এ কথা বিনা বাক্যে মেনে নেবে, যিনি সকল জ্ঞানের আধার, বিশ্বজাহানের একক সৃষ্টিকর্তা, আইনদাতা ও শাসক তো একমাত্র তিনিই হতে পারেন। তাঁর দেয়া আইনই একমাত্র সঠিক আইন হতে পারে। তাঁর আইন মেনে চললেই মানুষের জীবনে শান্তি ও কল্যাণ আসতে পারে। পক্ষান্তরে মানবরচিত মতবাদগুলোর বাস্তবতা কী? বাস্তবতা বলতে এর কিছুই নেই। মানুষের রচিত আইন এক স্থানে যা সচল অন্যস্থানে সেটা অচল। একজন মানতে পারলেও অন্যজনের জন্য তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই মানুষের জীবনে বিপর্যয় ও জটিলতা সৃষ্টি করা ছাড়া এসব মতবাদ মানবজাতিকে কিছুই দিতে পারেনি।

কালিমার দ্বিতীয় অংশে উচ্চারিত 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি এক ব্যাপক অর্থ বহন করে। এই বাক্যের দ্বারা ইসলামি জীবন বিধানের মূলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে। এর মর্ম হলো, মুহাম্মদ (স) এর ওপর যে কুরআন নাযিল হয়েছে সেই কোরআনে এবং মুহাম্মদ (স) এর বাণীতে যেসব মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে তা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল। কুরআন কিংবা হাদিসে যেসব বিষয়ে আইন-বিধান দেয়া হয়েছে এগুলোই চূড়ান্ত। পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পরিমার্জনের কোনো সুযোগ ইসলাম কাউকেই দেয়নি।

অনেকে বলতে পারেন, তাহলে 'ইজতিহাদ' কোথায় গেলো? হ্যাঁ, ইজতিহাদ থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে দু'টো কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

১. ইজতিহাদ সেসব ব্যাপারেই করা যেতে পারে, যেসব বিষয়ে কুরআন কিংবা হাদিস থেকে সরাসরি কোনো নির্দেশনা নেই।

২. ইজতিহাদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো অবকাশ নেই। ইজতিহাদ করার সময় অবশ্যই দ্বীনের সার্বিক চেতনা ও ইসলামের নির্ধারিত মূলনীতির সীমারেখায় থাকতে হবে। ইজতিহাদের নাম ভেঙ্গে মনগড়া কোনো সিদ্ধান্তকে ইসলামের সিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দেয়ার কোনো অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে কুরআনে কারিমে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

"অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই বিষয়টিকে (ফয়সালার জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"
(সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯)

ইজতিহাদ ও কিয়াস করার বৈধতা ইসলামি শরিয়তে যথেষ্ট দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে স্থিরকৃত এবং সর্বজনবিদিত বিষয়। ইজতিহাদ কিংবা কিয়াস ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের স্বেচ্ছাচারী মতকে আল্লাহর আইন বলে চালিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এমনটি করা মহাপাপ। তবে হ্যাঁ, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিরঙ্কুশ অধিকার ও ক্ষমতাকে মেনে নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে যদি প্রয়োজনীয় কোনো আইন-কানুন রচিত হয় তাহলে সে আইনকে সংগত কারণেই ইসলামি শরিয়ত হিসেবে

মেনে নিতে হবে। ইহুদী নাসারাদের মতো আল্লাহর আইন গোপন করে ও অচল মনগড়া আইন-কানুন রচনা করে সেসব আইনকে আল্লাহর আইন বলে চালিয়ে দেয়ার কোনো অধিকার কারো নেই। আল্লাহর রাসূল ছাড়া বিধি-বিধান জারি করার কোনো ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা কাউকে দেননি।

অনেক সময় দেখা যায় ভালো অর্থবোধক অনেক কথাকেও বিকৃত করে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন ধরুন, 'জীবনের জন্যই জীবনবিধান' এ কথার দ্বারা অনেকে বুঝাতে চায় যে, কোনো কিছুকে একটু কষ্টকর মনে হলে সেটা আর পালন করার দরকার নেই। কিন্তু আসল বিষয় হলো–'জীবনের জন্য জীবনবিধান' কথা ঠিক আছে, তবে সেই জীবন বলতে কি শুধু মানবজীবনের ক্ষুদ্র সময়টুকুকেই বুঝায়? অন্তত একজন মুসলমান কখনো এমনটি ভাবতে পারে না। একজন মুসলমান বিশ্বাস করে, এই জীবনই শেষ জীবন নয়। এটা তার জীবনের একটা ক্ষুদ্র অধ্যায় মাত্র। এই জীবনের পরে যে জীবন শুরু হবে সেটাই হলো তার আসল জীবন। সেটাই চিরস্থায়ী জীবন। সুতরাং, একজন মানুষের এমন জীবনবিধানই কাম্য হওয়া উচিত যা তার উভয় জীবনকে সঠিক অর্থে সার্থক ও সফল করে তোলে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, পরকালের সুখের কথা বলে ইহ জীবনে ইসলাম শুধু মানুষকে কষ্টই দিতে চায়; বরং ইসলামি জীবনবিধান সম্পূর্ণরূপেই মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। এই জীবনবিধানের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। কিছুতেই সে মানুষকে কোনো রকম কষ্ট বা জটিলতার মধ্যে ফেলতে চায় না। মানুষের দৈহিক, মানসিক ও বস্তুগত সকল চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই জীবনবিধান রচনা করা হয়েছে। এটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছে যে, এই জীবনবিধান তিনিই রচনা করেছেন যিনি মানবজাতিসহ বিশ্বজগতের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি সবকিছু না জানলে কে জানবে? তিনি অবশ্যই তার সকল সৃষ্টির স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখেন। তাই তো তিনি তার কালামে পাকে বলেছেন–

"যিনি (সবকিছু) বানিয়েছেন তিনিই (এর যাবতীয় বিষয়) জানবেন; (বস্তুত) আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরা মুলক, আয়াত ১৪)

কোনো মানুষের স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের পক্ষে সাফাই গাওয়া আল্লাহর দ্বীনের কাজ নয়; বরং আল্লাহর দ্বীনের মানদণ্ডেই সকলের কাজকর্মকে যাচাই-বাছাই করে নেয়া হবে। দ্বীনের মানদণ্ডে যেটা ভালো বিবেচিত হবে তার যথাযথ পুরস্কার দেয়া হবে। আর যা মন্দ বলে বিবেচিত হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। এ জগতে তাকে মন্দ বলেই ধিক্কার দেয়া হবে এবং তা দমনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। অন্যায় ও পাপের সাথে আপসকামী কোনো ভূমিকা নিতে আল্লাহর দ্বীন কিছুতেই রাজি নয়। এমনকি পুরো সমাজকাঠামো তথা গোটা বিশ্বকাঠামোও যদি দ্বীনের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না

হয় তাহলে গোটা সমাজব্যবস্থা ও গোটা বিশ্বব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এই দ্বীন বদ্ধপরিকর। মানবজীবনকে সঠিক ও শাশ্বত বিধান মোতাবেক গড়ে তোলাই ইসলামি জীবনবিধানের উদ্দেশ্য। এটাই হলো 'জীবনের জন্য জীবনবিধান' কথার সঠিক অর্থ।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো দূর করে দেয়াটাই কি মানুষের কল্যাণ সাধন নয়? এর উত্তরে প্রথমে 'হ্যাঁ' বলতে চাই। তবে আমার প্রশ্ন হলো, কোন মানদণ্ডে কোন বিষয়কে সমস্যা মনে করা হবে এবং কোন নীতিতে তা সমাধান করা হবে? কোনো সমস্যার এমন কোনো সমাধান দিতে ইসলামি ব্যবস্থা আগ্রহী নয়, যে সমাধান একটি সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে আরো দশটি সমস্যার সৃষ্টি করে। কোনটা সমস্যা আর কী তার সমাধান ? এ প্রশ্নের জবাবে কুরআনের এই আয়াতটি তুলে ধরাই যথেষ্ট–'কে বেশি জানে, তোমরা না আল্লাহ তাআলা?'

আল কুরআনের অন্য আয়াতে নিজের প্রশ্নের অত্যন্ত স্বার্থক জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন- 'আল্লাহ তাআলাই (সকল বিষয়ে) সম্যক জ্ঞানের অধিকারী, তোমরা তো কিছুই জানো না।'

তর্ক-বিতর্কের খাতিরে আমরা এতোক্ষণ যাই বললাম না কেন, রাসূল (স) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করাই তার উদ্দেশ্য। কেউ যদি মনে করে, আল্লাহর আইন মেনে চলার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নেই এবং আল্লাহর আইনের অবাধ্যতা করেও মানুষ কল্যাণ পেতে পারে; তাহলে প্রথমত মনে করতে হবে যে, সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট গোমরাহীর অতলে ডুবে আছে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন–

"এরা নিজেদের মনগড়া আন্দাজ-অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) এরা নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, অথচ তাদের কাছে (ইতোমধ্যেই) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হিদায়াত এসে গেছে। (তোমরাই বলো, এদের কাছ থেকে) মানুষ যা পেতে চায় তা কি সে কখনো পেতে পারে? দুনিয়া ও আখেরাত তো আল্লাহ তাআলার জন্যই।" (সূরা নাজম, আয়াত ২৩-২৫)

দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি আল্লাহর শরিয়ত সম্পর্কে উপরোক্ত মনোভাব পোষণ করে সে নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য কুফরী আকিদা গ্রহণ করেছে। কারণ 'আল্লাহর দ্বীন অমান্য করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, এমন বিশ্বাস কারো থাকলে সে দ্বীনের গণ্ডিতে থাকে না; বরং সে দ্বীনের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সার্বজনীন জীবনবিধান

আমরা ইসলামি সমাজের সদস্য, ইসলাম আমাদের ধর্ম। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি ইসলাম অর্থ কী, সে কী চায়, কী তার দাবি, কী তার মূলনীতি?

ইসলাম অর্থ হলো 'আত্মসমর্পণ'। জীবনের ছোট বড় সকল কাজে ও চিন্তাধারায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের নাম হলো 'ইসলাম'। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ হলো ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। মানুষ যখন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর গোলামির শেকলে বেঁধে নেয় তখনই কেবল তার জীবনে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে। আর এই মূলনীতির ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে ছোটখাটো সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আদর্শের প্রতিফলন হলো কালেমার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর সঠিক বাস্তবায়ন।

কালেমার উভয় অংশের যথার্থ বাস্তবায়ন হলে যে সামাজিক রূপরেখা অস্তিত্ব লাভ করে সেটাই ইসলামি সমাজ। এই কালেমাই ইসলামি সমাজের কাঠামো নির্মাণ করে দেয়। এই জীবনবিধান বিশ্বজগতের স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসার কারণে মানুষের ও বিশ্বজগতের প্রতিটি সৃষ্টির স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এক ব্যবস্থাপত্র। মানবরচিত প্রত্যেকটি মতবাদ এই মহান বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে ওসব স্থূল জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামি জীবনব্যবস্থার কোনো তুলনাই হতে পারে না।

এ ব্যাপারে তর্কের কোনো অবকাশ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর ইচ্ছাতেই এই বিশ্বজগৎ অস্তিত্বে এসেছে। তিনি এক পরস্পর সামঞ্জস্যশীল নীতির ভিত্তিতে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিশ্বজগতের প্রতিটি সদস্যের জন্য এমন কিছু আইন-বিধান জারী করেছেন যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। প্রত্যেকেই যদি তার জন্য নির্ধারিত আইন-কানুন যথাযথভাবে পালন করে যায় তাহলে কারো সাথে কারো কোনো সংঘর্ষ বাঁধবে না; বরং পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। আপনি একটু লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে, যতো উল্টাপাল্টা করা , নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা–এগুলো শুধু মানুষই করে। প্রকৃতির অন্য কোনো সৃষ্টির মাঝে এমনটি খুব কমই হয়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ সকল সৃষ্টির মাঝে যেসব নিয়ম জারি রয়েছে তার প্রত্যেকটিই পরস্পর সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল। কারণ, এগুলোর কোনোটাই আল্লাহর নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন–

"আমি যখন কোনো কিছু (ঘটাতে) চাই তখন সে বিষয়ে আমার বলা কেবল এতটুকুই হয় যে, 'হও'- অতঃপর তা (সংঘটিত) হয়ে যায়।" (সূরা আন নাহল, আয়াত ৪০)

"এবং তিনি তাঁর (সৃষ্টির) জন্য (আলাদা আলাদা) পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।"

(সূরা আল ফুরকান, আয়াত ২)

দৃষ্টিশক্তি ও অনুভূতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন যে, এক অদৃশ্য শক্তি এই সৃষ্টিজগতের সবকিছু পরিচালনা করছে। প্রত্যেকটি সৃষ্টি এক অলজ্ঘনীয় নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। এ নিয়ম ভঙ্গ করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। প্রতিটি অণু-পরমাণু সেই অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে। সকল সৃষ্টির মাঝে সমতা রক্ষা করেই সেই মহাশক্তি এই সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করেন। এ কারণে প্রাকৃতিক জগতের মাঝে কখনো কোনো সংঘর্ষ বাঁধে না, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না। 'অনিবার্য কারণবশতঃ' হঠাৎ কেউ তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় না। এসব সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অবাধ্য হওয়ার মতো স্বাধীন কোনো ইচ্ছাশক্তি বা বাস্তবশক্তি কারোরই নেই। প্রত্যেকেই সৃষ্টিগতভাবে স্রষ্টার অনুগত। তিনি যতোদিন চাইবেন ততোদিন এগুলো চলতে থাকবে। আবার তাঁর হুকুমেই এক সময় এসব সৃষ্টির সমন্বয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মহাপ্রলয় ঘটবে। আসমান, যমিন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো-বায়ু সবকিছুই এই নিয়মের অধীনে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন-

"অবশ্যই তোমাদের মালিক আল্লাহ তাআলা যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমিনকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি 'আরশের' ওপর অধিষ্ঠিত হন। তিনিই রাতের আবরণকে দিনের ওপর ছেয়ে দেন যেন তা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। (তিনিই সৃষ্টি করেছেন) সুরুজ, চাঁদ ও তারাসমূহ; (মূলত) এর সব ক'টিকেই আল্লাহ তাআলার বিধানের অধীন করে রাখা হয়েছে। জেনে রেখো, সৃষ্টি (যেহেতু) তাঁর, (সুতরাং এর ওপর) হুকুমও চলবে একমাত্র তাঁর। সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু ও বরকতময়।" (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৫৪)

মানুষের দৈহিক আকৃতি সৃষ্টি

মহান রব্বুল আলামীন বিশ্বজগতের সবকিছুর একক স্রষ্টা। বিশ্বজগতের সবই তাঁর সৃষ্টি। মানুষ সেই সৃষ্টিজগতের একটা অংশ। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সদস্যের জন্য আল্লাহ তাআলা কিছু আইন-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির আল্লাহর আইন অমান্য করার ক্ষমতা বা সুযোগ নেই। প্রতিটি সৃষ্টিই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর আইন মেনে চলতে বাধ্য। মানুষের জন্য আল্লাহর আইন দু'ধরনের। (১) তাকভিনি (২) শরয়ী।

তাকভিনি বা সৃষ্টিগত আইন বলতে বুঝায় সেসব নিয়ম-কানুন যেগুলো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্বভাব-প্রকৃতি অন্যান্য সৃষ্টির মতো বাধ্যগতভাবে মেনে চলে। যেগুলো উপেক্ষা করার কোনো উপায় মানুষের নেই। যেমন ধরুন, মাতৃগর্ভে অবস্থানের মেয়াদ, জন্ম নেয়া, বায়ুমণ্ডল থেকে নির্ধারিত পরিমাণ অক্সিজেন নেয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়া, অনুভব অনুভূতি, দুঃখ-বেদনা বোধ করা, আনন্দ-হাসি-খুশি উপভোগের ক্ষমতা—এসব ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর আইন মেনে চলতে বাধ্য। এসব ক্ষেত্রে মানুষের কোনো হাত নেই। ঠিক তেমনি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্রমের ওপরও মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তাআলা যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে তা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেও এসবের মধ্যে কোনো ওলট-পালট করা যায় না। যেমন ইচ্ছা করলেই চোখ দিয়ে ঘ্রাণ শুকতে, নাক দিয়ে দেখতে, কান দিয়ে কথা বলতে ও জিহ্বা দিয়ে শোনা যায় না। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাকে আল্লাহ তাআলা যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে তা-ই পালন করে থাকে। এটা সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম-কানুনেরই অংশ।

কথাগুলোর উদ্দেশ্য হলো, একটি বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলে ধরা। তাহলো, সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের দৈহিক অংশের জন্য আল্লাহ তাআলা যেমন কিছু বিধি-নিষেধ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি মানুষের জীবন পরিচালনার জন্যও তিনি কিছু আইন-কানুন দিয়েছেন। সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আল্লাহর আইন-কানুন পুংখানুপুংখরূপে মেনে চলে, তেমনি যদি মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনেও আল্লাহর আইন-কানুন মেনে চলতো তাহলে উভয় জগতে অপূর্ব সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতো। এ পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের জন্য আল্লাহর এসব আইন-কানুন বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং এসব আইন-কানুন বিশ্বজনীন সংবিধানেরই একটা অংশ। আল্লাহর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ, আইন, উপদেশ, সুসংবাদ, সতর্কবাণী সবই বিশ্বজনীন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই আল্লাহ তাআলা তার শরয়ী বিধান সাজিয়েছেন। তাই মানুষের দেহ, স্বভাব-প্রকৃতি ও জৈবিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে গোটা জীবনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে কর্মজীবনেও আল্লাহর শরিয়ত মেনে চলা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য।

প্রাকৃতিক জগতে প্রচলিত আইন-কানুন তো দূরের কথা—যে মানুষ তার নিজের দেহের মধ্যে, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে কার্যকর প্রাকৃতিক বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়; সেই মানুষের নিজের কর্মজীবন পরিচালনার জন্য আইন-কানুন রচনার অধিকার দাবি করা মূর্খতা ও ধৃষ্টতার পরিচয়! প্রাকৃতিক ও দৈহিক জগতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কর্মজীবনের জন্য বিধান রচনা করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কাজ কেবল তার পক্ষেই সম্ভব যিনি এ উভয় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যিনি উভয় জগতের মাঝে বিদ্যমান সংযোগসূত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত। বলা বাহুল্য, তিনি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন।

সুতরাং, একথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে যে দ্বীন মানবজাতির জন্য নাযিল করেছেন সেই দ্বীনের যথার্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের সকল দিক ও সৃষ্টিজগতের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব। আর কালেমায়ে তাইয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর একমাত্র দাবি এটা। সত্যিকার অর্থে নিজেকে মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে কালেমার এই দাবি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই কালেমার পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বাস্তবায়ন ছাড়া জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ইসলামের আলো উদ্ভাসিত করে তোলা সম্ভব নয়।

মানুষের আত্মিক, দৈহিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের সাথে কর্মজীবনে অনুসৃত নিয়ম-কানুনের ঐক্য থাকা অপরিহার্য। জীবনের এই দু'টি অংশের মাঝে সমন্বয় থাকলে সত্যিই গোটা জীবন প্রশান্তিতে ভরে যায়। তখন জীবনের দু'টি অংশ এক হয়ে যায়। কর্মজীবনের কাজগুলোই তখন আত্মার তৃপ্তি যোগায়। কেননা, এই জীবনেও সে একই প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। পক্ষান্তরে যদি বিষয়টা উল্টো হয় তাহলে অশান্তি অনিবার্য। কীভাবে এই অশান্তি সৃষ্টি হয়? আসুন একটু গভীরভাবে তা বুঝে নেয়ার চেষ্টা করি।

আপনার দেহ, মন, স্বভাব-প্রকৃতি সে তো আল্লাহর আইন মেনেই চলে এবং সে চায় আপনি আপনার কাজগুলোও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী করুন। কিন্তু যখনই আপনি আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করে অন্যায়-অপরাধ করেন তখন আপনার আত্মা কষ্ট পায়। অবশ্য একথা সেসব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পাপ করতে করতে যাদের স্বভাব-প্রকৃতি এখনো বিকৃত হয়ে যায়নি; ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধ যাদের এখনো বিদ্যমান। কিন্তু যাদের স্বভাব-প্রকৃতি বিকৃত হয়ে জন্তু জানোয়ারের পর্যায়ে নেমে গেছে তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে যখন সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন মানুষের জীবনের সকল দিকগুলোই এক ইতিবাচক সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিশ্বজগতের সার্বিক নিয়ম-নীতির সাথে সংযোগ ঘটার ফলে পারস্পরিক বৈপরীত্য দূর হয়ে মানুষ ও প্রকৃতিতে মিলে এক সুষ্ঠু, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে। এই সমাজ মানুষকে উপহার দেয় সর্বোচ্চমানের ইনসাফ ও কল্যাণ।

প্রকৃতির সাথে এই সখ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণে মানুষের কাছে তার অনেক গুপ্ত রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তার মধ্যে লুকিয়ে রাখা শক্তি ও সম্পদ মানুষের হাতে তুলে দেয়। আর মানুষ এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করে তার ওপর অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বজায় থাকলে কোনো অবস্থাতেই মানুষের কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে পারে না এবং এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার কাজে ব্যবহার করতে পারে না। যদি এই মহাসত্যকে মানুষ নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুগামী বানিয়ে নিতে পারতো তাহলে আসমান-যমিনে মহা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যেতো। এজন্য

সত্য কখনো ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হয় না। বিচ্যুত হয় শুধু মানুষ। মানুষ বিচ্যুত হয়ে নিজের জীবন, সমাজ ও বিশ্বকে ফেৎনা-ফ্যাসাদে, অশান্তিতে ভরে দেয়। কিন্তু সত্য সত্যের স্থানে অনড় থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"যদি (এমন হতো যে,) 'সত্য' তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খার অনুগামী হয়ে যেতো, তাহলে আসমানসমূহ ও যমিন এবং আরো যা কিছু এ উভয়ের মাঝে আছে তার (গোটা ব্যবস্থাপনা) কবেই ভেঙ্গে বিশৃঙখল হয়ে পড়তো।" (সূরা আল মুমিনুন, আয়াত ৭১)

এযাবৎ আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিশাল সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু যে নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তা-ই হলো মহাসত্য। মহাসত্য এক ও অবিভাজ্য। আল্লাহর দ্বীন এই মহাসত্যের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। আসমান, যমিন, সৃষ্টিজগতের সবকিছুর স্থাপনা ও পরিচালনা মহাসত্যের ভিত্তিতেই হয়। কিয়ামতের ময়দানে সবকিছুর মীমাংসা সেই মহাসত্যের ভিত্তিতেই হবে। পুরস্কার কিংবা শাস্তিও সেই মহাসত্যের ভিত্তিতেই হবে। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সদস্য চাই সে প্রাণী হোক বা প্রাণহীন নির্জীব কোনো পদার্থ হোক, সবকিছু এই মহাসত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় কারো নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

"(হে মানুষ,) আমি তোমাদের কাছে (এমন একটি) কিতাব নাযিল করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে, তোমরা কি কিছুই বুঝতে পারো না? আমি এর আগে কতো জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিল যালিম, তাদের পরে তাদের জায়গায় আমি অন্য জাতিরও উত্থান ঘটিয়েছি। এরা যখন আমার আযাবকে দেখতে পেলো তখন তারা সেখান থেকে পালাতে শুরু করলো। (আমি বললাম) তোমরা পালায়ন করো না; বরং ফিরে যাও তোমাদের সম্পদের কাছে ও তোমাদের বাড়ি ঘরের দিকে, সম্ভবত তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারা বললো, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা (সত্যিই) যালিম ছিলাম। তারা এই আহাজারি করতেই থাকলো-যতোক্ষণ না আমি তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা কাটা ফসল (খড়কুটো) ও নির্বাপিত আলোকরশ্মির মতো (হয়ে পড়লো)। আসমান ও যমিন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছু (এর কোনোটাকেই) আমি খেলতামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি। আমি যদি নেহায়েত কোনো খেলতামাশার বিষয়ই বানাতে চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা (নিষ্প্রাণ বস্তু) আছে তা দিয়েই (এসব কিছু) বানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুঁড়ে মারি, অতঃপর সে সত্য এই মিথ্যা-কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। এর ফলে যা মিথ্যা তা সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের; কেননা তোমরা যা কিছু উদ্ভাবন করছো (তা থেকে আল্লাহ তাআলা অনেক পবিত্র)। আসমানসমূহ ও যমিনে যা কিছু আছে সবই তো তাঁর (মালিকানাধীন); তাঁর (একান্ত) সান্নিধ্যে যে সব

(ফেরেশতারা) আছে তারা কখনো তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করেন না এবং তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা কখনো কোনো অলসতা করে না।" (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০-২০)

মহাসত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া

মানুষের দেহ-মন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গঠন প্রকৃতি, মানুষের পরিপার্শ্বিক জগৎ সব কিছুই মহাসত্যের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহাসত্যের অনুভূতি মানুষের হৃদয়ের একান্ত গভীরে বিদ্যমান। এ মহাসত্যই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মূল উপাদান। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু মহাসত্যের শাশ্বত বিধান দ্বারা পরিচালিত। এ বিধান সম্পূর্ণরূপে পরস্পর সামঞ্জস্যশীল ও অপরিবর্তনীয়। এ কারণে সৃষ্টিজগতের কোথাও কোনো অসংগতি নেই, কোনো সংঘর্ষ নেই, কোনো বিশৃঙখলা নেই, নেই কোনো দুর্ঘটনা। চাঁদ এসে কখনো সূর্যের জায়গা দখল করে না, সূর্য কখনো চাঁদের সম্পত্তি জবর দখল করে না, রাত কখনো দিনকে কিংবা দিন কখনো রাতকে ধরতে পারে না। গ্রহ-নক্ষত্র কেউ নিজের কক্ষপথ ছেড়ে অন্যের কক্ষপথে ঢুকে পড়ে না; বরং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সদস্যকে তার নিয়ম-কানুন মেনে সুনির্দিষ্ট পথে চলতে দেখা যায়। কেউ কখনোই এর ব্যতিক্রম করে না, বা করার কোনো ক্ষমতাই কারো নেই। তাদের কাউকেই এই স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। শুধু মানুষকেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ব্যবহারিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তার সামনে হেদায়াত ও গোমরাহীর দু'টি পথই খোলা রেখেছেন এবং এ দুই পথের গন্তব্যস্থল কোথায় গিয়ে মিলিত হয়েছে তাও জানিয়ে দিয়েছেন। এ মানুষ যখন তার স্বভাবপ্রকৃতি ও আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেয়া মহাসত্য থেকে বিচ্যুত হয়, প্রকৃতির স্রোতের বিপরীতে চলতে শুরু করে এবং আল্লাহর শরিয়ত তথা আল্লাহর দ্বীনকে উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি নিজেরা তৈরি করতে শুরু করে তখনই তাদের জীবনে বিপর্যয় বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো ঢুকে পড়ে। এই বিপর্যয় রোধ করার জন্য তারা যতোই চেষ্টা করুক পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসা ছাড়া কোনোক্রমেই তা রোধ করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিধান তথা আল্লাহর শরিয়ত থেকে বিচ্যুতির ফলে সমাজে অনাচার, অবিচার, যেনা-ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, রাহাজানি– হেন কোনো অপরাধ নেই যার বিস্তার ঘটে না।

এতোক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম মহাসত্যের সাথে মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্ক নিয়ে। এবার আসুন আমরা পর্যালোচনা করে দেখি এ মহাসত্য থেকে বিচ্যুতি ঘটলে মানব সমাজে কোন ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে।

মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অনুসৃত মূলনীতি ও বিধিবিধানের সাথে যখন তার দৈহিকজগৎ ও বিশ্ব প্রকৃতির সংঘর্ষ দেখা দেয় তখন এর কুফল আর তার ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা ক্রমান্বয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বের

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর অনিবার্য কুফলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো দলাদলি ও রেষারেষি। মানুষ যখন নিজেরাই নিজেদের পরিচালনার দায়িত্ব হাতে তুলে নেয় তখন দলে দলে, গোত্রে গোত্রে, জাতি জাতিতে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর তখন মানুষ প্রকৃতি থেকে আহরিত সম্পদ ও শক্তিকে মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার না করে তা বিপক্ষের মানুষকে ও তাদের দেশকে ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করে। এতে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অনেকে মনে করেন ইসলাম শুধু মানুষকে মরণোত্তর সুখ-শান্তির কথাই শোনায়। সেই সুখের লোভ দেখিয়ে মানবজীবনকে শুধু কষ্ট দেয়াই ইসলামের কাজ। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর যে বিধান পালন করতে বলে এর সুফল শুধু আখেরাতে নয়; বরং এই দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। দুনিয়া ও আখিরাতকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিছু মনে করার কোনোই উপায় নেই; বরং দুনিয়া ও আখেরাত মানবজীবনের দু'টো মনযিল। একটি মনযিল পথের মাঝে, আর একটি মনযিল পথের শেষে। দুনিয়া ও আখেরাত সাংঘর্ষিক কিছুই নয়; বরং পরিপূরক। আল্লাহর আইন অনুযায়ী জীবন যাপন করলে আখেরাতের শান্তি তো রয়েছেই, দুনিয়াতেও এর সুফল অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী জীবন যাপন করলে দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি দান করবেন; তবে তাদের চূড়ান্ত পুরস্কার আখেরাতেই দিবেন। কেননা, মানবজীবনের এ ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে সীমিত শক্তি-ক্ষমতা নিয়ে আল্লাহর নেয়ামতের চূড়ান্ত উপভোগ সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে চূড়ান্ত প্রতিদান দেয়ার জন্য মানুষের পরকালীন মৃত্যুহীন জীবনকে বেছে নিয়েছেন। যে জীবনে উপভোগ করার শক্তি ক্ষমতাও থাকবে ব্যাপক ও চূড়ান্ত পর্যায়ের।

সৃষ্টিজগৎ ও আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষ সম্পর্কে এই হলো ইসলামি দর্শন। এই দর্শন মানবরচিত সকল মতবাদের চেয়ে উঁচুমানের ও ভিন্ন প্রকৃতির। এ দর্শন মানুষকে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে সম্মানিত আসন 'আশরাফুল মাখলুকাতে'র আসনে স্থান দেয়। মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করার সাথে সাথে ইসলাম বিশ্বজগতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও প্রদান করে । সে দায়িত্বগুলো হলো–

১. নিজ জীবনে সে সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবায়ন ঘটাবে

২. সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ সংগ্রামে নিয়োজিত থাকবে

৩. কখনো আল্লাহর বান্দাদের ওপর প্রভু সেজে বসার চেষ্টা করবে না।

এককথায় সে ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। আমরা যালিম শাসক নমরুদ ও মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ) এর মাঝে হওয়া কথোপকথন থেকে একই তথ্য জানতে পারি। নমরুদ প্রভুত্ব দাবি করতো

ঠিকই; তবে বিশ্বপ্রকৃতি, মহাশূন্য, গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর প্রভুত্ব দাবি করতো না। শুধু তার শাসনাধীন অঞ্চলে তার নিজের ইচ্ছামতো শাসন পরিচালনা করাই ছিল তার প্রভুত্ব দাবির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ইবরাহীম (আ) তাকে দ্ব্যর্থহীনভাষায় জানিয়ে দেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির ওপর যার সার্বভৌমত্ব বিরাজমান; মানুষের ব্যবহারিক জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্র সেই একই সত্তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কথপোকথন তুলে ধরতে গিয়ে বলেন–

"তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখোনি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা (দুনিয়ার) রাষ্ট্রক্ষমতা দেয়ার পর সে তার মালিকের ব্যাপারেই বিতর্কে লিপ্ত হলো। (বিতর্কের একপর্যায়ে) ইবরাহীম বললো, তিনি আমার মালিক যিনি (সৃষ্টিকুলের) জীবন-মৃত্যু নির্ধারণ করেন। সে বললো, জীবন-মৃত্যু তো আমিও দিতে পারি। ইবরাহীম (আ) বললো, (আমার) আল্লাহ তাআলা পূর্ব দিক থেকে (প্রতিদিন) সূর্যের উদয় ঘটান। (একবার) তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করে দেখাও তো। (এতে সত্য) অস্বীকারকারী ব্যক্তিটি হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। (আসলে) আল্লাহ তাআলা যালিম জাতিকে কখনো পথের দিশা দেন না।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৫৮)

"তারা কি আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার বদলে অন্য কোনো বিধানের সন্ধান করছে? অথচ এ আসমান ও যমিনের সব কিছুই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ তাআলার (বিধানের) কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রত্যেককে তো তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৩)

সপ্তম অধ্যায়

সভ্যতা মানেই ইসলাম

ইসলামি সমাজ বনাম জাহেলি সমাজ

বর্তমান বিশ্বে আমরা যদিও বিভিন্ন মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হরেক রকম সমাজব্যবস্থা দেখতে পাই, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সকল সমাজব্যবস্থা মাত্র দু'ভাগে বিভক্ত। (১) ইসলামি সমাজ, (২) জাহেলি সমাজ।

ইসলামি সমাজ বলতে শুধু সেই সমাজকেই বুঝানো হয়, যে সমাজের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতার মূলভিত্তি হবে ইসলাম। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক থেকে নিয়ে সামাজিক ,অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কোর্ট-কাচারি, রাষ্ট্রীয় তথা সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আইনই স্বীকৃত হবে সেই সমাজে। এ সমাজই একমাত্র ইসলামি সমাজ।

পক্ষান্তরে, যে সমাজের সর্বত্র আল্লাহর আইনকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি সে সমাজই জাহেলি সমাজ। ভুল বুঝাবুঝি কিংবা বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, কিছু মানুষ নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করলে এবং নামায রোযার মতো নিছক কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেই তাদের সমাজকে ইসলামি সমাজ বলে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। যে সমাজে 'আল্লাহতে বিশ্বাস'-কে নিছক অন্তরে এবং সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমিত করে ফেলা হয়, অথচ রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিজেদের মনমতো আইন-কানুন রচনা করে সে সমাজ কিছুতেই ইসলামি সমাজ নয়।

একটি মূলনীতি মনে রাখলে আমরা সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারবো। তা হলো, 'ইসলামি সমাজ নয় এমন সকল সমাজই জাহেলি সমাজ।' এ সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের নাম থাকতে পারে এবং তার রূপরেখা ও মূলনীতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান, আইন-কানুন ও আকিদা-বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই জাহেলিয়াতের মূলনীতি। এ সমাজের রূপ অনেক রকম হতে পারে। এক ধরনের সমাজে আল্লাহকে সরাসরি অস্বীকার করা হয় এবং সেখানে মানব ইতিহাসকে নিছক বস্তুবাদী ইতিহাস বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর এক ধরনের সমাজ রয়েছে যেখানে মানুষেরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তবে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে নিছক প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে সীমিত রাখে এবং নিজেদের জীবনের আইন-কানুন, কোর্ট-কাচারি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি–তথা জীবনের সকল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে উচ্ছেদ করে দেয়। সমাজ ও

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তারা কিছু লোককে বিভিন্নভাবে নির্বাচিত করে তাদের হাতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বা দণ্ডবিধি রচনার দায়িত্বভার তুলে দেয়। এরা মুখে হয়তো বলে যে আসমান-যমিন, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। ঝড়-বৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচালনা, রিযিক দান, এসব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বললেও ব্যবহারিক জীবনে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানে না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

"তিনিই হচ্ছেন একমাত্র সত্তা। আসমানেও তিনি মাবুদ, যমিনেও তিনি মাবুদ এবং তিনি বিজ্ঞ কুশলী, তিনিই সর্বজ্ঞ।" (সূরা যুখরুফ, আয়াত ৮৪)

আল্লাহ তাআলা যে সমাজব্যবস্থাকে 'দ্বীনে কাইয়িম' বা সঠিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তা বর্তমান পৃথিবীর একটি রাষ্ট্রেও প্রতিষ্ঠিত নেই।

আইন ও বিধান জারী করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। আর (এ বিধানের বলেই) তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো গোলামি করবে না; কারণ এটাই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০)

কোনো সমাজের মানুষ মুখে সারাক্ষণ আল্লাহর যিকির করলেও, হাতে সারাক্ষণ তাসবীহ নিয়ে হাঁটলেও, নামায পড়তে পড়তে কপালে দাগ পড়ে গেলেও, রোযা রাখতে রাখতে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেও সে সমাজকে ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি সমাজ বা মুসলিম সমাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না যতোক্ষণ না সে সমাজের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আইনকেই সর্বোচ্চ আইন হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়া হবে এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সবকিছুর ওপরে স্থান না দেয়া হবে। এ ধরনের সমাজ ইসলামের দৃষ্টিতে নির্ভেজাল জাহেলি সমাজ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

ইসলামি সমাজই একমাত্র সভ্য সমাজ

ইসলাম বিবর্জিত সকল সমাজই জাহেলি সমাজ। তাই তা যে ধরনের মূলনীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, বাস্তবতার মানদণ্ডে সকল জাহেলি সমাজই পশ্চাতমুখী ও অসভ্য সমাজ। আলোচিত অধ্যায়ে আমরা কুরআনের আলোকে ইসলামি সমাজের যে রূপরেখা তুলে ধরেছি তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে, ইসলামি সমাজই একমাত্র সভ্য সমাজ। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা বলছি। বেশ ক'বছর আগে আমার লেখা একটি বইয়ের নাম দিয়েছিলাম 'সুসভ্য ইসলামি সমাজ'। কিন্তু পরে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বইটির নাম থেকে 'সুসভ্য' শব্দটি বাদ দিয়েছি। আমার এ পরিবর্তন দেখে একজন আলজেরীয় লেখক বেশ একটা মোক্ষম সুযোগ পেলেন। তিনি বিভিন্নভাবে আমাকে এক হাত নিয়ে নিলেন। তিনি বললেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জানাশোনা না থাকার কারণেই নাকি আমি এমন আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমি কী বলবো? আমি নিজেও তো এক সময় তার মতোই চিন্তা

করতাম এবং মনে করতাম যথেষ্ট বুঝে ফেলেছি। আমার জীবনের ওই সময়গুলোতে আমি যেসব জটিলতার মুখোমুখি হয়েছি, আজ এ আলজেরীয় লেখক নিশ্চয়ই সেরকম সমস্যায় আক্রান্ত। তাই বেচারাকে কিছু না বলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখাই সঠিক মনে করি। যহোক, প্রথমে যখন আমি বইয়ের নাম 'সুসভ্য ইসলামি সমাজ' দিই তখন আমি বুঝতেই পারিনি যে, 'সুসভ্য' শব্দটি এখানে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কেননা 'ইসলামি সমাজ' অর্থই সুসভ্য সমাজ। সভ্যতা ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্য। ইসলাম মানেই সভ্যতা। আমার মনে হলো 'সুসভ্য' শব্দটি থাকলেই বরং বিভ্রান্তি হতে পারে। তাই বইটির নাম দেই 'ইসলামি সমাজ'।

এবার আমরা আলোচনা করে দেখবো 'সভ্যতা' বলতে কী বুঝায়? সভ্যতার স্বরূপ কী? বা কাকে সভ্যতা বলে?

সভ্য সমাজের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দাবি হলো 'পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা'। সভ্য হতে হলে অবশ্যই প্রথমে প্রতিটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। ঘৃণ্য গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ থেকে মানুষ কখনো সত্যিকার অর্থে সভ্য হতে পারে না। আর কোনো সমাজের মানুষ কেবল তখনই স্বাধীন হতে পারে যখন সমাজের সকল স্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে সমাজের, যে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর আইনকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয় সেই সমাজের মানুষই কেবল নিজেদেরকে স্বাধীন দাবি করতে পারে।

এর বিপরীত ব্যবস্থাটি হলো মানুষ হয়ে তারই মতো আরেকজন কিংবা একদল মানুষের গোলামি স্বীকার করে নেয়া। এটাই হলো সবচেয়ে বড় পরাধীনতা, সবচেয়ে ঘৃণ্য গোলামি। এ সমাজে সাধারণ মানুষেরা কিছু মানুষকে ভোটের মাধ্যমে বা ভিন্ন কোনো পদ্ধতিতে নির্বাচিত করে তাদেরকে 'আইন রচনাকারীর' আসনে বসিয়ে দেয় এবং এ নির্বাচিত শাসক, সংসদ সদস্য বা আইন পরিষদের লোকেরা সাধারণ মানুষদের জন্য ইচ্ছামতো আইন-কানুন রচনা করে। এর মাধ্যমে সমাজের সাধারণ মানুষেরা তাদের গোলামে পরিণত হয়। এ নির্বাচিত লোকেরা সাধারণ মানুষের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে যায়। এরা যে ধরনের আইন-কানুন, মূল্যবোধ নির্ধারণ করে, সাধারণ মানুষ গোলামের মতো সেগুলোকে মেনে চলে । এর কারণে এ সমাজের মানুষেরা তাদের সৃষ্টিগত স্বাধীনতা থেকে তথা মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য সর্বপ্রধান মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

শরিয়ত সম্পর্কে অপরিপক্ক ধারণার কারণে অনেকেই আইন প্রণয়নের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে না। আসলে আইন প্রণয়নের বিষয়টি মানুষের গোটা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রভাব অনস্বীকার্য। এর দ্বারা মানুষের জীবনধারা, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, চাল-চলন, সাহিত্য-সংস্কৃতি সবকিছুই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং, যে সমাজে কিছু সংখ্যক মানুষ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে সে সমাজের মানুষদেরকে কিছুতেই

স্বাধীন বলা যায় না। এ সমাজে কিছু মানুষ প্রভুর আসনে বসে আছে, আর কিছু মানুষ তাদেরই গোলামি করছে। এ ধরনের সমাজকে ইসলাম অন্ধকার যুগের সমাজ বা পশ্চাতমুখী সমাজ হিসেবেই বিবেচিত করে। এর সরল নাম হলো 'জাহেলি সমাজ'। ইসলামি সমাজই মানুষকে এ ধরনের ঘৃণ্য গোলামি থেকে মুক্তি দেয় অর্থাৎ মানুষের দাসত্ব বরণ করার মতো অপমানজনক জীবন থেকে মুক্তি দেয়। ইসলাম মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতার আলোকিত পথ দেখায়। মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য মর্যাদা তাকে ফিরিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে মানুষ ফেরেশতাদের চেয়েও সম্মানিত স্তর তথা আল্লাহর খলিফার আসনে আসীন হয়।

যে সমাজে মানুষ কোনো মানুষের গোলামি করে না, যে সমাজ মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত আইনকে আইন বলে স্বীকার করে না এবং যে সমাজ তার সকল দিক ও বিভাগে শর্তহীনভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে একমাত্র সেই সমাজই হলো ইসলামি সমাজ। এ সমাজে প্রত্যেকটি মানুষই মানুষ হিসেবে একই স্তরে অবস্থান করে। কেউ কারো প্রভুও নয়, কেউ কারো হুকুমের গোলামও নয়। মানবপ্রকৃতির মাঝে সুপ্ত গুণাবলি ও যোগ্যতাকে বিকশিত করা কেবল এই সমাজেই সম্ভব। গোত্র, বর্ণ, অঞ্চল কিংবা তুচ্ছ কোনো জাতীয়তার কারণে যে সমাজে মানুষের মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না সেই সমাজই একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ। মানুষের মানবীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য এ ধরনের সমাজের কোনো বিকল্প নেই।

অপরদিকে যে সমাজে মানুষের মানবীয় গুণবৈশিষ্ট্যকে অপমানিত করে নিছক কোনো গোত্র, বর্ণ, আঞ্চলিকতা কিংবা কোনো জাতীয়তাবাদী নীতির ভিত্তিতে মানুষের মূল্যায়ন কিংবা অবমূল্যায়ন করা হয়, এসব তুচ্ছ বিষয়ের ভিত্তিতে যদি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হয় তাহলে সেই সমাজে কিছুতেই মানুষের মানবীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। কেননা, এমন কোনো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যদি মানুষকে মূল্যায়ন কিংবা অবমূল্যায়ন করা হয় যে বিষয়ের ওপর ওই মানুষটির কোনো হাত নেই, তাহলে তা সন্দেহাতীতভাবে অবিচার বলেই বিবেচিত হবে। যেমন কোন্ এলাকার, কোন্ গোত্রে, কোন্ রক্তে, কোন্ বর্ণে মানুষ জন্মগ্রহণ করবে এর ওপর কোনো মানুষেরই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং, নিছক এ ধরনের কোনো কারণে যদি কোনো মানুষকে মূল্যায়ন কিংবা অবমূল্যায়ন করা হয় তাহলে সেই মানুষটিকে হয়তো তার প্রাপ্যের বেশি দিয়ে 'যুলুম' করা হবে অথবা তার প্রাপ্যের চেয়ে কম দিয়ে তার প্রতি 'যুলুম' করা হবে।

মানুষের মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন হতে পারে একমাত্র আল্লাহভীরুতা, নীতি-নৈতিকতা, জীবনধারা এবং মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে। কেননা, এসব বিষয়ে উন্নতি অবনতি মানুষের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে বা মানুষেরই কৃতকর্মে। আল্লাহ তাআলা এসব ক্ষেত্রেই কেবল মানুষকে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন। অতএব আমরা সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যে সমাজে একজন মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের নীতি, আদর্শ ও

মত গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে সেই সমাজই কেবল সভ্য সমাজ। সেই সমাজই কেবল স্বাধীন সমাজ। সেই সমাজই সত্যিকার অর্থে প্রগতিশীল সমাজ। আর যে সমাজে মানুষের এই স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়, যে সমাজের মানুষেরা সত্যপথ গ্রহণের ও মিথ্যাপথ বর্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ পায় না সেই সমাজই অপ্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাতমুখী সমাজ।

এ কথা প্রমাণিত যে, একমাত্র ইসলামই মানুষকে সব ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠিয়ে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে এবং নীতি-আদর্শ, চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। গোত্র, বর্ণ, সাদা-কালো, আরব-অনারব, গ্রীক, পারসীয়ান—তথা সকল ধরনের জাতীয়তাবাদী গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠিয়ে সকল মানুষকে এক উম্মতে পরিণত করে। এই সমাজে কেউ কারো গোলামও নয়, কেউ কারো মনিবও নয়। সকলেই আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ তাআলাই সকলের মনিব। মানুষ হিসেবে সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। যার আল্লাহভীরুতা ও নীতি-নৈতিকতা যতো উঁচু স্তরের সে ততো বেশি সম্মান লাভ করবে। আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, যে সমাজ এই মানবিক গুণাবলি বা মানবতাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেয় সে সমাজই একমাত্র সভ্য সমাজ, সেই সমাজই কেবল আদর্শ সমাজ। এটাই ইসলামি সমাজের রূপরেখা। এটাই ইসলামি সমাজের আদর্শ।

পক্ষান্তরে, ইসলাম বিবর্জিত সমাজব্যবস্থাগুলোর প্রত্যেকটিই হলো বস্তুবাদী সমাজ। অবশ্য সকল বস্তুবাদিতার রূপ একরকম নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের বস্তুবাদিতা আত্মপ্রকাশ করে। এর মূলনীতি এক হলেও এর স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন, মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এটা হলো বস্তুবাদিতার চরম স্তর। এখানে বস্তুকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। জৈবিকতাই এখানে প্রাধান্য পায়। কিন্তু মানবীয় গুণবৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতার এখানে কোনো মূল্য নেই। অন্যদিকে রয়েছে ইউরোপ আমেরিকার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। এখানে বস্তুগত সমৃদ্ধিই মানুষের মূল্যায়নের মানদণ্ড। কার কতো অর্থ আছে—এর ওপর ভিত্তি করেই এখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা, মান-ইজ্জত নিরূপিত হয়। সমাজ নামক এসব বস্তুবাদী কসাইখানাগুলোতে মানবতা ও মনুষ্যত্বকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো সবই জাহেলি সমাজ। প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাতমুখী সমাজ।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কি ইসলামের দৃষ্টিতে বস্তুর কোনো মূল্য নেই? মানবজীবনে বস্তুর কি কোনো প্রভাব নেই?

অবশ্যই আছে। ইসলাম কখনো বস্তুকে মূল্যহীন বিবেচনা করে না। তবে তার যতোটুকু মূল্যায়ন করা উচিত ততোটুকুই করতে চায়। কোনো বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দিতে সে রাজি নয়। বস্তুসামগ্রীর প্রয়োজনীয়তাকে যেমন সে উপেক্ষা করে না এবং না বোঝার ভান করে না, তেমনি বস্তুবাদিতাকেই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতেও সে প্রস্তুত নয়। ইসলাম অকপটে এই সত্যটিকে স্বীকার করে যে, আমরা যে জগতে

বসবাস করি তা বস্তুর সমন্বয়েই গঠিত। এসব বস্তু দ্বারা আমরা যেমন অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হই, তেমনি বস্তুও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শুধু তাই নয়, ইসলাম এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন সেই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেও বস্তুগত উন্নতি অগ্রগতির প্রয়োজন রয়েছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুর মূল্যায়নের ব্যাপারে জাহেলি দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য হলো; ইসলাম মানুষের প্রয়োজন পূরণে বস্তুর গুরুত্ব অকপটে স্বীকার করে, কিন্তু বস্তুগত ভোগবিলাসের স্বার্থে বস্তুপূজারীতে পরিণত হওয়াকে কিছুতেই মেনে নেয় না। মানুষের আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বস্তুর কাছে বলি হতে দিতে চায় না। অথচ এটা আজ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট যে, অতীতের কিংবা বর্তমান ইসলামবর্জিত সমাজগুলো বস্তুগত উন্নতির স্বার্থে নীতি-নৈতিকতা, মানবীয় মূল্যবোধ সবকিছুকেই বিসর্জন দিতে শুধু প্রস্তুতই নয়; বরং অবশ্য কর্তব্য মনে করে।

মানবীয় মূল্যবোধগুলোই হলো শাশ্বত মূল্যবোধ। অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নতি অগ্রগতির প্রয়োজনে কখনোই মানবীয় মূল্যবোধের মানদণ্ড পরিবর্তন হয় না। বস্তুপূজারীরাই কেবল এ ধরনের উদ্ভট দাবি করতে পারে। মানবীয় মূল্যবোধ প্রকাশের পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি চিরকালই এক ও অভিন্ন। এই মানবীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতেই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয়।

সভ্যতা কাকে বলে

যুগ যুগ ধরে বস্তুপূজারীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ তার নিজের অবস্থানে টিকে আছে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের কাছে নীতি-নৈতিকতার গুরুত্ব মোটেই হ্রাস পায়নি। এই বিষয়টিকে যদি আমরা বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করি তাহলে আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পাবো যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব বিদ্যমান। ইসলাম বলে, নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ শাশ্বত, এর কোনো পরিবর্তন নেই। যুগ, সময়, পরিবেশ, অবস্থা কোনো কিছুর পরিবর্তনেই নৈতিকতার মানদণ্ড পরিবর্তন হয় না। তাই নৈতিকতাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার কোনো অবকাশ নেই। কৃষিভিত্তিক, পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী, বুর্জোয়া, প্রলেটারিয়েট এসব নাম বা শ্রেণীর আশ্রয় নিয়ে নৈতিকতার মানদণ্ড পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। নৈতিকতা এসব বস্তুগত পরিবর্তনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা, এসব পরিবর্তন হলো সাময়িক আর নৈতিকতা হলো শাশ্বত ও চিরস্থায়ী। এসব উদ্ভট কথা বলে আসলে মানবতার কোনো কল্যাণ নেই; বরং ইসলামের আলোকে দেখতে পাই যে, নৈতিকতা ও চরিত্র মাত্র দু'ভাবে বিভক্ত।

১. মানুষসুলভ চরিত্র,
২. পশুসুলভ চরিত্র।

প্রথমটি হলো মূল্যবোধ ও মানদণ্ড। ইসলাম মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে উন্নীত করে সত্যিকার মানুষের স্তরে পৌঁছে দেয়। এটা লিখে প্রমাণ করতে হয় না; ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, যেখানেই সঠিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই মানুষের মধ্যে সে জাগিয়ে তুলেছে সত্যিকার মনুষ্যত্ব ও মানবীয় মূল্যবোধ। ধনী গরীব, শাসক শাসিত, গ্রাম্য শহুরে, কৃষক শ্রমিক, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের বিকাশ ঘটানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ইসলাম অব্যাহত রেখেছে। মানুষের মাঝে যাতে পশুর স্বভাবের কুপ্রভাব না পড়ে সে ব্যাপারে ইসলামি জীবনবিধান সদা সতর্ক। কেননা, মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব–মানবীয় মূল্যবোধ ও পশুসুলভ প্রকৃতির মাঝে এটাই তো সীমারেখা। এই সীমারেখা মুছে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না; বরং পশুর স্তরে নেমে যায়। এই সীমারেখা মুছে গেলে মনুষ্যত্বের পতন অনিবার্য। এই সীমারেখা মুছে গেলে মানুষের এমন চরম অধপঃতন হয় যে, তখন বস্তুগত দিক থেকে তারা উন্নতি অগ্রগতির চূড়ান্ত স্তরে অবস্থান করলেও দুঃখ-দুর্দশা গোটা সমাজকে গ্রাস করে নেয়। বস্তুগত উন্নতি অগ্রগতি সবই তখন ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং, বস্তুগত দিক থেকে কোনো সমাজ যে স্তরেই অবস্থান করুক না কেন যে সমাজে মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ নেই, মানবীয় মূল্যবোধের মূল্যায়ন নেই, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের গুরুত্ব নেই, সেই সমাজ সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাতমুখী ও জাহেলি সমাজ। এ ধরনের সমাজকে কিছুতেই সভ্য সমাজ বলা যেতে পারে না।

সভ্যতার বিকাশে পরিবার ব্যবস্থার অবদান

এবার আমরা আলোচনা করবো সভ্য সমাজব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বা সভ্যতা বিকাশের মূল সূতিকাগার সম্পর্কে। আর এই সামাজিক সংস্থাটির নামই হলো 'পরিবার'। সভ্যতা, সামাজিকতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে এই সংস্থাটির ভূমিকা অপরিসীম। এই সংস্থাটির ওপরই নির্ভর করে সমাজের আগামী দিনের সদস্যদের গুণগত মান। সুতরাং, পরিবারকে সমাজব্যবস্থার প্রধান শিক্ষালয় নিরূপণ করা, স্বামী-স্ত্রীর ওপর তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও প্রকৃতি অনুসারে দায়িত্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক অর্থে মানুষ করে গড়ে তোলাকে পরিবারের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা কোনো সমাজকে সভ্য দাবি করার পূর্বশর্ত। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, একমাত্র ইসলামি জীবনব্যবস্থাই এই সব শর্ত পূরণ করার সাথে সাথে পরিবার নামক সংস্থাটিকে সুসংহত করার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পক্ষান্তরে, যে সমাজে অবাধ যৌনতাকে বৈধতা দেয়া হয়, অবৈধ সন্তানে যে সমাজ ভরে যায়, নিছক পশুসুলভ যৌন-ক্ষুধা মেটানোকে যে সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের উদ্দেশ্য মনে করা হয়, সে সমাজ কিছুতেই মানুষের সমাজ হতে পারে না; বরং তা পশুর সমাজ। নারী ও পুরুষের জন্মগত শারীরিক মানসিক তারতম্যকে বিবেচনা না করে যেখানে দায়িত্ব বন্টন করা হয়, পুরুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করা ও যৌন আবেদন

তুলে ধরার জন্য নিজেকে লাস্যময়ী করে উপস্থাপন করাকে যেখানে নারীজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় সে সমাজ নিশ্চিত মূর্খ জাহেলি সমাজ।

মানবসমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানবসম্পদ তথা সন্তানসন্ততি লালনপালনের দায়িত্ব পালন করাকে নারীরা যেখানে বন্দিত্ব ও পরাধীনতা মনে করে; আর অফিস সেক্রেটারী, বিমানবালা, হোটেল পরিচারিকা, পণ্যের মডেল, দোকানী হওয়াকে স্বাধীনতা মনে করে সেই সমাজ নির্ঘাত অসভ্য, বর্বর ও মূর্খ সমাজ।

পরিবার যেহেতু একটি সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু পারিবারিক ব্যবস্থা দিয়েই একটি সমাজকে যাচাই করা যায় তা কতোটুকু সভ্য, আর কতোটুকু অসভ্য। পরিবারের মাধ্যমে নারী পুরুষের এই মিলনের উদ্দেশ্য যদি নিছক পশুসুলভ স্থূল যৌনসুখ ভোগ করাই হয়, তাহলে বস্তুগত দিক থেকে সেই সমাজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনেও আসীন হলেও তা অসভ্য সমাজ, জাহেলি সমাজ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অসভ্যতা

ইতোপূর্বে আমরা মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী যেসব গুণাবলির কথা আলোচনা করেছি, পাশ্চাত্য সমাজ তার সবগুলোকেই বিসর্জন দিয়েছে। তাদের অধঃপতন ও চারিত্রিক বিকৃতি এতো নিচে নেমে গেছে যে, তারা আজকাল সমকামিতাকেও তেমন কোনো চারিত্রিক বিচ্যুতি বলে মনে করে না।

নৈতিকতাকে তারা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেও রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এখনো কিছুটা রাখতে বাধ্য হয়েছে। তবে এটা নৈতিকতা বা আদর্শবাদিতার কারণে নয়; বরং নিছক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য। নিছক স্বার্থ রক্ষার জন্য এই দু'টি সেক্টরে তারা কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। বেশ কিছুদিন আগে প্রফুমো নামক একজন বৃটিশ মন্ত্রী একই সাথে ক্রিশ্চিয়ান কিলার নামে এক মহিলা ও রাশান দূতাবাসের এক কর্মকর্তার সাথে যৌন কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়ে। আবার এই মন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারে মিথ্যা বিবৃতিও দিয়েছিল। সবমিলিয়ে তার অপরাধের পাল্লাটি যখন তাদের দৃষ্টিতে ভারী হয়ে উঠলো তখন তারা মন্ত্রীকে খুবই তিরস্কার করলো। তবে তাদের এই সমালোচনা বা তিরস্কার এ কারণে ছিল না যে, তাদের মন্ত্রী নীতি-আদর্শ হারিয়ে পশুর মতো যথেচ্ছা যৌনচারী হয়ে ওঠেছে; বরং তাদের এই সমালোচনা ও তিরস্কারের মূল কারণ ছিলো যে, একজন মন্ত্রী যদি এই ধরনের লোকদের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তা রাষ্ট্রের গোপনীয়তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা, এসব বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে যৌন সম্পর্কের দুর্বলতার কারণে সে হয়তো রাষ্ট্রের কোনো গোপন তথ্য তাদের কাছে ফাঁস করে দিতে পারে। আমেরিকার সিনেটের বুড়ো ভামগুলোও এ ব্যাপারে একেবারে কম যায় না। যৌন কেলেংকারির ঘটনা তাদের ওখানেও তেমন কোনো ব্যাপার নয়।

এদিকে রাশিয়া এই ধরনের যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত আমেরিকান ও বৃটিশদের আশ্রয় দিতে এগিয়ে আসে। কেননা, তাদের কাছেও এসব বেহায়াপনা তেমন কোনো ব্যাপারই নয়।

অতীত কিংবা বর্তমান নেই–আজকাল সকল জাহেলি সমাজই মানুষকে সহজলভ্য যৌনাচারের দিকে ঠেলে দিতে ব্যস্ত। এসব সমাজে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, লিখনী, গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্র, নাটক সবকিছুর মাধ্যমেই মানুষের মাঝে যৌন সুড়সুড়ি জাগিয়ে তোলার অব্যাহত প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এমন সব সস্তা দর্শন তারা মানুষের মাঝে ছেড়ে দেয় যে, মানুষগুলো সহজেই এক একটা 'যৌন পশু' হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের উন্মাদনা ও পশুসুলভ যৌনতাকে তাদের মধ্যে সারাক্ষণ জাগিয়ে রাখার মাধ্যমকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলে। মানুষে যাতে সহজেই এই কুকর্মে জড়িয়ে পড়ে এজন্য তারা বলে যে, 'মনের মিলই বড় মিল, সুতরাং, মনের মিল থাকলে শারীরিক লেনদেন কোনো ব্যাপারই নয়'। সভ্যতা, শালীনতা, বিয়ে-শাদী তাদের কাছে কোনো বিষয়ই নয়। তারা শুধু ধর্ষণকেই অপরাধ মনে করে। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এই পশুসুলভ কুকর্মকে তারা বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। এমনকি স্বামীর সাথে সামান্য মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে তারা নারীর শরীরটাকে অযথা ফেলে না রেখে নতুন প্রেমিক খুঁজে নিয়ে শরীরটাকে কাজে লাগিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেয়। আর একথা সবারই জানা যে–বেপর্দা পরিবেশে যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ক্ষণিকের চোখাচোখি, চোরা চাহনির সূত্র ধরে সাময়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এই যৌনগুরুদের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্ষণিকের সম্পর্কটাকে যখন যৌন সম্পর্কে রূপান্তরিত করা হয় তখন সমাজটা যৌন পশুতে ভরে যাওয়াই স্বাভাবিক। জাহেলি সমাজের এসব নোংরা দর্শনগুলোকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এসব যৌনগুরুরা গল্প, উপন্যাস, ছবি, নাটক, শিল্প-সাহিত্যসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে।

সত্যিকার মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা এ ধরনের সমাজের গুণগতমান যাচাই করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কোনো রাখঢাক না রেখেই বলতে হবে যে, এ ধরনের সমাজ হলো জাহেলি সমাজ, অসভ্য সমাজ, পশুদের সমাজ। পক্ষান্তরে, ইসলামি সমাজব্যবস্থা চায় মানুষের চরিত্র থেকে এসব পশুবৃত্তিকে দূর করে তাকে উঁচুমানের পরিচ্ছন্ন মানবীয় মূল্যবোধের আলোয় আলোকিত করে তুলতে। এই পশুবৃত্তি দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ইসলাম মানুষের দৈহিক প্রয়োজন পূরণ ও মানসিক প্রশান্তির জন্য শালীন এবং সভ্য যে নিয়মের প্রবর্তন করে তা-ই হলো 'বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা'। নিছক শারীরিক চাহিদা পূরণকেই বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলাম মনে করে না; বরং শালীন, সভ্য ও পবিত্র প্রক্রিয়ায় দৈহিক প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে, এর সূত্র ধরে জন্ম নেয়া অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারক-বাহক তথা সন্তানদেরকে সুষ্ঠুভাবে লালনপালন, তাদের চরিত্র গঠন, তাদের

মধ্যে মানবীয় গুণবৈশিষ্ট্য বিকাশের মাধ্যমে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই এই পরিবার ব্যবস্থার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। পরিবারকে কেন্দ্র করেই যেহেতু মানবসভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়, তাই পরিবার নামক এই সংস্থাটিকে সকল ধরনের কলুষতা থেকে পবিত্র রাখতে ইসলাম বদ্ধপরিকর। মানুষের মানবীয় মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা ও মেধার বিকাশের স্বার্থে এবং সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে পরিবারকে পশুসুলভ উন্মাদ যৌনবৃত্তির ছোবল থেকে মুক্ত রাখা অপরিহার্য। পরিবার যাতে নিছক যৌনচারের ময়দান না হয়ে যায় বরং মানবসমাজকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তোলার একটা আদর্শ সংগঠনে পরিণত হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর একমাত্র ইসলামি সমাজই এই দায়িত্বকে নিজের অপরিহার্য ফরয কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে।

পক্ষান্তরে, অতীত কিংবা বর্তমানের যেসব সমাজব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে দূর করে তাদের পশুসুলভ যৌনবৃত্তি উস্কে দেয়ার জন্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সকল প্রচার মাধ্যমে অভিযান চালায় তাকে কি করে অসভ্য সমাজ না বলে পারা যায়? কি করে এই সমাজে মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শবাদিতার বিকাশ সম্ভব! এমনি একটি সমাজে বাস করে আজকের মানবশিশুটি কি আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারবে?

কিছুতেই না। কস্মিনকালেও না। এই ব্যবস্থা কখনোই মানবজাতিকে সত্যিকার আদর্শ সমাজ উপহার দিতে পারবে না; বরং এই সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থভোগী নেতারা আপনাকে আমাকে এবং আমাদেরই আদরের সন্তান–অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অসভ্যতা, নোংরামী ও বেহায়াপনার দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সদা ব্যস্ত থাকবে। এটাই সত্য, এটাই বাস্তবতা। তাই আমাদেরকে আজ বুঝতে হবে যে, ইসলামি আদর্শ, ইসলামি মূল্যবোধ, ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই মানবজাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর ব্যবস্থা। মানবসভ্যতা বিকাশের জন্য ইসলাম যে শাশ্বত জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে, তা দেখে যে কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য যে, ইসলামি সমাজই একমাত্র সভ্য সমাজ, ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র মানবসভ্যতা।

ইসলামি সমাজে বৈষয়িক উন্নতি

নিছক কোনো প্রাণী হিসেবে মানুষ এই পৃথিবীতে আসেনি; বরং সে এসেছে এই বিশ্বজগতের একক সার্বভৌম স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে। এই খিলাফতও নিছক কোনো অন্তরের অনুভূতির নাম নয়। আল্লাহর খলিফা হিসেবে অবশ্যই তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেমন, আল্লাহ ছাড়া

অন্য সকল শক্তির গোলামি থেকে নিজেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দাসত্বে আত্মনিয়োগ করা। মানবরচিত সকল আইন বিধানকে ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর আইন বিধানকে গ্রহণ করা। জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে জাহেলি দৃষ্টিভঙ্গির মূলোৎপাটন করে সেখানে আল্লাহর নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানদণ্ড স্থাপন করা। ব্যবহারিক জীবনের এসব পরিবর্তনের সাথে সাথে আল্লাহর খলিফা মানুষ নিজেকে চিন্তাজগতের আরো গভীরে নিয়ে যায়। সে তার চারপাশের ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টি- চাঁদ, তারা, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ, মহাকাশসহ অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর যেসব শাশ্বত বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে গবেষণা করে—এরই নাম বিজ্ঞান। এই গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ থেকে শক্তি আহরণ করে তা মানবতার কল্যাণের কাজে ব্যয় করে। এই প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর কৌশল আয়ত্ত করে তারা অহংকারী হয়ে ওঠে না, এসব শক্তিকে সমাজ সভ্যতা ধ্বংস কিংবা মানুষ নিধনের কাজে ব্যবহার করে না; বরং আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানব কল্যাণের যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করে সেই দায়িত্ব পালনের কাজকেই সে আরো ত্বরান্বিত করে। প্রাকৃতিক শক্তি কাজে লাগিয়ে সে খাদ্য উৎপাদন করে, শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং মানুষের জীবনযাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিশীল করে তোলার জন্য আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কাজে লাগায়। তবে এসব বৈষয়িক উন্নতিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য যে উপাদানটি অবশ্যই থাকতে হবে তাহলো আল্লাহভীতি ও আল্লাহর সর্বাত্মক দাসত্বের অনুভূতি। কেননা, একমাত্র আল্লাহভীরুতাই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, নীতি-নৈতিকতা অবলম্বনে বাধ্য করে। আসলে আল্লাহভীরুতাই সভ্য হওয়ার একমাত্র উপায় বা সভ্য হওয়ার জন্য আল্লাহভীরুতা হলো পূর্বশর্ত। আল্লাহভীতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা সমাজ কখনোই সভ্য হতে পারে না। কেননা, নিছক বৈষয়িক উন্নতিই সভ্যতার মানদণ্ড নয়।

সভ্যতার মানদণ্ড হলো নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ। অর্থ অনেক ইতরেরও থাকে, তাই অর্থ ও বৈষয়িক উন্নতি ইসলামের দৃষ্টিতে সভ্যতার নিদর্শন নয়। কোনো রাষ্ট্র শিল্প-সাহিত্য ও অর্থনীতিতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ আসনে আসীন হলেও নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ তথা আল্লাহভীতি না থাকলে সে সমাজ সত্যিকার অর্থে সভ্য হতে পারে না। আল কুরআনের অসংখ্য আয়াতে অনেক সমাজকে বৈষয়িক দিক থেকে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে জাহেলি সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন,

"তোমরা কি প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতি (হিসেবে বড় বড় ঘর) বানিয়ে নিচ্ছ যা অপচয় হিসেবেই তোমরা নির্মাণ করছো। এমন (নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছ (যা দেখে) মনে হয় তোমরা বুঝি এ পৃথিবীতে চিরদিন থাকবে। অপরদিকে তোমরা যখন কারও ওপর আঘাত হানো তখন সে আঘাতটি হানো অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। তোমরা ভয় করো তাঁকে

যিনি তোমাদের এমন সবকিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা ভালো করেই জানো। তিনি চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার, সন্তানসন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন, (সাহায্য করেছেন সুরম্য) উদ্যান ও ঝরণাধারা দিয়ে। সত্যিই আমি (এসব অকৃতজ্ঞ আচরণের জন্য) তোমাদের জন্য একটি কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করছি।" (শুআরা, ১২৮-১৩৫)

"তোমরা কি (ধরেই নিয়েছো যে,) এই (দুনিয়ার) মাঝে যা কিছু (ভোগের উপকরণ) আছে–তার মধ্যে নিরাপদে (বাস করার জন্য) তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, নিরাপদ থাকবে এই উদ্যানমালা এই ঝর্ণাধারার মধ্যে? শস্যক্ষেত্র (এই) সুকোমল ও ঘন গোছাবিশিষ্ট খেজুর বাগিচার মধ্যেও (কি তোমরা সত্যিই নিরাপদ থাকতে পারবে)? তোমরা (যে) অহংকার ভরে পাহাড় কেটে শিল্পকর্মের বাড়ি বানাও (তাতেই কি তোমরা চিরদিন থাকতে পারবে?) (ওর কোনোটাতেই যখন তোমরা নিরাপদ নও, তখন) তোমরা আল্লাহ তাআলাকেই ভয় করো এবং আমারই আনুগত্য করো। (সে সব) সীমালংঘনকারী মানুষদের কথা শুনো না, যারা (আল্লাহর) যমিনে শুধু বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে এবং কখনো (সমাজের) সংশোধন করে না। (এসব শুনে) তারা বললো, (হে সালেহ) আসলেই তুমি হচ্ছ একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, যদি তুমি (তোমার দাবিতে) সত্যবাদী হও তাহলে (ভিন্ন কোনো) প্রমাণ নিয়ে এসো। সে বললো–এই উষ্ট্রী (হচ্ছে আমার প্রমাণ), এর জন্য (কুয়ার) পানি পান করার (একটি নির্দিষ্ট) পালা থাকবে, আর একটি দিনে নির্দিষ্ট পালা থাকবে তোমাদের (পশুদের পানি) পান করার জন্য; কখনো একে কোনো রকম দুঃখ-কষ্ট দিও না, দিলে বড় (কঠিন) দিনের আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।"

(শুআরা, ১৪৬-৫৬)

"অতঃপর তারা সে সব কিছুই ভুলে গেলো যা তাদের (বারবার) স্মরণ করানো হয়েছিল। তারপরও আমি তাদের ওপর সচ্ছলতার সব কয়টি দরজা খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাতে মত্ত হয়ে গেলো তখন আমি তাদের সহসাই পাকড়াও করে নিলাম; ফলে তারা নিরাশ হয়ে পড়লো। (এভাবেই) যারা (আল্লাহ তাআলার সাথে) যুলুম করেছে তাদের মূলোৎপাটন করে দেয়া হয়েছে, আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই; যিনি সারা জাহানের মালিক।" (আনআম, ৪৪-৪৫)

"তখন (এসব দেখে) তার (যমিনের) মালিক মনে করলো, তারা বুঝি এর (ফসল ভোগ করার) ওপর (এখন সম্পূর্ণ) ক্ষমতাবান (হয়ে গেছে), এ সময় হঠাৎ করে রাতে কিংবা দিনে আমার (আযাবের) ফায়সালা তাদের ওপর আপতিত হলো; ফলে আমি তাদের এমনভাবে নির্মূল করে দিলাম, যেন গতকাল (পর্যন্ত এখানে) তার কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না। এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহকে সে সব জাতির জন্য খুলে খুলে বর্ণনা করি যারা (এ সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করে।" (ইউনুস, ২৪)

এসব আয়াত দ্বারা এমনটি ধারণা করার কোনো অবকাশ নেই যে, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্পকলা তথা বৈষয়িক উন্নতি থেকে মানুষকে পশ্চাতমুখী করে

রাখতে চায়। আশাকরি আমরা ইতোপূর্বের আলোচনায় এ বিষয়টি যথেষ্ট বোধগম্যভাবেই তুলে ধরেছি যে, ইসলাম কখনোই বৈষয়িক উন্নতির পথে কোনো বাধা তো সৃষ্টি করেই না; বরং সে এগুলোকে বান্দার প্রতি আল্লাহর করুণা ও রহমতেরই একটি অংশ মনে করে। আরো মনে করে যে, আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা দান করেছেন। মানুষ যদি যথার্থভাবে আল্লাহর গোলামির দাবি পূর্ণ করে তাহলে এই বৈষয়িক উন্নতির নিয়ামতকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে দেয়ার ওয়াদাও আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন--

"(বার বার) আমি তাদের বলেছি, (অহমিকা বাদ দিয়ে) তোমরা তোমাদের মালিকের নিকট নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (তদুপরি) আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টিধারা প্রবাহিত করবেন, (পর্যাপ্ত পরিমাণ) ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগবাগিচা ও উদ্যান স্থাপন করবেন, (বিরানভূমি আবাদ করার জন্য) তিনি এখানে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।"

(নূহ, ১০-১২)

"সেই জনপদের মানুষগুলো যদি (আল্লাহ তাআলার ওপর) ঈমান আনতো এবং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতো তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-যমিনের যাবতীয় বরকতের দরজা খুলে দিতাম, কিন্তু (তা না করে) তারা (আমার নবীকেই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। সুতরাং, তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য আমি তাদের ভীষণ শাস্তি দিলাম।"

(আল আ'রাফ, ৯৬)

আশা করি বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ একথা বুঝতে পেরেছেন যে, নিছক বৈষয়িক দিক থেকে উন্নত থাকার কারণেই ইসলাম কোনো সমাজকে সভ্য বা উন্নত সমাজ বলে সার্টিফিকেট দেয় না। কেননা, একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি সভ্যতার মানদণ্ড নয়; বরং নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শই হলো সভ্যতার একমাত্র মানদণ্ড। সমাজের সামগ্রিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজের মানুষের আচার-আচরণ, চালচলন, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতির মধ্য দিয়ে যে চিত্র ফুটে উঠবে তা-ই নির্ধারণ করবে এই সমাজটি সভ্য না অসভ্য, উন্নত না অনুন্নত, জাহেলি না আলোকিত সমাজ।

ইসলামি সমাজের ক্রমবিকাশ

ইসলাম কারো ওপর জোর করে চেপে বসে না বা ক্ষমতার জোরে কাউকে তা মানতে বাধ্য করে না। এটা অন্যসব মানবরচিত মতবাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও ইসলামের জন্য এটা মোটেও শোভনীয় নয় এবং ইসলাম এমনটি করতে মোটেই আগ্রহী নয়। এ

কারণে মানবরচিত বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেসব নীতি খুবই কার্যকর দেখা যায় ইসলামের ক্ষেত্রে তা হয়তো একেবারেই অকার্যকর। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন সর্বোচ্চমানের ত্যাগ-তিতীক্ষা, ধৈর্য, সংগ্রাম ও সংযমের। এই সংগ্রামমুখর পরিবেশের মধ্যেই ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মনে রাখতে হবে, এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও কারো মনগড়া, মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা দিয়ে নীতি নির্ধারণ করা অনুমোদিত নয়; বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠার নীতিও সম্পূর্ণভাবে ইসলামের নির্ধারিত ও নির্দেশিত। পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে, হিকমতের নামে ইসলামের নির্দেশিত পন্থাকে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, এই দ্বীন, এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এবং এই দ্বীনের সার্বিক কর্মসূচি, মূল্যবোধ, আকিদা-বিশ্বাস সবকিছুই নির্ধারিত হয় অসীম জ্ঞানের আধার বিশ্বজগতের একচ্ছত্র সার্বভৌম সত্তা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে। সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের মানুষের এখানে কোনো কর্তৃত্ব নেই।

এই মহান জীবনবিধান ও আকিদা-বিশ্বাসের মূল হলো আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি নিরঙ্কুশ ঈমান। এই ঈমানই মানুষকে সকল কুসংস্কার থেকে রক্ষা করে এবং সৃষ্টিজগত, মানবজীবন, জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার মাঝে এক বিশেষ ধরনের চেতনার জন্ম দেয়। এই চেতনা থেকেই মানুষ ধারণা পায় যে, তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছুতেই স্বেচ্ছাচারী হওয়ার অবকাশ নেই। এমনকি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নীতি নির্ধারণেও নিছক কারো মনমগজ প্রসূত নীতিমালা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং সকল ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বজগৎ থেকে অবতীর্ণ নীতিমালা অনুসরণ অপরিহার্য।

আল্লাহর প্রতি ঈমান একজন মানুষকে সাহসী ও সংগ্রামী করে তোলে। এই ঈমান গ্রহণের সাথে সাথেই মানুষের মনে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বীজ বপন হয়। ঈমান আনয়নের পর একজন মানুষ ঈমানকে শুধু নিজের ভেতর সুপ্ত রেখে বসে থাকতে পারে না। নিজে যে আলোয় আলোকিত হয়েছে সে আলোয় অন্যদেরও আলোকিত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। নিজে যে মুক্তির রাজপথ খুঁজে পেয়েছে অন্যদেরকে সেখানে তুলে আনার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। প্রতিটি ঈমানদারের মধ্যে জেগে ওঠা এই চেতনার ফলেই একটি গতিশীল সংগ্রাম দানা বাঁধে। মহাজাগতিক ঈমানের আলো এভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ আলো শুধু অন্তরকে আলোকিত করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং গোটা বিশ্বজগতকে আলোকিত করে তোলে।

ঈমান আনয়নের পর ঈমানের দাবি মোতাবেক মানুষের ওপর কিছু দায়দায়িত্ব বর্তায়। সর্বপ্রথমই হলো ঐক্যবদ্ধতা। এক এক করে ঈমানদারের সংখ্যা যখন তিন-এ উন্নীত হয় তখনই তাদের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঈমানই তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, এখন আর তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার সুযোগ নেই, তোমরা একটি সমাজে পরিণত হয়েছ। তোমাদের এই সমাজ প্রচলিত জাহেলি সমাজের মতো নয়।

তোমাদের সমাজ হলো ঈমানি মূল্যবোধের সমাজ। প্রচলিত সমাজের সাথে তোমাদের মূল্যবোধ ও আদর্শিক দিক থেকে কোনো মিল নেই।

এভাবে দিনে দিনে ঈমানদারদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। এক থেকে দশ, দশ থেকে একশ, একশ থেকে হাজার, হাজার থেকে লাখ। এভাবে দিন দিন মুসলিম সমাজ সম্প্রসারণের সাথে সাথে তার সাংগঠনিক অবকাঠামোসহ সার্বিক দিক থেকে তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদিকে ইসলামি সমাজ যতোই শক্তিশালী হয়ে ওঠে জাহেলি সমাজের নেতাদের গাত্রদাহ ততোই বাড়তে থাকে। তারা নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই বিদ্যমান জাহেলি সমাজের নেতারা ইসলামি সমাজকে ধ্বংসের জন্য উঠেপড়ে লাগে। শুরু হয় দু'টি সমাজের সংঘর্ষ। একটি ইসলামি সমাজ, অন্যটি জাহেলি সমাজ। আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, মূল্যবোধ, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি সবদিক থেকেই ইসলামি সমাজ আল্লাহপ্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গড়ে ওঠে। আর বিদ্যমান জাহেলি সমাজের নেতারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই ইসলামি সমাজের প্রসারের পথ রুদ্ধ করে দিতে চায়। বেঁধে যায় এক চরম সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ-সংঘাতের মধ্যে দিয়েই ইসলামি সমাজের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষের কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে থাকে। এ কারণে মুক্ত চিন্তার অধিকারী ও সাহসী মানুষদের মাঝ থেকে দু'একজন করে এই জাহেলি সমাজের অন্ধগলি থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামি সমাজের আলোকিত রাজপথে যোগ দেয়। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার সেই সংগ্রামের শুরু থেকে বিজয়ী হওয়া পর্যন্ত যারাই এখানে আসে তাদেরকে অনিবার্য কারণেই অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা বরণ করে নিতে হয়, অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হয়, অনেক সংকটকাল অতিক্রম করতে হয়। এই বাস্তব ময়দানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়েই প্রতিটি ব্যক্তির যোগ্যতা, প্রতিভা, মান-মর্যাদা সবকিছু নির্ণীত হয়ে যায়। বাস্তব ময়দানের এই যাচাই-বাছাইয়ের ফলাফল অনুযায়ী ইসলামি সমাজ প্রতিটি ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করে এবং প্রত্যেকের মানমর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তার ওপর দায়িত্ব বণ্টন করে।

এই সমাজের লোকেরা নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় না; বরং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক দাবি অনুযায়ী প্রত্যেকেই নিজেকে দায়িত্বের বোঝা ও পদের মোহ থেকে দূরে রাখতে চায়। লোক দেখানো ভাঁড়ামি ও রিয়া (অহংকার) থেকে বাঁচার জন্য এ সমাজের সবাই সচেষ্ট। প্রত্যেকেই এখানে নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়। লোক দেখানো মনোবৃত্তি (রিয়া) জাগার ভয়ে নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

তবে এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, এমনটি হলে সমাজ তো যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজেই পাবে না। কেননা, নিজেকে প্রকাশ করার প্রবণতা থেকে নফসকে মুক্ত রাখাটা যেমন অপরিহার্য তেমনি দ্বীনের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াটাও অপরিহার্য। তার আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনাই তো তাকে এ কাজে উজ্জীবিত করে তুলবে। জাহেলিয়াতের

বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলবে। জাহেলি সমাজের উচ্ছেদ ও ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রতিটি মানুষ তার যোগ্যতা ও প্রতিভার সবটুকু উজাড় করে ঢেলে দেবে। আর এ কারণে নিজের নফসকে রিয়ামুক্ত রাখতে সফল হলেও সমাজের সন্ধানী চোখ থেকে কারো যোগ্যতা, প্রতিভা, কর্মক্ষমতা গোপন থাকে না। এই চড়াই-উৎরাই, ত্যাগ-তিতীক্ষা, সংগ্রাম-সংঘর্ষ-এসব কিছুর মধ্য দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এ সমাজের যোগ্য নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে। নেতৃত্বের জন্য যারা যোগ্য, সাধারণ জনগণের মনে তাদের নেতৃত্বের আসন এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জোর করে চাপিয়ে দেয়ার বা বাইরে থেকে ভাড়া করে এনে কাউকে নেতৃত্বের আসনে বসানোর কোনো প্রয়োজন হয় না।

সমাজের সাংগঠনিক কাঠামো এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়। ইসলামি সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এ দু'টোরই ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। বরং বলা যায় সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপন্থা, কর্মসূচি–এসব কিছুর স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়েই ইসলামি সমাজ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সমাজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি–সকল ক্ষেত্রেই এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা অপরিহার্য। এ কারণে ইসলামের বাইরে অবস্থান করে অন্য কোনো মতবাদের চশমা চোখে লাগিয়ে ইসলামকে বোঝা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ইসলাম বিবর্জিত কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। (গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ইত্যাদি যে নামেই হোক না কেন) ইসলামের নির্ধারিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা নির্বুদ্ধিতা ও বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। চাই তা বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রে যতোই সামঞ্জস্যশীল মনে হোক না কেন।

ইসলামি সভ্যতা বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ

পাঠকদের চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি হয়েছে যে, ইসলাম নির্দিষ্ট কোনো যুগ বা কোনো ভূখণ্ডের জন্য আসেনি; বরং যে কোনো যুগ এবং যে কোনো অঞ্চলের জন্যই ইসলাম হলো মুক্তির একমাত্র পথ। এ জীবনব্যবস্থা আজকের সমস্যাজর্জরিত বিশ্বের জন্য যেমন একমাত্র সমাধান, তেমনি আগামী দিনের জন্যও একমাত্র সমাধান ও আশার আলো। আজকের মানুষ যেমন ইসলাম থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে, আগামী দিনের মানুষও একইভাবে এথেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবে। দরিদ্র দেশের মানুষদের জন্য যেমন ইসলাম কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায়, ঠিক তেমনিভাবে শিল্পোন্নত দেশের মানুষের জন্যও মুক্তির একমাত্র উপায় হলো ইসলাম।

আর শুধু অর্থ থাকলেই যেমন একজন ভালো মানুষ হওয়া যায় না, তেমনি শুধু শিল্পে, বিজ্ঞানে ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হলেই কোনো জাতিকে সভ্য জাতি বলা যায় না। আমরা সেই সমাজকেই সভ্য সমাজ বলতে পারি, যে সমাজে মানবীয় মূল্যবোধের

পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। যে সমাজে অর্থই মূল্যায়নের মাপকাঠি, যে সমাজে অর্থকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং মনুষ্যত্ববোধ, নীতি-নৈতিকতা, সততা ও আদর্শের মূল্যায়ন হয় না সে সমাজকে কিছুতেই সভ্য সমাজ বলা যায় না। সভ্য সমাজ তথা ইসলামি সমাজে মানবতাবোধ ও নীতি আদর্শই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নীতি আদর্শ ও মানবতাবোধই হলো মানবজাতির জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আর একমাত্র ইসলামি সভ্যতার ছত্রছায়াই মানুষ এই সম্পদ অর্জন করতে পারে। আজকাল অনেকে মনে করে যে, নয়-ছয় না করলে কি উন্নতি সম্ভব? একটা অসভ্য জাহেলি সমাজে বসবাস করার কারণেই এমন ধারণা তাদের মাথায় জেঁকে বসেছে। আসলে আদর্শবাদিতা, সততা, নীতি-নৈতিকতা, মানবতাবোধ কখনোই বৈষয়িক উন্নতির পথে অন্তরায় নয়। ইসলামি মূল্যবোধ পশুত্বের বিরোধী, অসততা ও অন্যায়ের বিরোধী ঠিকই, কিন্তু কখনোই বৈষয়িক উন্নতির পথে বাধা নয়। বরং বৈষয়িক উন্নতি সাধন করার জন্যও ইসলাম মানুষকে উৎসাহ দেয়। কেননা, তার ওপর খেলাফতের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা পালনের স্বার্থেই তার বৈষয়িক উন্নতির প্রয়োজন। অর্থনৈতিকভাবে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে যারা পিছিয়ে আছে ইসলাম তাদেরকে কখনোই ওই অবস্থায় বসে থাকতে বলে না; বরং মানবীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে বৈষয়িক উন্নতির জন্য এসব বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে উৎসাহ দেয়। সমাজের সার্বিক পরিস্থিতি, মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ—এসব কিছুর সাথে সংগতি রেখে যদিও ইসলাম বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম নীতি নির্ধারণ করে, কিন্তু তার মূলনীতি সব সময় এক ও অপরিবর্তনশীল। কেননা, ইসলামের মূলনীতি চিরন্তন, শাশ্বত ও মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক সুনির্ধারিত। এই মূলনীতির কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সম্ভব নয়। আমরা যদি ইসলামকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করি তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, পৃথিবীতে এমন একটি অধ্যায় ছিল যখন ইসলামি আদর্শ সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তবে এই চিন্তার সাথে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের এই মূল্যবোধটি ইতিহাসের সৃষ্টি নয়; বরং ইতিহাসটিই এখানে ইসলামের সৃষ্টি। দশকথার এক কথা হলো যে, ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা অঞ্চলের জন্য নয়; বরং ইসলাম হলো এই বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া সর্বকালীন ও সার্বজনীন একমাত্র জীবনব্যবস্থা। এই শাশ্বত ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা সময় ও পরিবেশের সাথে সংগতি রক্ষার জন্য যৌগিক নীতিমালায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন সাধনকে মেনে নিলেও মূলনীতির ক্ষেত্রে সে চিরকালই অপরিবর্তনশীল ও আপসহীন। এসব মূলনীতিগুলোর অন্যতম হচ্ছে—

১. আল্লাহর দাসত্ব
২. আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়
৩. মনুষ্যত্ববোধের বিকাশের পাশাপাশি পশুবৃত্তি রোধ
৪. পারিবারিক ব্যবস্থাকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গুরুত্ব প্রদান
৫. আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করা।

একথা আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি যে; ইসলাম মানুষের কোনো যোগ্যতা বা ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন তো করেই না, বরং তার যথার্থ মূল্যায়নের সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে মূলনীতি যথাস্থানে বহাল রেখেও ইসলাম সভ্যতা, শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থনীতিসহ এমন অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক রদবদলের বিরোধী নয়। আর সময় ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার স্বার্থে এসব যৌগিক পরিবর্তন দেখে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, 'এটা মনে হয় আধুনিক হুজুরদের কর্মকাণ্ড'। আসলে মূলনীতি যথাযথভাবে বহাল রেখে স্থান-কাল-পাত্রভেদে ছোটখাটো নীতিমালার পরিবর্তন ও পরিমার্জন ইসলামি শরিয়তেরই নীতি। এটা অন্য কোনো মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করা হয় না বা এই নীতি কারো কাছ থেকে ধারও করা হয় না। তবে ইসলামপন্থীরা যেন এই উদারতার অসদ্ব্যবহার করতে না পারে সেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা দরকার। তারা যেন হিকমত, কৌশল, সময়ের দাবি এসব ধুঁয়া তুলে ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলোকে পরিবর্তনশীল বলে চালিয়ে না দিতে পারে সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম মধ্য আফ্রিকায় প্রবেশ করে যখন সেখানকার জংলী, বর্বর, উলঙ্গ মানুষগুলোকে দেখতে পেয়েছে তখন তাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে সভ্যতার দিকে আহ্বান জানিয়েছে। তাদের নগ্নদেহে কাপড় পরিয়েছে। তাদেরকে সভ্যতার আলোয় টেনে এনেছে। ইসলামের বাণীতে মুগ্ধ হয়েই তারা তাদের পূর্বেকার জনবিচ্ছিন্ন বর্বর জীবনধারা বর্জন করেছে। ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের চিন্তা-ধারায় প্রভাবিত হয়েই সভ্য সমাজ বিনির্মাণে তারা পরিশ্রম করতে শুরু করেছে। প্রকৃতির মাঝে আল্লাহর দেয়া গুপ্তধন খুঁজে বের করার পেছনে লেগেছে। যে মানুষগুলো এক সময় গুহায় বাস করতো, নানারকম অলীক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করতো, যারা একসময় সংকীর্ণ চিন্তায় আবদ্ধ ছিল তাদেরকে এসব কুসংস্কার ও বর্বরতা থেকে বের করে এনে সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোর জগতে ইসলামই তুলে এনেছে। অলীক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা থেকে মুক্তি দিয়ে বিশ্বস্রষ্টার আনুগত্য ও গোলামি করা ইসলামই তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। এই যুগপৎ ঐতিহাসিক সংস্কার যদি সভ্যতা না হয় তাহলে সভ্যতা কাকে বলে? সভ্যতার সংজ্ঞা কী?

এখানে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম এই মানবগোষ্ঠীকে যে পরিবেশে যে অবস্থায় পেয়েছে তাদেরকে সেই অবস্থা থেকেই সভ্যতার কোলে তুলে আনার জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছে। পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতিতেই ইসলাম তাদের সংশোধন করেছে। এমনিভাবে যদি ভিন্ন ধরনের কোনো মানবসমাজকে নিয়ে ইসলাম কাজ শুরু করে তাহলে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, তাদের চিন্তাচেতনা, ধ্যান-ধারণা সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করেই ইসলাম তাদেরকে সংশোধনের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামি সভ্যতা বিকাশের জন্য কোনো সমাজকে শিল্পে, বিজ্ঞানে বা অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট বা ন্যূনতম স্তরে

থাকতে হবে এমনটি জরুরী নয়; বরং ইসলাম যে কোনো যুগে, যে কোনো অঞ্চলে, যে কোনো সমাজেই প্রবেশ করুক না কেন ইসলাম সেখানে বিদ্যমান কোনো উপাদানকে ধ্বংস করবে না বরং পরিশীলিত করবে, নিয়ন্ত্রিত করবে এবং তাকে মার্জিত রূপ দেবে। আর যদি কোনো সমাজ সবধরনের উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে সভ্যতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত সব উপাদান সংগ্রহ করার উপায়ও ইসলাম শিখিয়ে দেবে এবং অর্জনের জন্য উৎসাহ যোগাবে। ইতোপূর্বে বারবার উল্লেখ করা কথাটি আমি আলোচনার শেষে এসে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ইসলাম যেখানেই প্রবেশ করুক, যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন তাতে তার শাশ্বত মূলনীতিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পরিমার্জন সাধিত হবে না । ইসলাম অবশ্যই তার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর ইসলামের নির্মিত এই সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা ও তা আরো বিকশিত করার জন্য সংগঠনও গড়ে ওঠাবে। এটা ইসলামের প্রকৃতিগত অনিবার্য দাবি। এই সংগঠন হবে সম্পূর্ণ ইসলামি স্বকীয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং জাহেলি সমাজ সংগঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের। এই সমাজ সংগঠনের রং হবে আল্লাহর রং, এর প্রতিটি সদস্য রঞ্জিত হবে আল্লাহর রংয়ে। কেননা, এই মহান আদর্শের প্রণেতা বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

"(হে নবী, তাদের তুমি বলো) আসল রং হচ্ছে আল্লাহ তাআলারই। এমন কে আছে–যার রং তাঁর রংয়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট? (আমরা ঘোষণা করছি যে,) আমরা তাঁরই ইবাদত করি।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৩৮)

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামি সংস্কৃতি

ইতঃপূর্বে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইসলামি জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি অর্থাৎ কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথম অংশ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেই প্রথম স্তম্ভ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সারমর্ম ছিল সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। এই কালেমার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর সারমর্ম হলো, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের দাবি অনুযায়ী জীবন যাপনের যে পদ্ধতি মানতে হবে, তা গ্রহণ করতে হবে একমাত্র মুহাম্মদ (স)-এর কাছ থেকে।

এই কালেমার প্রথম অংশ অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের বিষয়টি নিছক কোনো বিশ্বাসগত বিষয় নয়; বরং তা একই সাথে আকিদা-বিশ্বাসের ওপর যেমন প্রভাব বিস্তার করবে, তেমনি তা সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বাস্তব জীবনেও। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আইন-কানুন ও নীতিমালা গ্রহণের ব্যাপারে কার আনুগত্য করা যাবে, কার আনুগত্য করা যাবে না, তাও নির্ধারণ করবে এই আকিদা-বিশ্বাস। এই আকিদা-বিশ্বাসের দাবিতেই একজন মুসলমান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামী স্বীকার করে নিতে পারে না। মানুষ আল্লাহ ছাড়া নিরঙ্কুশভাবে কারোই আনুগত্য করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে কিছুতেই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন বলে স্বীকৃতি দেয় না। ইতঃপূর্বে আমরা ঈমান, ইবাদাত ও সার্বভৌমত্বের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি; এবার এর সাথে সম্পর্কিত তাহযীব-তামাদ্দুন তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা করবো।

আল্লাহর শরিয়তের সীমারেখা

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিঃসন্দেহে ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূল কথা। তবে সাথে সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এই সার্বভৌমত্ব শুধু আইন-কানুন রচনা বা বিচার–ফয়সালার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। আর ইসলামি শরিয়ত অর্থও শুধু কিছু ফিকহী মাসআলার সমষ্টি নয়; বরং মানবজীবনের ছোট-বড়, শাখা থেকে প্রশাখা কোনো কিছুই এর প্রভাবমুক্ত নয়। আকিদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে শাসনকার্য, রীতিনীতি, নীতি-নৈতিকতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-সভ্যতা সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত চিন্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কিত ধারণা, সৃষ্টিজগতে মানুষের অবস্থান, মর্যাদা ও দায়িত্ব সবই ইসলামি শরিয়তের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই ইসলামি শরিয়তের মৌলিক আলোচ্য বিষয়। সুতরাং,

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর শরিয়তকে নির্দিষ্ট কোনো বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার সুযোগ নেই। কেননা, মুসলমানের জীবনের সকল বিভাগ ও স্তর আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মসমর্পণের নীতিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, আজকাল শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে আল্লাহর নীতি প্রয়োগের কথা শুনে সাধারণ মানুষ তো বটেই বিজ্ঞজনেরাও চোখ কপালে তুলে ফেলেন! তারা বলতে চান, এ সমস্ত দুনিয়াবী ব্যাপারে আবার আসমানী ফয়সালার কী প্রয়োজন আছে। 'আর্ট' সম্পর্কে লেখা একটি বইয়ে আমি বলেছিলাম যে, কলাশিল্প অর্থই হলো মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ। সৃষ্টি, সৃষ্টিজগৎ, মানবজীবন সম্পর্কে শিল্পী যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করে তা-ই তার ছবির মাধ্যমে ফুটে ওঠে। ইসলাম কখনো শিল্পকলাকে নিরুৎসাহিত করে না; বরং মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা সৃষ্টির জন্য আরো উৎসাহ দেয়। তবে হাঁ, শিল্পকলার নামে নষ্টামি, অশ্লীলতা ও নোংরামীকে ইসলাম কখনো প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম শিল্পকলাকে তার নিজস্ব ভাবধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে। সত্যিকার অর্থে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাকে অবশ্য কোনো আইন-কানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয় না। কেননা, ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস নিছক অন্তরের কোনো অসার অনুভূতির নাম নয়; বরং যে ব্যক্তি ইসলামি আদর্শ গ্রহণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার ভাবাবেগ, চিন্তা-চেতনা, শিল্প-সাহিত্য সবকিছু ইসলামের পবিত্র ছাঁচে গড়ে ওঠে। তবে শিল্প-সাহিত্যের ওপর আল্লাহর কালামের প্রভাব কীভাবে পড়ে সে ব্যাপারে সঠিক ধারণা নেয়ার জন্য বিস্তর আলোচনা দরকার।

ইসলামি চিন্তা-চেতনা শুধু মানুষের জীবনের নির্দিষ্ট কোনো অংশকে নয় গোটা জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে। আনুগত্য, লেনদেন, নীতিনৈতিকতা, মূল্যবোধ, গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস তথা কোনো বিষয়েই একজন মুসলমান আল্লাহর নির্দেশনা বাদ দিয়ে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান নেয়ার ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। এসব বিষয়ের জ্ঞান শুধুমাত্র এমন জ্ঞানীগুণীদের কাছ থেকেই নেয়া যেতে পারে, যাদের গোটা জীবন আল্লাহর রঙে রঞ্জিত, যাদের মন ইসলামি চিন্তা-চেতনা দ্বারা পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। যাদের কথা ও কাজে মিল নেই তাদের কাছ থেকে এসব বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের সম্ভাবনাই বেশি। তবে হাঁ, কোনো কোনো বিষয়ে অমুসলমানদের কাছ থেকেও জ্ঞানার্জনের অনুমতি রয়েছে। যেমন, গণিত, রসায়ন, পদার্থ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, কৃষিসহ যে কোনো ধরনের কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। তবে এমন ধারণা থাকা উচিত নয় যে, এসব বিষয়ে মুসলমানদের মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই ; বরং ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যোগ্য লোক সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা, এসব বিষয়ও মুসলমানদের ওপর ফরয তথা ফরযে কেফায়া। যদি মুসলমান সমাজ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে পিছিয়ে থাকে, তাহলে তারা সবাই ফরয

তরকের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুসলিম সমাজে যোগ্য লোক তৈরির জন্য সাময়িকভাবে অমুসলিমদের কাছ থেকে এসব বিদ্যা শেখা–এমনকি প্রয়োজনে তাদেরকে মুসলমান রাষ্ট্রের শিক্ষালয়ে নিয়োগও দেয়া যেতে পারে। এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেই আল্লাহর নবী বলেছিলেন– 'তোমরা পার্থিব বিষয়াদিতে বেশি জ্ঞান রাখো'। এসব জ্ঞান–বিজ্ঞান অমুসলিমদের কাছ থেকে শেখার অনুমতি দানের কারণ হলো, এগুলো মানুষের আকিদা-বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে না। জীবন, সৃষ্টিজগৎ, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্কের ধরন, এসব মৌলিক বিষয়সমূহের ওপর ওইসব বৈষয়িক বিদ্যার কোনো প্রভাব নেই। এমনিভাবে এগুলো ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত বিষয়সমূহের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। যেমন ব্যক্তি ও সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণে আইন-কানুন নির্ধারণ, নীতিনৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি। যেহেতু বৈষয়িক এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসকে প্রভাবিত করতে পারে না বা জাহেলিয়াতের দিকে মুসলমানদেরকে নিয়ে যেতে উস্কানী দেয় না, সেহেতু এসব জ্ঞান কার কাছ থেকে নেয়া হলো সেটা মুখ্য বিষয় নয়।

তবে কিছু কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন মানবসৃষ্টির সূচনা, বিশ্বমানবতার ইতিহাস ইত্যাদি। সুতরাং, কোনো বিদ্যা যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জীবনযাত্রা, চিন্তা-চেতনার ওপর প্রভাব ফেলে তাহলে সেসব জ্ঞান অর্জন সমীচীন নয় এবং সেসব জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছুতেই অমুসলমানদেরকে গুরু মানার অবকাশ নেই। জীবনযাত্রা, চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাসের ওপর যেসব বিদ্যা সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করে সেসব জ্ঞান বিদ্যা অর্জনের জন্য শুধু এমন আল্লাহভীরু লোকদেরকেই শিক্ষক মানা যায়, যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওহীভিত্তিক জ্ঞানকেই সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেন।

তবে জাহেলিয়াতনিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন মতাদর্শের লেখকদের বই-পুস্তকের মধ্যে যেসব অযৌক্তিক, বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য রয়েছে, সেগুলোর কুফল ও অকল্যাণ সম্পর্কে শুধু সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্য তা পড়া যাবে। এয়াড়া এসব বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলোকে বের করে পাশাপাশি ইসলামের শাশ্বত, বাস্তবমুখী ও কল্যাণকর তথ্যগুলোকে যথার্থভাবে মানবসমাজের সামনে তুলে ধরার জন্য এ জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে।

দর্শন, মনোবিদ্যা, ইতিহাস, নীতি আদর্শের রূপরেখা, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান–এসব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানবিজ্ঞানগুলোতে অতীতে ও বর্তমানে এতো বেশি বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, এর সঠিক রূপ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব । বিশ্বের কোথাও দীর্ঘদিন ধরে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন ধরনের জাহেলি মতাদর্শের ভিত্তিতেই এগুলোর অবকাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব বিদ্যাগুলো মানুষ

নামের কতিপয় অভিশপ্ত নাস্তিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ কারণে বর্তমান বিশ্বে এসব বিদ্যার যে কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে তা ইসলামের বিরুদ্ধে তো উঠে পড়ে লেগেছেই, অন্যান্য ধর্মেরও বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। পরোক্ষভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এসব বিদ্যা পদার্থ, রসায়ন, গণিত কিংবা নিছক জীববিদ্যার মতো নয়। তাছাড়া এগুলো যদি তার নিজস্ব গণ্ডির মাঝেই থাকতো এবং পণ্ডিতেরা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে যদি উদ্ভট সব মতবাদ রচনার দুঃসাহস না করতো তাহলেও এতোটা স্পর্শকাতর বিষয়ে পরিণত হতো না।

যেমন ডারউইনের বানরতন্ত্র। এই লোকটি জীববিদ্যার নামে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য ও যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই, আন্দাজ-অনুমানের ওপর নির্ভর করে জীবন সৃষ্টির সূত্রপাত সম্পর্কে এমন এক বিভ্রান্তিকর মতবাদ জন্ম দিয়েছে, যা মানবজাতির জন্য চরম অবমাননাকর। সে এই বিভ্রান্তিকর মতবাদের নামে বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে বসেছে। আর এর কুফল হিসেবে অনেক মানুষের মধ্যে তার নিজের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে এমন এক ধারণা জন্ম নিয়েছে, যা তাদের নীতি-নৈতিকতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, মুসলমানদের জন্য এসব উদ্ভট বানরতন্ত্র কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো তন্ত্র শেখার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত যে চূড়ান্ত ইলম মুসলমানদের জ্ঞানভাণ্ডারে রয়েছে তা-ই যথেষ্ট। আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত জ্ঞানের বিপরীতে এসব আন্দাজ– অনুমানের কোনো অস্তিত্ব তথা মূল্য নেই ।

অনেকে বলতে চান যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো দেশ, জাতি বা ধর্মীয় সীমায় আবদ্ধ বিষয় নয়। এটা সকল মানুষের কাছেই সমান। মানুষ হিসেবে সবার কাছে এটা একই বিবেচনার দাবি রাখে। তাদের এই কথাটা কেবল তখনই সমর্থন করা যাবে, যখন এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান তার নিজ সীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি তার গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমা লংঘন করে 'জীবনের উৎপত্তি', 'মানব জীবনের উদ্দেশ্য'–এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্দাজ-অনুমান নির্ভর মতবাদ রচনার চেষ্টা করে, তাহলে তো আর তাদের উল্লিখিত উদার মতবাদকে সমর্থন করা যায় না। সেক্ষেত্রে বলা যায়, তাদের কথা কিছুটা সত্য হলেও মতলব পুরোপুরিই খারাপ।

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, যারা সংস্কৃতিকে নিছক মানুষের উত্তরাধিকার বলে আখ্যা দিচ্ছেন, তারা মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যই এই চালবাজির আশ্রয় নিয়েছেন। সংস্কৃতির নাম দিয়ে তারা মানুষের নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এসব মতবাদের প্রবক্তারা আসলে ইহুদি-নাসারাদেরই মুখপাত্র। এরা মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক বন্ধন শিথিল করে দিয়ে মানুষকে অর্থলিপ্সু ও যৌনজীবে পরিণত করতে চায়। কারণ ইহুদিদের শোষণের হাতিয়ার 'সুদী ব্যবসা' সম্প্রসারিত করতে হলে মানুষকে অবশ্যই অর্থলিপ্সু ও যৌনপশু বানাতে হবে। কেননা, এই সুদী ব্যবসার মাধ্যমেই ইহুদিদের

(বিশ্ব ব্যাংক, দাতা সংস্থা, গ্রামীণ, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ও অন্যান্য) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

নিরেট বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোকে বাদ দিলে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমরা পৃথিবীতে যতো ধরনের সংস্কৃতি রয়েছে, তাকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) ইসলামি সংস্কৃতি (২) জাহেলি সংস্কৃতি।

জাহেলি সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ হতে পারে। তবে একটি জায়গায় এসে সবগুলোই এক হয়ে যায়। সেই অন্তঃমিলটি হলো–'সকল জাহেলি জীবনব্যবস্থার প্রবর্তক ও নিয়ন্ত্রক হলো মানুষ'। জাহেলি ব্যবস্থায় মানুষই মানুষের জন্য আইন-কানুন, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, মানদণ্ড প্রণয়ন করে। এ কারণেই এই সমাজে একশ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর মানুষের প্রভুর আসনে বসে যায়। পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষ হয়ে কোনো মানুষের হুকুম বা আইনের গোলামীকে মানুষের জন্য বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয় না। এই সমাজের রীতিনীতি, আইন-কানুন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে বিশ্বজাহানের একক সার্বভৌম মালিক ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হাতে। ইসলামি সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারাকে গতিশীল করে, প্রাণবন্ত করে এবং মানুষের গোটা জীবনকে সুখময় করে।

বিধর্মীদের থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান শেখার ব্যাপারে ইসলামের নীতি

তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বিশ্বের নিয়ন্ত্রক ইউরোপের জীবনীশক্তিই হলো বিজ্ঞান। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এসব বিজ্ঞানের মূল আবিষ্কারক তারা নয়; বরং স্পেন ও প্রাচ্যের ইসলামি শিক্ষালয়গুলোতেই সর্বপ্রথম এসব বিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল। মুসলমানদের জীবনবিধান আল কুরআনে সৃষ্টিজগৎ, প্রাকৃতিক শক্তি, সৃষ্টিজগতে কার্যকর অদৃশ্য শক্তি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে বারবার ইঙ্গিত করার কারণে মুসলমানরাই সর্বপ্রথম এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কারে মনোযোগ দেয়। ইউরোপ মুসলমানদের এই গবেষণা দেখে অতিআগ্রহের সাথে মুসলমানদের কাছ থেকে এসব জ্ঞানবিজ্ঞান শিখে নিয়ে এর উন্নতি ও বিকাশের জন্য চেষ্টা শুরু করে এবং তারা মুসলমানদের আবিষ্কৃত সূত্র ধরে ক্রমান্বয়ে সফলতাও অর্জন করতে থাকে। এদিকে এই জ্ঞানবিজ্ঞানের জনক মুসলিমজাতি ক্রমান্বয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তাদের মাঝে দেখা দেয় নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অবক্ষয়। ফলশ্রুতিতে তাদের বিজ্ঞানচর্চা আস্তে আস্তে স্থবির হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে এসে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

মুসলিম সমাজের এই অধঃপতনের একটি কারণ ছিল, তাদের ঈমানী ও সামাজিক দুর্বলতা এবং কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া। অন্যটি ছিল মুসলিম বিশ্বের ওপর বারবার ইহুদি-খৃষ্টানদের আক্রমণ। এদিকে মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান শিখে ইউরোপীয়রা সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের মাধ্যমে এর মূল উদ্ভাবকদের নাম-নিশানাও মুছে ফেলে। যাতে করে সহজে আর কেউ প্রমাণ করতে না পারে যে, এসব বিদ্যার জনক

হলো মুসলমান। তারা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইসলামি পদ্ধতিগুলোকেও বিলুপ্ত করে দেয়। এদিকে ইউরোপের জনগণ ধর্মীয় শাসনব্যবস্থার নামে তাদের ওপর চেপে বসা গীর্জার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যার কারণে জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপর থেকে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ন্যূনতম প্রভাবটুকুও উঠে যায়। এ কারণে ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে জাহেলিয়াত দ্বারা শুধু নিয়ন্ত্রিতই হয়নি সাথে সাথে ইসলামবিদ্বেষীও হয়ে উঠেছে।

যেহেতু সেই ইসলামবিদ্বেষীরাই আজকাল এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতটা নিয়ন্ত্রণ করছে, এ কারণে একজন মুসলমানের পক্ষে এদের কাছ থেকে জ্ঞান শিখে সেই জ্ঞানকে ইসলামি খাতে প্রবাহিত করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত নির্ভেজাল ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসকে সকল চিন্তা ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকলে নিজে নিজেই চেষ্টা করা অথবা আল্লাহভীরু কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে চিন্তা-চেতনার দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ করে নেয়া।

'যার কাছ থেকে পারো জ্ঞান অর্জন করো' এ কথা কোনো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সকল ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের ঈমান-আকিদা, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে সেসব বিষয়ে জানার্জনের জন্য যার তার কাছে ছুটে যাওয়া কিছুতেই সমর্থনযোগ্য কাজ নয়। নিছক কোনো বস্তুগত বিদ্যা হলে সেটা ভিন্ন কথা।

কিন্তু মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা আজ বড়ই করুণ! তারা আজ জানেই না–তারা কারা? কী তাদের দায়িত্ব? কোথায় তাদের অবস্থান?

তারা আজ ভুলেই গেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁরই, প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর এই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও অর্থনীতিতে তাদের উন্নতিসাধন বাঞ্ছনীয়। তাদের এই অধঃপতনের কারণে আজ মুসলিম বিশ্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এ কারণে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে নিছক কারিগরি ও প্রকৌশল বিষয়ের মতো যেসব বিষয় ঈমান-আকিদা, চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে না সেসব বিষয়ে অমুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে। কিন্তু দ্বীন ধর্ম, ঈমান-আকিদা, জীবনধারণ, কুরআন-হাদিস, সীরাত-সুন্নাত, ইতিহাস, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থা–এ ধরনের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অমুসলিম তো দূরের কথা কোনো নাফরমান, সীমালংঘনকারী এমনকি নামধারী মুসলমানদের কাছ থেকেও শেখা যাবে না।

কোনো গবেষণা, চিন্তাভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে আপনাদের সামনে আমি হুট করে এই মন্তব্য করছি না; বরং এই মন্তব্যের পূর্বে আমি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর আমার কাছে আকর্ষণীয় বিষয়সহ জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের শিক্ষা ও এর প্রভাব নিয়ে

গবেষণা করেছি, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনা করেছি। তারপর যখন আমি এসব কিছুকে ঈমানী মূলনীতির কষ্টিপাথরে পরিমাপ করেছি, ঈমানের উৎসমূলের দিকে ফিরে এসেছি, তখন বুঝতে পেরেছি এতোদিনের জ্ঞান-গবেষণা, এতোদিন যা কিছু শিখেছি তা সবই ঈমানের কাছে তুচ্ছ। মনের মাঝে উঁকি দেয়া সকল প্রশ্নের উত্তর কে যেন আমাকে মুহূর্তে বুঝিয়ে দিয়ে গেলো। আর কোনো জটিলতা নেই, সন্দেহ নেই, নেই সংশয়। এক অনাবিল, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র অনুভূতি আমাকে ছেয়ে ফেললো। এখানে কোনো হতাশা নেই, অনিশ্চয়তা নেই, অস্পষ্টতা নেই, অস্বচ্ছতা নেই। হাঁ, আমার জীবন থেকে চলে যাওয়া সেই চল্লিশটি বছরের জন্যও আমার কোনো দুঃখ নেই। কেননা, এই সময়ের মাঝে আমি জাহেলিয়াতের খুব কাছে থেকে তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। তার বাইরের তর্জন-গর্জনের পাশাপাশি তার ভেতরের অন্তঃসারশূন্যতা, তার বিভ্রান্তি, তার অজ্ঞতা, মূর্খতা সবকিছুই আমি একান্ত কাছ থেকে চিনে নিয়েছি। ঐ ঝলমলে ঠুনকো কাচের খণ্ডটিকে আমার কাছে আর কেউ হীরক খণ্ড বলে বিক্রি করতে পারবে না। আমার জীবনের এই চল্লিশটি বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমাকে বলে দিয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর কালামই হলো জ্ঞানের একমাত্র উৎসমূল। এই উৎসমূলের সাথে কিছুতেই জাহেলিয়াতের সংমিশ্রণ বাঞ্ছনীয় নয়। জ্ঞান একমাত্র এই নির্ভেজাল উৎস থেকেই নিতে হবে।

সাথে সাথে একথাটিও আমি বলে যেতে চাই যে, এই যে চিন্তাটি আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম, এটা নিছক আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়। এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে শুধু আমার কেন অনেকে মিলেও যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাতেও অনেক সমস্যা থেকে যেতে পারে, যদি না সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ থেকে কোনো দলীল-প্রমাণ না পাওয়া যায়। যদি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকেই মানদণ্ড খুঁজে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কারো ব্যক্তিগত মতামতের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যে কোনো বিতর্কিত বিষয়ে মুসলমানদের কর্তব্য হলো, সর্বাবস্থায় কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া। তাই আমিও এ বিষয়ে নিজের মতামত জাহির করার চেষ্টা না করে কুরআন-সুন্নাহর দিকেই ফিরে যাবো। খুঁজে দেখবো এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কী নির্দেশনা দান করেছেন। আমরা দেখতে পাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি নাসারাদের ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন–

"আহলে কিতাবদের অনেকেই বিদ্বেষের কারণে চেষ্টা করবে (যেভাবেই হোক) তোমাদেরকে ঈমানের (আলোর) বদলে আবার সেই কুফরির অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে, (এমনকি) সত্য একবার তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও (তারা এ ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হবে না)। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তোমরা ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। আল্লাহ তাআলা সব কিছুর ওপর অবশ্যই ক্ষমতাশালী।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১০৯)

"ইহুদি ও খৃষ্টানরা কখনো তোমার ওপর খুশি হবে না, যতোক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করতে শুরু করো। তুমি তাদের বলে দাও, আল্লাহ তাআলার পথই একমাত্র সঠিক পথ। (সাবধান) তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পরও যদি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো তাহলে (আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য) তুমি কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১২০)

"হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছ যদি এই আহলে কিতাবদের কোনো একটি দলের কথাও মেনে চলো, তাহলে (মনে রেখো) এরা তোমাদের ঈমান আনার পরও (ধীরে ধীরে) তোমাদেরকে আবার কাফির বানিয়ে দেবে।"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০০)

রাসূল (স.) বলেছেন, আহলে কিতাব (ইহুদি নাসারাদের) কাছে কোনো বিষয়েই কিছু জানতে চেয়ো না, তারা তোমাদেরকে কখনোই সঠিক পথ দেখাবে না। কারণ, তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। তাদের কথা শুনলে হয় তোমরা সত্যকে মিথ্যা হিসেবে অথবা মিথ্যাকে সত্য হিসেবে মেনে নেবে। আল্লাহর কসম! (এই সাধারণ আহলে কিতাবরা তো দূরের কথা) যদি স্বয়ং মুসা (আ)ও এখন জীবিত থাকতেন তবে এখন আমার আনুগত্য ছাড়া তার জন্য কিছুই বৈধ হতো না। (হাম্মাদ ও শা'বির সূত্রে হযরত জাবের (রা) থেকে হাফিয আবুল আলি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি নাসারাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যেখানে এমন দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে যদি আমরা মনে করি আকিদা-বিশ্বাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন এসব বিষয়ে ইহুদি নাসারারা আমাদেরকে সঠিক তথ্য দেবে, সত্য পথ দেখাবে, তাহলে তা একদিকে যেমন হবে সরাসরি সীমালংঘন তেমনি হবে চরম নির্বুদ্ধিতা, চূড়ান্ত অপরিণামদর্শিতা ও অদূরদর্শিতা।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই বলেছেন–'হে নবী, তুমি সুস্পষ্টভাবে বলে দাও যে, আল্লাহর দেয়া পথনির্দেশই একমাত্র সত্য সঠিক পথনির্দেশ।'

এ আয়াতের মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঈমানদাররা তাদের সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশনাই মেনে চলবে। কারণ, আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য সকল পথই ভ্রান্ত ও বাতিল। তাই আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথ অবলম্বন করলে পথভ্রষ্ট হওয়া এবং পরিণামে ইহকালে দুঃখ-দুর্দশা ও পরকালে কঠিন আযাব অনিবার্য।

যারা আল্লাহর নির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে তারা ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং, এমন লোকদের সাথে কিছুতেই কোনো মুসলমানের মৈত্রীবন্ধন থাকতে পারবে না। কেননা, এরা সব সময় নিজেদের

স্বেচ্ছাচারিতা ও আন্দাজ-অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই চলে। এদের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

“অতএব (হে নবী) যে ব্যক্তি আমার (সুস্পষ্ট) স্মরণ থেকে সরে গেছে তার ব্যাপারে তুমি কোনো পরোয়া করো না; (কারণ) সে তো পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না। তাদের মতো (হতভাগ্য) ব্যক্তিদের জ্ঞানের সীমারেখা তো ওইটুকুই! এই কথা তোমার মালিকই ভালো জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তিনিই ভালো করে বলতে পারেন কে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।”

(সূরা আন নাজম, আয়াত ২৯-৩০)

“তারা তো পার্থিব জীবনের (শুধু) বাইরের দিকটি (সম্পর্কেই) জানে, আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তারা (সম্পূর্ণই) গাফেল।” (সূরা আর রোম, আয়াত ৭)

এসব স্থূল বোধসম্পন্ন লোকগুলোর কোনো গভীর জ্ঞান নেই। এদের অনুভূতিশক্তি এতোই ভোঁতা যে, এরা জীবজন্তুর মতো যতোটুকু চর্মচক্ষু দিয়ে দেখে ততোটুকুই শুধু বোঝে। কোনো কিছুর গভীরতা, তাৎপর্য, অন্তর্নিহিত বিষয় এরা বুঝতে পারে না। বর্তমান যুগের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের একই হাল। এ কারণে এসব স্থূল চিন্তার মানুষদের থেকে মুসলমানরা কোনো দিকনির্দেশনা, মতাদর্শ, দর্শন কিছুই নিতে পারে না। নিছক কারিগরি কোনো বিষয়ে হলেই তাদের কাছ থেকে শেখা যায়। তবে সেক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে যেন কিছুতেই কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে ওদের স্থূল চিন্তা-চেতনা আপনার মধ্যে প্রবেশ করাতে না পারে।

আর মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে তাদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। কুরআনে কারীমে নিম্নোক্ত আয়াতে যে কল্যাণকর জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে এদের এসব বস্তুবাদী জ্ঞানবিজ্ঞানকে কিছুতেই সেসব জ্ঞানের আওতায় ফেলা যায় না।

“যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সেজদাবনত হয়ে কিংবা দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করে, পরকালের (আযাবের) ভয় করে এবং (সর্বাবস্থায়) তার মালিকের অনুগ্রহের প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? (তাদের) বলো, যারা (আল্লাহ তাআলাকে) জানে আর যারা (তাঁকে) জানে না, তারা কি সমান? (আসলে একমাত্র) জ্ঞানী ব্যক্তিরাই (এসব তারতম্য থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।” (সূরা আয যুমার, আয়াত ৯)

অনেকে আবার এ আয়াতকে পূর্বাপর সম্পর্কচ্ছেদ করে মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করে। কিন্তু তা কিছুতেই যথার্থ নয়। জ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার জন্য আমাদেরকে পুরো আয়াতটির দিকে লক্ষ করতে হবে। এখানে নিছক কোনো বস্তুবাদী জ্ঞানকে জ্ঞান বলা হয়নি। এখানে সেই জ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে, যে জ্ঞান মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়, যে জ্ঞান মানুষকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহর সন্ধান দেয়,

যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও অনুগত বানায়–সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। যে বিদ্যা মানুষকে নাস্তিকতা, পথভ্রষ্টতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দিকে টেনে নিয়ে যায় সে বিদ্যাকে কখনো জ্ঞান বলা যায় না। সে শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদেরকে 'সুশিক্ষিত' নয়; বরং 'কুশিক্ষিত' বলতে হবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে শুধু সেসব সৌভাগ্যবান জ্ঞানীদের কথাই বলা হয়েছে, যাদের অন্তর সত্যিকার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত। যাদের কাছে তাদের প্রভু মালিকের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তারা তাঁর কাছে একান্ত বিনয়ের সাথে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের অন্তরে যথার্থ অর্থে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়েছে। এরাই সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী। এদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে যে, 'যারা জানে আর যারা জানে না, যারা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন আর যারা অন্ধ তারা কি সমান হতে পারে'? যে জ্ঞান ঈমানের আলোয় আলোকিত নয়, যে জ্ঞান ঈমানের ঝরনাধারা নয় আল কুরআন সে জ্ঞানের মোটেই প্রশংসা করেনি। ঈমানহীন বিদ্যানদেরকে কিছুতেই কুরআন যথার্থ অর্থে আলেম বা জ্ঞানী বলে স্বীকার করে না।

তবে সাথে সাথে একটা বিষয়ও আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, আলোচ্য বিষয়টি জ্ঞানের মূলনীতি হলেও জ্ঞানের পরিধি কিন্তু শুধু ঈমান সম্পর্কিত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শুধু আকিদা-বিশ্বাস এবং শরিয়তের মাসআলা মাসায়েলই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যে প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বপ্রকৃতি চলে সেই বিদ্যা এবং মানুষের ওপর অর্পিত খেলাফতের তথা বিশ্বমানবতাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিদ্যাও এই জ্ঞানের আওতাভুক্ত।

যাদের রুচি ও প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে তারাই শুধু বিশ্বজাহানের একক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সন্ধান খুঁজে পায় না। আর এটা বৈজ্ঞানিক বিদ্যার কোনো ত্রুটি নয়, বরং এটা তাদের মস্তিষ্ক ও স্বাভাবিক মানবিক প্রকৃতি বিকৃতির ফল। কেননা, পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা–এগুলোর প্রত্যেকটিই আল্লাহর অস্তিত্বের দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্যদাতা। সঠিক অর্থে এসব বিজ্ঞানের আলো মানুষের ইনসাফ আরো গভীর করে।

বর্তমান বিশ্বে বৈজ্ঞানিক উন্নতির শীর্ষে অবস্থানকারী ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পেতে পারি। ইউরোপীয় বিজ্ঞান কেন আজ আল্লাহবিমুখ, কেন আজ নৈতিকতা বিমুখ, কেন আজ আদর্শ বিমুখ, কেন আজ ইসলাম বিদ্বেষী–এর পেছনে এক মর্মান্তিক ইতিহাস রয়েছে।

আসমানী দ্বীনের ধারক–বাহকদের যখন নৈতিক অবক্ষয় ঘটে তখন তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকেও পশ্চাতমুখী হয়ে পড়ে। যার কারণে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে তাদের দূরত্ব ও শত্রুতা বাড়তে থাকে। আর এই নৈতিক অবক্ষয় সত্ত্বেও সমাজের নেতৃত্ব যদি সেই আসমানী জ্ঞানের মিথ্যা দাবিদারদের হাতে থাকে, তাহলে

তারা হয়ে ওঠে চরম ভয়ঙ্কর, উগ্র, ধর্মান্ধ ও গোঁড়া। এ কারণে সমাজের সচেতন শ্রেণী, বিদ্যান ও জ্ঞানীগুণী এবং পর্যায়ক্রমে সর্বস্তরের জনগণের সাথে তাদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাতে আসমানী জ্ঞানের মিথ্যা দাবিদার ও পশ্চাতমুখী ধর্মান্ধদের পরাজয়ও সুনিশ্চিত। ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছিলো ইউরোপের ইতিহাসে। সেখানকার জ্ঞানীগুণী, বিজ্ঞানী ও ধর্মীয় নেতৃত্বের মিথ্যা দাবিদার গীর্জার ধর্মযাজকদের মধ্যে একপর্যায়ে চরম মতবিরোধ দেখা দেয়। এ কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির গবেষণায় নিয়োজিত লোকেরা সবাই ধর্মযাজকদের প্রতি এবং স্বাভাবিক কারণেই ধর্মের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তাদের এই বিজ্ঞান গবেষণা সম্পূর্ণ ধর্মবিমুখ বরং ধর্মবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে যখন রাজনৈতিকভাবে ওই গীর্জার ধর্মযাজকদের পতন ঘটে তখন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার পুরোটাই দখল করে নেয় ধর্মবিদ্বেষী জ্ঞান-বিজ্ঞান। কিন্তু তারা কখনো এটা ভেবে দেখেনি যে, তারা যেসব ধর্মযাজকদের গোঁড়ামী ও পশ্চাতমুখিতার কারণে ধর্মবিরোধী হয়ে উঠলো তারাও সত্যিকার অর্থে ধার্মিক নয় ; বরং ধর্মব্যবসায়ী। ধর্মকে পুঁজি করে তারা তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আসমানী গ্রন্থের বিকৃতিসাধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন–এসবের মাধ্যমে তারা মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া আদর্শকে বিকৃত করে ফেলেছে এবং নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

এ কারণে ইউরোপীয় চিন্তাধারা পুরোটাই প্রবাহিত হয় ধর্মবিরোধী ধারায়, আকিদা-বিশ্বাস, নীতি-আদর্শ, মনুষ্যত্ব, মানবতাবোধ সবই ভেসে যায় এই স্রোতে। পদার্থ, রসায়ন, অধিবিদ্যা, দর্শন, শিল্পকলা, কারিগরী, মহাকাশবিদ্যা–যতো বিদ্যাই তারা অর্জন করেছে তাদের ধর্মবিমুখতা, ধর্মবিরোধিতা, ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব ততোই বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্ধভাবে ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে এবং যুগ যুগ ধরে একইভাবে তাদের এই অন্ধ বিরোধিতা চলছে। তাই ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে গোটা ইসলামি সমাজকে নাস্তিকতার অন্ধগলিতে টেনে নেয়ার জন্য তাদের প্রচেষ্টা সারাক্ষণই অব্যাহতভাবে চলছে।

আশা করি, এতোক্ষণের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পাশ্চাত্যের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে যদিও আজ পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রেও মুসলমানদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন তারা এসব বিদ্যা শেখানোর মধ্য দিয়ে নাস্তিকতানির্ভর কোনো চিন্তার বীজ আমাদের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দিতে না পারে। আর ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কাছে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ইসলামি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের ওপর নির্ভর করা হবে আত্মহত্যার শামিল এবং সীমাহীন অপরাধ।

নবম অধ্যায়

ইসলামি জাতীয়তাবাদের রূপরেখা

ইসলাম পৃথিবীতে নিছক অন্তরে লালিত অনুভূতি হয়ে থাকতে আসেনি ; বরং আকিদা-বিশ্বাসসহ মানুষের গোটা জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, পারস্পরিক সম্পর্ক সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে এসেছে। তাই ইসলাম যখন এসেছে তখন থেকেই সে তার অনুসারীদের জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কার সাথে সম্পর্ক গড়বে, কার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। কাকে ভালোবাসবে, কাকে ঘৃণা করবে। কী গ্রহণ করবে, কী বর্জন করবে। এক্ষেত্রে যে মূলনীতি ইসলাম স্থাপন করেছে তা হলো–

'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা'।
'আল্লাহর জন্য গ্রহণ করা, আল্লাহর জন্যই বর্জন করা'।

অর্থাৎ গ্রহণ-বর্জন, ঘৃণা-ভালোবাসার নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করবেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। কেননা, এই বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছাতেই জন্মগ্রহণ করেছি। সম্পর্ক স্থাপনের ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে তোলার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে মূলনীতি ঘোষণা করেছেন তা দুনিয়ার কোনো তুচ্ছ অর্থবিত্ত, রক্ত-বংশ, গোত্র, জাতীয়তা নয় ; বরং তা হলো ঈমান। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এই একটি বন্ধনই মানুষকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে, হৃদয়ে হৃদয়ে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। অন্য সকল সম্পর্কই ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক। পরিবেশ পরিস্থিতি ও কালের আবর্তনে অন্যসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ঈমানের সম্পর্ক কোনোদিনই ছিন্ন হয় না। তাই তো আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

"(হে রাসূল) তুমি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে পাবে না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদিও সে সমস্ত (আল্লাহবিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিজেদের জাতি-গোত্রের লোকও হয়।"

(সূরা মুজাদালা, আয়াত ২২)

"যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে তারা সর্বদা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তাআলাকে) অস্বীকার করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের সপক্ষে। অতএব তোমরা যুদ্ধ করো শয়তান ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে ; (তোমরা সাহস হারিয়ো না, কারণ) শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল।"

(সূরা আন নিসা, আয়াত ৭৬)

সফলতার সিঁড়ি বেয়ে একটিমাত্র পথই মানুষকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকটে পৌঁছে দেয়। সেই পথটি হলো 'সিরাতুল মুস্তাকীম'। অন্য সকল পথই মানুষকে

আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে গোমরাহীর পথে নিয়ে যায়। তাই তো কুরআনে আল্লাহ বলেছেন–

“এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ ও সরল পথ, অতএব একমাত্র এই (পথেরই) তোমরা অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না। কেননা, (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেবে। এটা (আরো কয়টি নির্দেশ) আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন (যেন তোমরা এগুলো মেনে চলো)। আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহ তাআলাকে) ভয় করবে।”

(সূরা আল আনআম, আয়াত ১৫৩)

একটিমাত্র জীবনব্যবস্থাই মানুষের জন্য অনুমোদিত। একটিমাত্র জীবনব্যবস্থাই মানুষকে ইহকাল ও পরকালে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সফলতা দিতে পারে। তা হলো ইসলাম। এটাই হল একমাত্র আলোকিত পথ। অন্য সবই জাহেলিয়াত, অন্ধকার, অজ্ঞতা, মূর্খতা ও পাশ্চাত্যমুখিতা। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন–

“তবে কি তারা পুনরায় জাহেলি শাসনব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) বিশ্বাস করে তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার চাইতে উত্তম শাসক আর কে হতে পারে?”

(সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৫০)

একটিমাত্র শরিয়ত তথা আইনব্যবস্থা মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। সেটা হলো শুধু আল্লাহর দেয়া শরিয়ত বা আইনব্যবস্থা। অন্য সবই মানুষের স্থূল ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টির আলোকে রচিত নিছক কিছু আন্দাজ-অনুমান, যা মানুষের জীবনকে শুধু জটিলই করে তোলে। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন–

“(হে নবী) আমি তোমাকে দ্বীনের এক (বিশেষ) পদ্ধতির ওপর এনে স্থাপন করেছি, অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো, (শরিয়তের ব্যাপারে) সে সব লোকদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করো না যারা (আখিরাত সম্পর্কে) কিছুই জানে না।”

(সূরা জাছিয়া, আয়াত ১৮)

পৃথিবীতে যতো মত পথ আছে তন্মধ্যে একটি পথই সত্য। একটি পথই আলোকিত। অন্য সবই মিথ্যা, গোমরাহী, মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন–

“সত্য আসার পর তাকে না মানা গোমরাহী নয় তো কী? সুতরাং, (তাকে বাদ দিয়ে) তোমরা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছ?” (সূরা ইউনুস, আয়াত ৩২)

শুধু মুখে মুখে দাবি করলেই কোনো দেশ ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে যায় না। কেবল সেই রাষ্ট্রই ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে যেখানে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে আল্লাহর দেয়া শরিয়ত আইন হিসেবে প্রচলিত। এটা

ব্যতীত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা মানবরচিত যে মতবাদ দ্বারাই শাসিত হোক না কেন, অন্য সকল রাষ্ট্রই কুফরী রাষ্ট্র এবং 'দারুল হারব'।

এসব দারুল হারবের সাথে সত্যিকার মুসলমানরা কিছুতেই স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে পারে না। এ ধরনের রাষ্ট্রের সাথে দু'ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে। হয় তাদের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকবে, নতুবা তাদের সাথে শরিয়তসম্মত শর্তাধীনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো চুক্তি থাকবে। তবে কোনো অবস্থায়ই এসব রাষ্ট্র 'দারুল ইসলাম' বা ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যারা ঈমান এনেছে, (এবং এই ঈমানের জন্য) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (মুজাহিদদের) আশ্রয় দিয়েছে ও (তাদের) সাহায্য করেছে তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু। (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করেনি, তারা যতোক্ষণ পর্যন্ত হিজরত না করে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই। (কখনো) যদি তারা (একান্ত) দ্বীনের খাতিরে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। (তবে তা) যেন এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না হয়, যাদের সাথে তোমাদের (কোনোরকম) চুক্তি রয়েছে। (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তাআলা তা সবই দেখেন। যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু, তোমরাও যদি (তাদের মতো একে অপরকে সাহায্য করার) সে কাজটি না করো, তাহলে আল্লাহর এ যমিনে ফিতনা-ফাসাদ ও বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যারা ঈমান এনেছে, এই ঈমানের জন্য হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা এই হিজরতকারীদের থাকার জায়গা দিয়েছে এবং (তাদের) সাহায্য করেছে (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মুমিন; এদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে। আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

(সূরা আল আনফাল, আয়াত ৭২-৭৫)

উল্লিখিত ধরনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিধান নিয়ে ইসলাম এসেছে। ইসলাম তার সিদ্ধান্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার লুকোচুরি বা অস্পষ্টতার আশ্রয় নেয়নি এবং নেয়ার কোনো প্রয়োজনও নেই। কারণ ইসলামে গোঁজামিল দেয়ার কিছু নেই। তাই ইসলাম সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছে যে, যে ভূখণ্ডে আল্লাহর আইন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, যে দেশের মানুষ তাদের সবকিছুকে আল্লাহর দেয়া নীতি– আদর্শের মানদণ্ডে যাচাই করে, যে দেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক একমাত্র ঈমানের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়, সেই দেশই মুসলমানদের 'স্বদেশ' হতে পারে। রক্ত, বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, অর্থবিত্ত বা নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করার দাবিতে নয় ; বরং মুসলমানরা একমাত্র ঈমানের দাবিতেই এই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার দাবি করতে পারে। ঈমানই

একজন মানুষকে দারুল ইসলামের সদস্য বানাতে পারে। অন্য কোনো যোগ্যতাই এখানে বিবেচ্য নয়, গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমান– আকিদার বন্ধন ছাড়া মুসলমানদের জন্য অন্য কোনো বন্ধন নেই, আত্মীয়তা নেই, সম্পর্ক নেই। এমনকি রক্ত সম্পর্কের বাবা মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনও ঈমানহীনতার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অথচ এই আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তা থেকে (তার) জুড়ি (স্ত্রী) পয়দা করেছেন, (এরপর) যিনি তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে বহুসংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায় চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন; (হে মানুষ) তোমরা ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে যার (পবিত্র) নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার (ও পাওনা) দাবি করো এবং (সম্মান করো) গর্ভ-ধারিণী (মা)কে।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ১)

মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম যদিও মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহারের কড়া নির্দেশ দিয়েছে এবং আল্লাহর ইবাদতের পরেই এর গুরুত্ব প্রদান করেছে ; তবে এই বাবা মা-ও যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যায়, ইসলামের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার কাজ করে, ইসলামের শত্রুদের সারিতে গিয়ে দাঁড়ায়, বাতিলশক্তির পক্ষ অবলম্বন করে, তাহলে সেই পিতা-মাতার সাথেও চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোর নির্দেশ দেয়। রক্তের বন্ধনও মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যায় এবং এ পর্যায়ে বাবা-মা হলেও তারা শত্রু হিসেবে অন্য সবার সাথে একই রকম ব্যবহার পাবে।

এ বিষয়ে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ইবনে যিয়াদের বর্ণনাসূত্রে ইমাম ইবনে জারির বলেন, (কোনো এক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই মুনাফিকের সাথে আল্লাহর নবীর মতবিরোধ হওয়ার একপর্যায়ে সে এই কথাটি বলেছিলো) আল্লাহর নবী (স) আবদুল্লাহ (রা)-কে ডেকে বলেন, তুমি কি জানো তোমার বাবা কী কী বলেছে? তিনি বলেন, আমার বাবা-মা আপনার প্রতি কোরবান হোক! দয়া করে আমাকে বলবেন, তিনি কী কী বলেছেন? আল্লাহর নবী বললেন, 'সে বলেছে যে, মদিনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা নীচ ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেবে।' আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! সে তো ঠিক কথাই বলেছে। কেননা, আল্লাহ সাক্ষী যে, আপনিই সবচেয়ে বেশি সম্ভ্রান্ত (আর সে অবাঞ্ছিত)। ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদিনায় সবাই জানে যে, আপনি মদিনায় আসার আগে আমি আমার বাবার কী বাধ্যগত ছিলাম! আমার চেয়ে বাবার বেশি অনুগত কেউ এই অঞ্চলে ছিলো না, কিন্তু আমি আজ নিজ হাতে সেই বাবার মাথাটা কেটে ফেললে যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল খুশি হন, তাহলে আমি এই মুহূর্তেই তা করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু রাসূল (স) তাকে নিষেধ করে বলেন, 'না, তুমি কিছুতেই এমনটি করো না'।

যুদ্ধ থেকে ফিরে মুসলিম বাহিনী মদিনায় প্রবেশের সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে মদিনায় প্রবেশের পথে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার বাবা যখন মদিনায় প্রবেশ করতে গেলেন অমনি তাকে রুখে দিয়ে বললেন, 'তুমি কি বলেছিলে যে, এবার মদিনায় এসে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা লাঞ্ছিতদেরকে তাড়িয়ে দেবে?' যদি বলেই থাকো, তাহলে এক্ষুণি বুঝতে পারবে কে সম্ভ্রান্ত, তুমি–না আল্লাহর রাসূল (স)। আল্লাহর কসম! যতোক্ষণ আল্লাহর রাসূল নিজে অনুমতি না দেবেন ততোক্ষণ তুমি মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না, আর আমার হাত থেকেও তোমার মুক্তি নেই। ভড়কে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই খাজরায গোত্রের লোকদের ডেকে বলতে থাকে, দেখো কী অবস্থা! আমার ছেলেই আমাকে আমার বাড়িতে যেতে দিচ্ছে না। অনেকে আব্দুল্লাহ (রা)কে থামাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আবদুল্লাহ (রা) তার সিদ্ধান্তে অটল। তিনি একই কথা বলছেন যে, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (স) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছুতেই মদিনায় প্রবেশ করতে দেবো না। অবশেষে কয়েকজন লোক ঘটনাটি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে বললে তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহকে বলো তার বাবাকে বাড়িতে ফিরে যেতে সে যেন বাধা না দেয়। আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে তাকে এ কথা বলা হলে তিনি বলেন, হাঁ, আল্লাহর রাসূলের অনুমতিক্রমে সে এবার মদিনায় প্রবেশ করতে পারে।

এটা হলো মুসলমানদের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ এবং সম্পর্ক গড়ার এক উজ্জ্বল নমুনা। এখানে কোনো কিছুকেই প্রাধান্য দেয়া হয়নি একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা ও ঈমান ব্যতীত। এ দু'টোই মুসলমানদের বন্ধন ও আত্মীয়তা নির্ণয় করে। রক্ত, বংশ, গোত্রীয় কিংবা আঞ্চলিক কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ঈমানের সম্পর্কের ভিত্তিতে মুসলমানরা একে অপরের এতো আপনজন, এতো প্রিয়জনে পরিণত হন যে, আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্ককে একান্ত আপন ভাইয়ের সম্পর্ক আখ্যায়িত করেছেন–

"নিশ্চয়ই মুমিনরা একে অপরের ভাই"। (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১০)

কথাটি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। সবচেয়ে কম কথায় আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে নিকটতম ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে মূলত তিনি সম্পর্কের ধরন ও গভীরতা কেমন হবে সে ব্যাপারে একটি স্থায়ী মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

"যারা ঈমান এনেছে, (এবং এই ঈমানের জন্যই) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (মুহাজিরদের) আশ্রয় দিয়েছে ও (তাদের) সাহায্য করেছে তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু।"

(সূরা আল আনফাল, আয়াত-৭২)

এ আয়াতে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও একে অপরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তা শুধু নির্দিষ্ট কোনো প্রজন্মের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং প্রজন্ম ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে ঈমানদাররা একইসাথে পূর্ববর্তী ও অনাগত ভবিষ্যৎ মুমিনদের প্রতিও আন্তরিক ভালোবাসা বজায় রাখবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও ধারাবাহিকভাবে এই ভ্রাতৃত্ববোধ চালু থাকবে। আগে পিছে বলে কোনো কথা নেই, ঈমান থাকাটাই এখানে বিবেচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যারা মুহাজিরদের আগমনের আগ থেকেই এ (জনপদ)-কে (নিজেদের) নিবাস বানিয়েছিল এবং যারা (এদের আসার) আগেই ঈমান এনেছিল তারা অত্যন্ত ভালোবাসে যারা হিজরত করেছে তাদের। (রাসূলের পক্ষ থেকে) তাদের (মুহাজির সাথীদের) যা কিছু দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে কোনো রকমের প্রয়োজন অনুভব করে না। (শুধু তাই নয়) তারা তাদের (মুহাজির সাথীদের) প্রয়োজনকে সর্বদাই নিজেদের (প্রয়োজনের) ওপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের নিজেদেরও রয়েছে (অনেক) অভাবগ্রস্ততা। (আসলে) যাকে তার মানসিক কৃপণতা (সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে তারাই হচ্ছে সফলকাম। যারা তাদের (মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে এরা (সব সময়ই) বলে, হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও এবং আমাদের পূর্বে আমাদের যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তুমি তাদেরও মাফ করে দাও এবং আমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনোরকম হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের মালিক! তুমি অনেক মেহেরবান ও পরম দয়ালু।" (সূরা আল হাশর, আয়াত -৯)

ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি হলো ঈমান

এতোক্ষণ আমরা নির্দেশনামূলক পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে বিষয়টি আলোচনা করলাম। এবার আমরা বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবো। আল্লাহ তাআলা কুরআনে অতীত নবী-রাসূলদের সময়ের কিছু ঘটনা তুলে ধরেছেন। এসব ঘটনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো অতীতের সেই মুসলমানরা কীভাবে ঈমানের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং ঈমানহীনতার কারণে কীভাবে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ঈমানের দাবিতে একজন অচেনা-অচেনা মানুষ কীভাবে মুসলিম সমাজের সকলের আপনজনে পরিণত হয় ; আবার ঈমান না থাকার কারণে কীভাবে স্ত্রী, পুত্র, বাবা, ভাইয়ের মতো আপনজনেরাও পর হয়ে যায়। এ ঘটনাগুলোতে আমরা দেখতে পাবো, অতীতের সকল নবী-রাসূলগণ একমাত্র ঈমানের ভিত্তিতে কীভাবে মুসলিম কমিউনিটি গড়ে তুলেছিলেন।

এ পর্যায়ে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলের ঘটনা। পিতা-পুত্র সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তারা কুরআনের ভাষায় একে অপরের পরিবারভুক্ত নয় তা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে–

"নূহ (তার ছেলেকে ডুবতে দেখে) তার মালিককে ডেকে বললো, হে আমার মালিক! আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের একজন সদস্য, (আমার আপনজনদের ব্যাপারে) তোমার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর তুমিই হচ্ছ সর্বোচ্চ বিচারক।"

(সূরা হুদ, আয়াত ৪৫)

এরপরে আসছে ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার প্রসঙ্গ,

"(আরো স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কতিপয় বিষয়ে (তার আনুগত্যের) পরীক্ষা নিলেন এবং সে কামিয়াব হলো। আল্লাহ তাআলা বললেন, এবার আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য নেতা বানাতে চাই। সে বললো, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরও (কি নেতা হিসেবে বিবেচিত হবে?) ? আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার এ প্রতিশ্রুতি যালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১২৪)

"ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে আমার মালিক! এই শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যারা আল্লাহ তাআলা এবং পরকালে বিশ্বাস করে তুমি তাদের ফলমূল দিয়ে আহারের যোগান দাও। আল্লাহ তাআলা বললেন, (হাঁ,) যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিনের জীবনের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করতে থাকবো। অতঃপর অচিরেই আমি তাদের জাহান্নামের আগুনের আযাবের দিকে নিক্ষেপ করবো, যা সত্যিই নিকৃষ্টতম স্থান।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১২৬)

এরপর আসছে নিজ জাতি, নিজ পরিবারের পথভ্রষ্টতার সাথে তার চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনা, তখন তিনি বলেছিলেন–

"আমি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি এবং (আলাদা হয়ে যাচ্ছি) আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো (তাদের কাছ থেকেও); আমি তো আমার মালিককেই ডাকতে থাকবো। (আশা করি) আমার মালিককে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হবো না।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৪৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার অনুসারীদের কর্তৃক তাদের জাতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনাকে মুমিনদের জন্য বিশেষ অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে বলেন–

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের (ঘটনার) মাঝে রয়েছে (অনুসরণীয়) আদর্শ। তারা তাদের জাতিকে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর বদলে যাদের উপাসনা করো তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। আমরা

তোমাদের এসব দেবতাদের অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মাঝে (এখন থেকে) চিরদিনের জন্য এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো–যতোদিন না তোমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ বলে স্বীকার করবে।"

(সূরা আল মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

আসহাবে কাহ্ফ হিসেবে খ্যাত যে ঈমানদার যুবকদের ঘটনা আল কুরআন তুলে ধরেছে তা এক বিরাট তাৎপর্য বহন করে। তারা যখন বুঝতে পেরেছিলো যে, তাদের জাতির নৈতিক, চারিত্রিক ও ঈমানী অধঃপতন এতো চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের সাথে একই সমাজে বসবাস করে ঈমান বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তখন তারা শুধু ঈমানের স্বার্থে এবং ঈমান নামক সম্পদ হিফাযত করার জন্য বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ সবকিছু ছেড়ে হিজরত করেন। কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ, অর্থসম্পদ, বিত্তবৈভব নয় ; শুধু ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার স্বার্থেই তারা ত্যাগের এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাদের ঘটনা তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"কয়েকজন যুবক যারা তাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছিল। আমি তাদেরকে হিদায়াতের পথে এগিয়ে নিয়েছিলাম, আমি তাদের অন্তঃকরণকে (ধৈর্য দ্বারা) দৃঢ়তা দান করেছি; যখন তারা (আল্লাহর পথে) দাঁড়িয়ে গেলো এবং ঘোষণা করলো যে, আমাদের মালিক তো হচ্ছেন তিনি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক। আমরা কখনোই আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কাউকে ডাকবো না; যদি (আমরা) এমন (অযৌক্তিক) কথা বলি তাহলে (নিঃসন্দেহে তা হবে) গর্হিত একটি কাজ। এরাই হচ্ছে আমাদের স্বজাতির লোক যারা তাকে বাদ দিয়ে অসংখ্য মাবুদ গ্রহণ করেছে। (তারা যদি সত্যনিষ্ঠ হয় তাহলে) তাদের কাছে স্পষ্ট দলিল নিয়ে আসে না কেন? তার চাইতে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যা আরোপ করে? (অতঃপর জোয়ানরা পরস্পরকে বললো) আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যদের যারা মাবুদ বানায় তাদের (সবার) কাছ থেকে তোমরা যখন নিজেরা বিচ্ছিন্নই হয়ে গেলে, তখন (এখান থেকে বের হয়ে বিশেষ) একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তোমাদের মালিক তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের ছায়া বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের (পুনরায় জনপদে ফিরে আসার) কাজে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করবেন।"

(সূরা আল কাহফ, আয়াত ১৩-১৬)

এরপর রয়েছে হযরত নূহ ও লূত (আ.)-এর ঘটনা। তারা দু'জন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ঈমানী পরিবারের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে নবীদের সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কোনোই কাজে আসেনি। এই দুই হতভাগ্য নারীর উপমা তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"আল্লাহ তাআলা কাফিরদের জন্য নূহ ও লূত-এর উদাহরণ পেশ করছেন, তারা দু'জনেই ছিল আমার দু'জন নেক বান্দার স্ত্রী। কিন্তু তারা উভয়েই সে দু'জন বান্দার

সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে আল্লাহর (আযাব) থেকে নূহ ও লূত কোনোক্রমেই এদের বাঁচাতে পারলো না; বরং (তাদের ব্যাপারে আল্লাহর) হুকুম (ঘোষিত) হলো–তোমরা (আজ) প্রবেশ করো জাহান্নামের আগুনে (আরো যারা এখানে প্রবেশের উপযুক্ত) তাদের সবার সাথে।" (সূরা আত তাহরীম, আয়াত ১০)

এই ঘটনার ঠিক বিপরীত মেরুতে রয়েছে মিশরের ইতিহাসখ্যাত যালিম শাসক ফেরআউনের স্ত্রীর ঘটনা। এই মহীয়সী নারীর স্বামী কাফির ও যালিম হওয়া সত্ত্বেও তার হৃদয় ছিল ঈমানের আলোয় আলোকিত। তাই তার স্বামীর কুফরী, শিরকী ও পাপাচারও তার জীবন ও ঈমানকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করতে পারেনি। এই মহীয়সী নারীর উপমা তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"(একইভাবে) আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীকে (অনুকরণযোগ্য) এক উদাহরণ হিসেবে পেশ করছেন। (সে প্রার্থনা করেছিলো) হে আমার মালিক! জান্নাতে তোমার পাশে তুমি আমার জন্য একখানা ঘর বানিয়ে দিয়ো। আর (দুনিয়ার এই ঘরেও) তুমি আমাকে ফেরাউন ও তার (যাবতীয়) কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচিয়ে রেখো, তুমি আমাকে এ যালিম সম্প্রদায়ের (যাবতীয় অনাচার) থেকে উদ্ধার করো।"

(সূরা আত তাহরীম, আয়াত ১১)

এসব ঘটনার আলোকে আল-কুরআন মুসলমানদের কাছে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত আত্মীয়তা, জাতীয়তা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছে। কোনোরকম অস্পষ্টতা রাখেনি, কোনোরকম জড়তা ও জটিলতা রাখেনি। নূহ (আ)-এর ঘটনায় পুত্র ও স্ত্রী ত্যাগের উদাহরণ, ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় জন্মভূমি, পুত্র, পারিবারিক সম্পর্ক ত্যাগের উদাহরণ। আসহাবে কাহফের ঘটনায় তো একই সাথে সবকিছু ত্যাগের উদাহরণ রয়েছে। পিতামাতা, দেশ, গোত্র, আত্মীয়স্বজন, ধন-সম্পদ সবকিছুই তারা বিসর্জন দিয়েছেন ঈমানের জন্য। হযরত নূহ (আ), লূত (আ) ও পাপিষ্ঠ ফেরাউনের কাহিনীতে দাম্পত্য সম্পর্কের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এসব ঘটনার সারমর্ম একটাই। এসব ঘটনা উপস্থাপন করে আল্লাহ তাআলা আখেরী নবীর উম্মতকে একটি কথাই বুঝিয়েছেন যে, ঈমানের পথ থেকে কেউ স্বেচ্ছায় সরে গেলে তার সাথে মুমিনের আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

মধ্যমপন্থী উম্মত

পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারী মুমিনগন কোন্ নীতিতে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়তেন এবং কোন্ নীতিতে সম্পর্কচ্ছেদ করতেন তা আলোচনার পর যে উম্মতকে 'উম্মতে ওসাত' বা মধ্যমপন্থী উম্মত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে তাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। এই উম্মতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এমন অনেক ঘটনা, অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যা একেবারে সেই পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের ঘটনার মতোই। আসলে এদের সবার দৃষ্টান্ত তো একরকম হওয়ারই

কথা। কেননা, এরা সকলেই তো একই পথের পথিক, একই উৎস থেকে আলোকপ্রাপ্ত, একই সত্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এই মধ্যমপন্থী উম্মতের সদস্যদের আমরা দেখতে পাই যে, যখন তারা ঈমান গ্রহণ করেছেন তখন তাদের আত্মীয়স্বজনদের ভেতরে যারাই সরাসরি ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, তাদের সাথে তারা চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। একই গোত্র, একই বংশ, একই পরিবারের লোক হওয়া সত্ত্বেও তারা শুধু ঈমানের দাবিতে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন—

"(হে রাসূল) তুমি আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে কখনো পাবে না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদিও সে সমস্ত (আল্লাহবিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয়। এই (আপসহীন) ব্যক্তিরাই হচ্ছে সে তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ঈমানের ছাপ এঁকে দিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (সর্বোপরি) আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, এরা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিজস্ব বাহিনী। আর হাঁ, আল্লাহর বাহিনীই (শেষতক) কামিয়াব হয়।" (সূরা মুজাদালা, আয়াত ২২)

আমরা স্বয়ং আল্লাহর নবী থেকে নিয়ে শুরু করে সাহাবাদের সকলের মাঝে আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই আবু জেহেল, আবু লাহাব, আল্লাহর রাসূলের চাচা হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে আকিদা-বিশ্বাসের কারণেই আল্লাহর নবীর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বদর যুদ্ধে সাহাবীগণ নিজেদের স্বগোত্রীয় লোকজন, বাবা, ভাই ও রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অথচ মদীনার মুহাজিররা রক্ত, বংশ ও গোত্রীয় দিক থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঈমান-আকিদার বন্ধনের কারণেই তারা হয়ে যান একান্ত আপনজন, একান্ত ঘনিষ্ঠজন। রক্তসম্পর্কের আপন ভাইয়ের চেয়েও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর ও মজবুত সম্পর্ক। আরব অনারব নির্বিশেষে সকল জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ চিন্তার উর্ধ্বে উঠে তারা সকলে মুসলমান হিসেবে গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। রোমের সোহায়ব, পারস্যের সালমান, আবিসিনিয়ার বেলাল (রা)-প্রমুখের বিষয়টি চিন্তা করুন! তারা তো মক্কা-মদীনার অধিবাসী ছিলেন না। কিন্তু আরবে তাদের কোনো পাসপোর্ট ভিসার প্রয়োজন হয়নি। মুসলমান পরিচয়ই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। মমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, এতোটুকুই যথেষ্ট। আর তারাও তাদের গোত্র, বংশ, জন্মস্থান, মাতৃভাষা এসব জাতীয়তাবাদী গৌরবকে ঈমানের সামনে কুরবান করেছেন। সবার একই পরিচয়— মুসলমান। সবার একই জীবনবিধান— আল কুরআন। জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ

চিন্তাকে আল্লাহর রাসূল এতো ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের প্রতি আহ্বান জানায়, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বের কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয় এবং যে ব্যক্তি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ওপর মারা যায়, সেও আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়।'

দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সঠিক সংজ্ঞা

ইসলাম মানুষের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সাম্য স্থাপন করতে চায় তার প্রয়োজনেই সকল প্রকার বিদ্বেষ, বিভেদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কবর রচনা করে দিতে সে বদ্ধপরিকর। ইসলাম সকল মানুষকে স্বার্থবাদী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে উঠিয়ে এক মহান শাশ্বত আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। সংকীর্ণতার এই গণ্ডি ভেঙ্গে দিয়ে মুসলমানরা যখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে দিগন্ত বলয়ে প্রসারিত করে তখনই মুসলমানদের আবাসভূমি 'দারুল ইসলাম' নাম ধারণ করে। এই আবাসভূমি কোনো নির্দিষ্ট গোত্র, বংশ, জাতি, গোষ্ঠীর নয়; এই আবাসভূমি সকল মুসলমানদের। এটা কোনো মানবরচিত সংবিধান নামক জঞ্জালের লালনক্ষেত্র নয়। এটা বিশ্বজগতের একচ্ছত্র সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া জীবনব্যবস্থার লালনক্ষেত্র তথা ইসলামের আবাসভূমি। এই ভূখণ্ডকে এ কারণেই দারুল ইসলাম বলা হয় যে, এখানে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, কোর্টকাচারি, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর শরিয়তের আইনই স্বীকৃত। এই ইসলামি রাষ্ট্রের সুশীতল ছায়াতলে যারা আশ্রয় নেয় তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। এই ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা কিংবা এর সীমানা সম্প্রসারণ করতে গিয়ে যারা জীবন দেয় তাদেরকে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় 'শহীদ'। বংশ, গোত্র, জন্মস্থান, ভাষা, অর্থবিত্ত এখানে কোনো প্রশ্ন নয়। যারাই ইসলাম গ্রহণ করবে, যারাই আল্লাহর আইন মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেবে তারা সকলেই এই রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণের আইনগত অধিকার রাখে। এরা সকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দারুল ইসলামের নাগরিক। তবে কোনো বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ না করেও ইসলামি শাসনব্যবস্থা মেনে নিয়ে জিম্মী হিসেবে কর (জিযিয়া) দিয়ে দারুল ইসলামে বসবাস করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেও মুসলমানদের মতোই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল হরিচরণ, জোসেফরাও যেমন 'শহীদ' হয় তেমনি মানবরচিত আইনে শাসিত দেশগুলোকেও ইসলামি রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়, যা রীতিমতো হাস্যকর। কিন্তু একজন সচেতন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যে দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত নয়, যেখানে ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত নয়, সে দেশ নিঃসন্দেহে দারুল হারব। আর দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকা প্রতিটি মুসলমানেরই ঈমানী দায়িত্ব। এই দারুল হারব যদি তার

জন্মভূমি হয়, সেখানে যদি তার আত্মীয়স্বজনরা বসবাস করে, সেখানে যদি বৈষয়িক কোনো স্বার্থ জড়িয়ে থাকে তবুও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এই দেশের (প্রশাসনের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে মুসলমানরা কখনো পিছপা হতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে, একজন মুসলমানের কাছে একটি ভূখণ্ড কেবল তখনই বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে যখন সে ভূখণ্ডে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুফরী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে নিছক জন্মস্থান বা মাতৃভূমি হওয়ার কারণে কোনো দেশ মুসলমানদের আক্রমণ থেকে বেঁচে যেতে পারে না। মক্কা নগরী ছিলো আল্লাহর রাসূলের জন্মভূমি, তার আত্মীয়স্বজন সকলেই সেখানে বসবাস করতো, তার সাথী-সঙ্গীদের অনেকেরই বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি মক্কাতেই ছিলো; কিন্তু তবুও তিনি মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। মক্কা নগরীর ইতিহাস আপনাদের সকলেরই জানা। কতো নবী-রাসূল এখানে আগমন করেছেন, আল্লাহর পবিত্র ঘরটিও এখানেই অবস্থিত, তবুও আল্লাহর দেয়া শাসনব্যবস্থা, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না থাকায় সেই পবিত্র নগরীও 'দারুল ইসলাম' বা ইসলামি রাষ্ট্র বলে গণ্য হয়নি। এটাই হলো ইসলামের দাবি। এ ব্যাপারে ইসলাম আপসহীন। মন্ত্র জপার মতো মুখ দিয়ে নিছক কিছু বাক্য পাঠ করা, মিলাদ মাহফিল, শবে বরাত, চল্লিশা, চেহলাম ইত্যাদি কিছু অনুষ্ঠান পালন করার নাম ইসলাম নয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ঈমানদার হওয়ার শর্তটিকে এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এখানে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই–

"না, আমি তোমার মালিকের শপথ করে বলছি! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালায় তোমাকে (তথা তোমার আনীত দ্বীনকে শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে; অতঃপর তুমি যা ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না ; বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ৬৫)

এই আদর্শের নামই ইসলাম। এই আদর্শ অনুযায়ী শাসিত ভূখণ্ডকেই বলে 'দারুল ইসলাম'।

যেসব জাহেলিয়াত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রেখেছিলো, ইসলাম এসে তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে। সংকীর্ণতার শেকল থেকে মুক্তি দিয়ে শাশ্বত মহাসত্যের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে পশুসুলভ অমানবিক আচরণ থেকে পবিত্র করে উদার ও মহৎ মানবীয় মূল্যবোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ইসলামই মানুষকে শিখিয়েছে যে, মাতৃভূমি বা জন্মস্থান হওয়ার কারণে যে ভূখণ্ডটিকে ভালোবাসবে তা নিছক কোনো ভূখণ্ড হলেই চলবে না, তাকে ইসলামের লালনক্ষেত্রও হতে হবে। যে জাতীয়তাকে মুসলমানরা তাদের পরিচয় মনে করে তা কারো মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তা নয়, রক্ত কিংবা

আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তাও নয়। মুসলমানদের জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে ওঠে একমাত্র আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে। তারা যে পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য রক্ত দেয়, সে পতাকা নিছক কোনো ভূখণ্ডের বা কোনো জাতির পতাকা নয়। যে বিজয়ের জন্য মুসলমানরা তাদের শেষ রক্তবিন্দুও ঢেলে দিতে প্রস্তুত তা নিছক কোনো সামরিক বিজয় নয়; এ বিজয় মহাসত্যের, এ বিজয় শাশ্বত সত্যের। তাই তো এ বিজয়ের মুহূর্তেও মুসলমানরা বিন্দুমাত্র অহঙ্কার প্রদর্শন করে না, লুটতরাজ চালায় না ; বরং যিনি এ বিজয় দিয়েছেন তাঁর প্রশংসা ও তাসবীহ তাহমীদে আরো গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়ে। আনুগত্য, কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য (ও বিজয়) আসবে তখন (তুমি দেখবে) মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হবে। তখন তুমি (বেশি বেশি) তোমার মালিকের প্রশংসা করো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো, অবশ্যই তিনি তওবা কবুলকারী।" (সূরা নাসর)

মনে রাখতে হবে, এ বিজয় কোনো বাতিল মতবাদ বা বাতিল শ্লোগানের ওপর ভিত্তি করে হয় না। এই বিজয় অর্জিত হয় শুধু ঈমানের পতাকাতলে। এখানে যে যুদ্ধ-জিহাদ করা হয় তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বাতিলপন্থীদের মতো ক্ষুদ্র কোনো বৈষয়িক স্বার্থ নয়। গনীমতের মাল, জবরদখল কিংবা নিছক কোনো দেশমাতৃকার নিরাপত্তার জন্যও এখানে জিহাদ করা হয় না; বরং যে ভূখণ্ডটিতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেই পবিত্র ভূখণ্ডটিকে রক্ষার জন্যই কেবল জিহাদ করা হয়। দুনিয়াবী খ্যাতি, বীরত্ব প্রদর্শন, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে এখানে কেউ জিহাদ করে না। এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই থাকে মুমিনদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তারা দেশের সাধারণ জনগণকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চায়, তবে সামরিক আক্রমণের চেয়ে বাতিল আকিদা-বিশ্বাস আক্রমণ করাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। দেশের জনগণের মধ্যে মানবরচিত পূতিগন্ধময় কোনো মতবাদের প্রভাব যেন কখনো না পড়ে সে জন্য সদা সর্বদা সতর্ক থাকে। মুসলমানদের জিহাদের আনুষঙ্গিক অনেক কারণ থাকলেও মূল উদ্দেশ্য সব সময়ই থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা)-এর বর্ণীত একটি হাদিস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদ করে, আরেকজন মানসম্মান পাওয়ার জন্য জিহাদ করে, আরেকজন মানুষকে দেখানোর জন্য জিহাদ করে–এদের মধ্যে কে উত্তম? কে আল্লাহর পথে লড়াই করে? রাসূল (স) বলেন, "(এদের কেউই উত্তম নয়, কেউই আল্লাহর পথে লড়ছে না)। একমাত্র যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে সে-ই শুধু আল্লাহর পথে

লড়ছে বলে বিবেচিত হবে।" 'আমরা সবাই অমুকের সৈনিক' 'অমুক আমাদের আদর্শ' এসব শ্লোগান সামনে রেখে গণতন্ত্র কিংবা জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়ে যদি শহীদের মর্যাদা পাওয়ার আশা করা হয়, তবে তা চাইতে হবে ঐসব মতবাদের আবিষ্কারকদের কাছে। আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার আশা করতে হলে তথা ইসলামের দৃষ্টিতে শহীদ বলে বিবেচিত হতে হলে তাকে একমাত্র আল্লাহর পথে লড়াই করেই জীবন দিতে হবে।

কোনো দেশে যদি আল্লাহর দেয়া কোনো একটি আইন পালনেও বাধা দেয়া হয়, ঈমান আকিদার মূলনীতির বিপক্ষে যদি রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন অবস্থান নেয়, তাহলে সে দেশ নিঃসন্দেহে 'দারুল হারব' বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সেই দেশে যদি কিছু মুসলমান বসবাস করে, মুসলমানদের আত্মীয়-স্বজনরা থাকে, তাদের ধনসম্পদ ও জায়গাজমি থাকে তবুও সেখানে যদি আল্লাহর শরিয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে ভূখণ্ড 'দারুল হারব' বলেই বিবেচিত হবে এবং নীতিগতভাবেই আলাদা কোনো ছাড় এ ভূখণ্ডের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে যে ভূখণ্ডে আল্লাহর দ্বীন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে সেখানে মুসলমানরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হয়, সেখানে তাদের পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু যদি না-ও থাকে, তবুও তা দারুল ইসলাম বলেই বিবেচিত হবে। একমাত্র এই দেশকেই মুসলমানরা স্বদেশ মনে করতে পারে। স্বদেশ বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র এই ধরনের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ভূখণ্ডের মানুষের মাঝে যে জাতীয়তা গড়ে ওঠে তা হলো আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইসলামি জাতীয়তা।

নিরপেক্ষতার সাথে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে-গোত্র, বর্ণ, বংশ, পরিবার ও ভৌগোলিক আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনাগুলো মূলত অন্ধকার যুগের মূর্খদের মস্তিষ্কপ্রসূত। সে সময় মানুষের কাছে নীতি আদর্শের গুরুত্ব হারিয়ে যাওয়ায় তারা এসব বিষয়গুলোকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায় মনে করে নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো, এগুলো মানুষের মাঝে ঐক্য তো প্রতিষ্ঠা করতে পারলোই না ; বরং ঘৃণা-বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (স.) এগুলোকে দুর্গন্ধময় লাশের সাথে তুলনা করেছেন। ওদিকে আরেক স্বার্থবাজ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় ইহুদিদের আমরা দেখতে পাই যে, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র দাবি করে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টায় লিপ্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের এই মিথ্যা দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের দাবি তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারেন এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, কোনো গোত্র বা বংশে বা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করার কারণে কেউই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে না; আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড হলো খালেস ঈমান ও আমল। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,

"এরা বলে, তোমরা ইহুদি কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। (হে নবী) তুমি বলো, ইবরাহীমের মতাদর্শই একনিষ্ঠভাবে (সত্যের ওপর) রয়েছে, আর সে কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।"

(সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৩৫)

এসব কোনো শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নয়। শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড যেহেতু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও আল্লাহকে ভয় করা–তাই যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর একান্ত অনুগত তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও শ্রেষ্ঠ জাতি। কারণ, এই মুসলমানরা সকল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ঈমানের ভিত্তিতে, আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে সাম্যমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখে। তাই তো আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সনদ দিতে গিয়ে বলেন–

"তোমরাই (এই দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে ; তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে।"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

আল্লাহর দেয়া এই মহান আদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে দলটি গড়ে উঠেছিলো, সেখানে আমরা দেখতে পাই আরবের আবু বকর, ওমর, ইথিওপিয়ার বেলাল, রোমের সোহায়ব, পারস্যের সালমান (রা) সকলেই সমান মর্যাদা, সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। তাদের এই মহান আদর্শ যারা অনুসরণ করেছিলেন তাদেরও আমরা দেখতে পাই বিশ্বমানবতার সামনে এক আদর্শ মডেল হিসেবে। গোত্র, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ এক অতুলনীয় মানবসমাজ তারা গড়ে তুলেছিলেন। তাদের জাতীয়তা ছিল তাওহীদ, তাদের স্বদেশ ছিলো দারুল ইসলাম। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছিল তাদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রযন্ত্রের মূলনীতি, আর কুরআন ছিলো সর্বোচ্চ সংবিধান।

ইসলামপন্থীদের ওপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কুপ্রভাব

বর্তমান সময়ের ইসলামি আন্দোলনগুলোর ব্যর্থতার পেছনে উল্লিখিত বিষয়ে আন্দোলনকর্মীদের ওপর জাহেলি চিন্তা-চেতনার প্রভাব অন্যতম কারণ। তাই স্বদেশ, জাতীয়তাবাদ, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলোচিত বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; বরং বলা যায় এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য এটাই পূর্বশর্ত। দীর্ঘদিন মানবরচিত শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকার কারণে তারা আজ এসব সংকীর্ণতা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে গেছে। তাই এই সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রথমে তাদের মনমগজ থেকে জাহেলিয়াতের সকল প্রভাব দূর করতে

হবে। দেশের পূজা, জাতির পূজা, স্বার্থের পূজা এ ধরনের বিভিন্ন দিক দিয়ে যেসব শিরক তাদের অজান্তেই তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সেগুলো থেকে প্রথমে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। শিরকের এই ধরনগুলোকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন খুবই সুন্দরভাবে তার কালামে একটি আয়াতে বলে দিয়েছেন। আন্দোলনকর্মীদের প্রত্যেকেরই আয়াতটি খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। আয়াতে শিরকের এ সকল উপাদানগুলোকে আল্লাহ তাআলা একদিকে রেখেছেন এবং ঈমানকে অন্যদিকে রেখেছেন এবং কে কোনটি গ্রহণ করবে সে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতাও তিনি মানুষকে দিয়েছেন। আয়াতটি হলো–

"(হে নবী) বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার-পরিজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য যা অচল হয়ে যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়িঘরসমূহ যেগুলোকে তোমরা (একান্তভাবে) কামনা করো, (এগুলোকে) যদি তোমরা আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি ভালোবাসো– তাহলে তোমরা আল্লাহর (পক্ষ থেকে তাঁর আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। (জেনে রেখো) আল্লাহ তাআলা কখনো ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সূরা তাওবা, আয়াত ২৪)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত প্রতিটি মুজাহিদের কাছে জাহেলিয়াত ও ইসলামের পার্থক্য রেখাটি অত্যন্ত স্পষ্ট থাকা চাই। তারা যে দিকে মানবজাতিকে আহ্বান জানাবে সে পথ সম্পর্কে তাদেরই যদি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে তারা মানুষকে কী বুঝাবে? তাই 'দারুল ইসলাম', 'দারুল হরব'-এর প্রকৃতি নিয়ে তাদের কোনোরকম জটিলতায় ভোগা উচিত নয়। কারণ, এসব মৌলিক ব্যাপারে যদি সামান্যতম কোনো সন্দেহ সংশয় বা অস্পষ্টতা থাকে তা পরবর্তীতে ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সকল বিভ্রান্তির সূচনা এ ধরনের অস্পষ্টতা ও সন্দেহ-সংশয় থেকেই হয়। তাই আবারও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি, যে দেশে আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়িত নয়, যে ভূখণ্ডের কোর্ট-কাচারী, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহর আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় না, সে দেশ বা সে ভূখণ্ড কিছুতেই ইসলামি রাষ্ট্র নয়। সে দেশ কিছুতেই মুসলমানদের স্বদেশ হতে পারে না। ঈমানের বাইরে সবই কুফর, ইসলামের বাইরে সবই জাহেলিয়াত, সত্যের বিপরীতে সবকিছুই মিথ্যা।

দশম অধ্যায়

আমূল সংস্কারই অনিবার্য ইসলামি দাওয়াতের পদ্ধতি

কোনো মানুষকে কোনো নতুন বিষয় সম্পর্কে প্রথমে ধারণা দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়টির স্বরূপ অবিকল তুলে না ধরে যদি কোনো গোঁজামিল দিয়ে বুঝানো হয়, তাহলে সেই গোঁজামিলের ধারণাটাই হয়তো তার মনে অংকিত হয়ে যেতে পারে, যা পরে তার জন্য চরম সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই নামধারী মুসলমান কিংবা অমুসলমান যাকেই ইসলামের দাওয়াত দেয়া হোক না কেন, তার সামনে ইসলামকে অবিকল সেইভাবেই তুলে ধরতে হবে, যেভাবে আল্লাহর রাসূল ইসলামকে নিয়ে এসেছেন। তার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে যে, ইসলাম মানবজীবন, সৃষ্টিজগৎ ইত্যাদি সম্পর্কে যে চিন্তা-চেতনা মানুষকে দিতে চায় তা মহাসত্য, শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল এবং এই শাশ্বত চিন্তা-চেতনার দাবি অনুযায়ী যে জীবনবিধান মানুষের জন্য প্রযোজ্য সে জীবন বিধানও মানবরচিত সকল জীবনব্যবস্থা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষ এবং মানবজীবন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত যত মতবাদ আবিস্কৃত হয়েছে তা সবই জাহেলি মতবাদ এবং ইসলাম প্রকাশ্যভাবেই সেগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ইসলামি জীবনব্যবস্থার খুঁটিনাটি কোনো নিয়ম-কানুনকে অনেক সময় বাহ্য দৃষ্টিতে মানুষের কাছে জাহেলি নিয়ম-কানুনের মতোই মনে হতে পারে। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, জাহেলিয়াতের সাথে তার সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই। যে মৌলিক নীতি ও আকিদা-বিশ্বাস থেকে নিয়মটির উৎপত্তি হয়েছে তা সম্পূর্ণই ভিন্ন। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে মানবরচিত কোনো মতবাদের সাথে ইসলামের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। কেননা, তা সবই হলো জাহেলিয়াত।

ইসলামের সর্বপ্রথম কর্মসূচি হলো, মানুষের চিন্তা-চেতনার আকিদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন করে তাকে ইসলামি চিন্তা-চেতনার ছাঁচে গড়ে তোলা। দ্বিতীয় কর্মসূচি হলো, যে শাশ্বত আকিদা-বিশ্বাস সে গ্রহণ করেছে সেই আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন পরিচালনার ব্যবস্থা করা। এই দু'টি দায়িত্ব মুসলিম সমাজের ওপর আল্লাহ তাআলা অর্পণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

"তোমরাই (এই দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে ; তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

"আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, (নাগরিকদের) তারা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ৪১)

সমাজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যতোই ঘোলাটে হোক না কেন, এসব পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে জাহেলিয়াতের সাথে আপস কিংবা সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করতে ইসলাম কস্মিন্‌কালেও অনুমতি দেয় না। অতীতেও দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না। জাহেলিয়াত যে যুগেরই হোক, যে মোড়কেই হোক, বাহ্যদৃষ্টিতে তা সমাজের সাথে যতোই সামঞ্জস্যশীল মনে হোক না কেন, জাহেলিয়াত জাহেলিয়াতই। এই সব জাহেলিয়াতকে চেনার একটি সহজ উপায় হচ্ছে, সকল জাহেলি মতবাদের মূলনীতি হলো আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন, জীবনবিধানকে তোয়াক্কা না করে নিজেদের যুক্তি বুদ্ধি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন-কানুন রচনা করে নেয়া। এক কথায় মানুষের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। আরো সহজ করে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর গোলামী ছেড়ে মানুষের রচিত আইন মানার মধ্য দিয়ে মানুষের গোলামী স্বীকার করে নেয়াই হলো সকল জাহেলিয়াতের মূল কথা। অন্যদিকে ইসলামের আহ্বানই হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার গোলামী, আনুগত্য ও দাসত্ব ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণ করা। মানুষকে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও মানুষের গোলামীর অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামীর আলোকিত পথে টেনে আনাই ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর জাহেলিয়াতের নীতি হলো মানুষকে মহাজ্ঞানী ও একক সার্বভৌম সত্তা আল্লাহর গোলামী থেকে বের করে এনে সীমাবদ্ধ জ্ঞান, সংকীর্ণ চিন্তা ও স্বার্থপরতার দোষে দুষ্ট কিছু মানুষের গোলাম বানিয়ে দেয়া। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় কিছু মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন–নির্বাচন করে, সামরিক শক্তি দিয়ে কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর চেপে বসে নিজেদের মনমতো আইন-কানুন তৈরি করতে থাকবে, আর সাধারণ মানুষ গোলামের মতো তা মানতে বাধ্য থাকবে। পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির গোলামী ও অধীনতা থেকে মুক্ত করে সার্বভৌম স্রষ্টা আল্লাহর হুকুম মেনে নিতে আহ্বান জানায়। ইসলাম বলে, মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার আইন-কানুন একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হবে এবং মানুষ একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করবে, অন্য কারো কাছে নয়।

মুসলমান অমুসলমান যার কাছেই হোক না কেন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় অবশ্যই আলোচিত বিষয়গুলোতে ইসলামের আপসহীন বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে হবে।

আকিদা-বিশ্বাস কিংবা আইন-কানুন কোনো ক্ষেত্রেই ইসলাম জাহেলিয়াতের সাথে সামান্যতম আপস করতে রাজি নয়। একই সাথে ও একই স্থানে ইসলাম আর জাহেলিয়াত থাকতে পারে না। একটির উপস্থিতিই অন্যটির জন্য বিলুপ্তির কারণ। জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সহাবস্থান এক মুহূর্তও সম্ভব নয়। কিছু ইসলাম, কিছু জাহেলিয়াত মিলে মিশে থাকার তথাকথিত 'পরম সহিষ্ণুতা বা উদারনীতি(!)' গ্রহণ করতে ইসলাম কখনোই রাজি নয়।

হয় আল্লাহর আনুগত্য চলবে, না হয় মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা চলবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা মতো আল্লাহর আইন আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের আইন চালু করে যারা নিজেদেরকে মুসলমান ভেবে আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন, তারা স্পষ্ট করে জেনে রাখুন যে, এটাও জাহেলিয়াত, বরং সবচেয়ে জটিল ধরনের জাহেলিয়াত। মহাগ্রন্থ আল কুরআন অসংখ্য আয়াতে ইসলামের এ বক্তব্য অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছে। আমি এখানে তার সামান্য কয়েকটি তুলে ধরলাম–

"(অতএব, হে মুহাম্মদ!) তোমার ওপর আল্লাহ তাআলা যে আইন-কানুন নাযিল করেছেন তুমি তারই ভিত্তিতে এদের মাঝে বিচার ফায়সালা করো, কখনো তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং তাদের (ষড়যন্ত্র) থেকে সতর্ক থেকো যেন আল্লাহ তোমার ওপর যা নাযিল করেছেন তা থেকে তারা কখনো তোমাকে কোনো ফেতনায় ফেলতে না পারে। অতঃপর (তোমার ফয়সালায়) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআলা তাদের নিজেদেরই কোনো কোনো গুনাহের জন্য তাদের কোনোরকম মুসীবতে ফেলতে চান, (কেননা) মানুষের মাঝে অধিকাংশই হচ্ছে অবাধ্য।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৪৯)

"অতএব (হে নবী) তুমি (মানুষদের) এই (দ্বীনের) দিকে ডাকতে থাকো, তোমাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই তুমি প্রতিষ্ঠিত থেকো, ওদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।" (সূরা শূরা, আয়াত ১৫)

"যদি এরা তোমার আহ্বানে কোনো জবাব না দেয়, তাহলে এ কথা জেনে রেখো যে, এরা (আসলে) নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে (এসব বলে।) তার চাইতে বেশি গোমরাহ ব্যক্তি আর কে আছে, যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো হিদায়াত অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে? আল্লাহ তাআলা কখনো যালিম জাতিকে পথ দেখান না।" (সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫০)

"(হে নবী) আমি তোমাকে দ্বীনের এক (বিশেষ) পদ্ধতির ওপর এনে প্রতিষ্ঠিত করেছি, অতঃপর তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো। (শরিয়তের ব্যাপারে) সে সব লোকদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করো না, যারা (আখেরাত সম্পর্কে) কিছুই জানে না।

আল্লাহ তাআলার মোকাবেলায় এরা তোমার কোনোই কাজে আসবে না। (তাছাড়া) যালিমরা তো একজন আরেকজনের বন্ধু, আর পরহেযগার লোকদের আসল বন্ধু আল্লাহ তাআলা (স্বয়ং নিজে)।" (সূরা আল জাসিয়া, আয়াত ১৮-১৯)

"তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের শাসনব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) বিশ্বাস করে তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার চেয়ে উত্তম শাসক (বিধানদাতা) আর কে হতে পারে?" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৫০)

এসব আয়াত অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের সামনে পথ মাত্র দু'টি। হয় আল্লাহর পথ, না হয় শয়তান ও তাগুতের পথ। হয় আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশনা মেনে চলা, না হয় স্বেচ্ছাচারিতা। হয় আল্লাহর আইন মানা, না হয় মানবরচিত আইন মানা। আয়াতগুলো বিষয়টিকে এমন দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছে যে, মনের মধ্যে শয়তানী কিংবা বক্রতা জন্ম না নিলে এখানে কেউ কোনো রকম বিতর্কের অবতারণা করতে পারে না।

ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এতোক্ষণের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে ইসলামের প্রধান কাজ হলো স্বার্থপর ও জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারী নেতাদের হাত থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়া এবং আস্তে আস্তে তার মহান ও স্বতন্ত্র জীবনব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করা। এই নেতৃত্বের পালাবদল নিছক কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নয় ; বরং এই সৎ ও ঈমানদার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই হলো বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধন। এই কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টাও কারো মনমতো পরিচালিত হবে না ; বরং কল্যাণ পাওয়ার জন্য যে সংগ্রাম করতে হবে তার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত হতে হবে। এই সংগ্রাম পরিচালনার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কেননা, এই আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানুষের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে।

এই দ্বীনের প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষকে কুপ্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দেয়া উচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়ে দেয়া।

পারস্যের দুর্ধর্ষ সেনাপতি রুস্তমের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে হযরত রাবী বিন আমর (রা) যে কথা বলেছিলেন তাতে এই বিষয়টিই আমরা খুঁজে পাই– রুস্তম যখন জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এখানে কেন এসেছ? তখন রাবী বিন আমর (রা) বলেছিলেন, 'মানবজাতিকে মানুষের দাসত্ব ও পৃথিবীর সংকীর্ণ স্বার্থের গোলামী থেকে বের করে আল্লাহর গোলামীতে নিয়োজিত করার জন্য এবং পরকালের প্রশস্ত জীবনের সন্ধান দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আরো দায়িত্ব দিয়েছেন

যেন আমরা মানুষকে মানুষের রচিত জীবনব্যবস্থার যুলুম থেকে মুক্ত করে মহান আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার অধীনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করি।

আসলে পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভূখণ্ডে যতো ধরনের মতবাদেরই উদ্ভব ঘটেছে তা মূলত একক কিংবা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বহিঃপ্রকাশ। ইসলামি আন্দোলনের সূচনালগ্নেও এ রকম অনেক ধ্যানধারণা প্রচলিত ছিল। ইসলামের কাছে এগুলোর কানাকড়িও মূল্য নেই। এসব জীবনব্যবস্থার সমর্থন দেয়া তো দূরের কথা এগুলোর সাথে সামান্যতম আপসও ইসলাম অনুমোদন করে না। কেননা, এগুলোর মূলোৎপাটন করাই ইসলামের লক্ষ্য। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য নেই আজকের বিশ্বের অবস্থাও সেই একই জাহেলিয়াতের মতো। বলতে গেলে গোটা পৃথিবীতেই এখন মানবরচিত মতবাদেরই জয়জয়াকার। যেসব দেশে এক সময় আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিলো সেসব দেশগুলোরও একই অবস্থা।

ইসলাম কিছুতেই এসব মনগড়া জীবনব্যবস্থাকে সমর্থন করে না। এসব জাহেলিয়াতের জঞ্জালকে পৃথিবী থেকে মূলোৎপাটন করে সেখানে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে একটি কল্যাণময় সমাজ গড়াই হলো ইসলামের লক্ষ্য।

ইসলামের সাথে জাহেলিয়াতের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক কিংবা সামঞ্জস্য নেই। হঠাৎ করে অনেক সময় ইসলামের কোনো নিয়ম-কানুনকে বাহ্যিকভাবে জাহেলি নিয়ম-কানুনের সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে হতে পারে। ছোট-খাট বিষয়ে এমন মনে হওয়াটা নেহায়েত একটা আকস্মিক ব্যাপার। একটু গভীরভাবে দেখলেই দু'টোর দৃষ্টিভঙ্গি যে সম্পূর্ণ আলাদা তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মাঝে মিল থাকা তো কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কেননা, ইসলাম নামক এই সুবিশাল বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে মহান আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞানের উৎস থেকে। আর জাহেলি জীবনব্যবস্থার প্রত্যেকটির জন্ম হলো আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট সীমিত জ্ঞানের অধিকারী একক কোনো স্বৈরাচার কিংবা কিছু স্বার্থপর মানুষের পূতিগন্ধময় মস্তিষ্ক থেকে। আর যে স্থান যেমন, সেখান থেকে তো তেমন ফসল উৎপাদিত হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

"উৎকৃষ্ট যমিন থেকে তার মালিকের আদেশে উৎকৃষ্ট ফসলই উৎপন্ন হয়, আর যে যমিন বিনষ্ট হয়ে গেছে তা থেকে কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছুই বের হয়ে আসে না। এভাবেই আমি আমার নিদর্শনসমূহকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করি এমন এক জাতির জন্য যারা (আমার নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।" (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৫৮)

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জাহেলিয়াতের রূপরেখা, ধরন ও প্রকৃতির পরিবর্তন হলেও এর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা সবসময়ই এক ও অভিন্ন। চাই সে জাহেলিয়াত আদিম যুগের হোক কিংবা বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক যুগের। জাহেলিয়াতের শেকড় সব সময়ই মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতার আবর্জনায় গাঁথা। তাই জাহেলিয়াত কখনোই

মূর্খতা, স্বার্থপরতা, হীনতা ও সংকীর্ণতার গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। জাহেলিয়াত যদি খুব বেশি মাত্রার উদার হয় তাহলে তা হয়তো বড় জোর কিছুসংখ্যক লোক, কিংবা বিশেষ কোনো শ্রেণী, কিংবা বিশেষ কোনো অঞ্চল বা জাতির মধ্যে ঘুরপাক খায়। এর চেয়ে উর্ধ্বে কখনো উঠতে পারে না। বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন কখনো জাহেলিয়াতের লক্ষ্য হতে পারে না।

কিন্তু আল্লাহর আইনের প্রকৃতিই এমন যে, সেখানে স্বার্থপরতার কোনো স্থান নেই। এখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, কাউকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ নেই, কাউকে বেশি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই, স্বেচ্ছাচারিতার কোনো প্রবেশাধিকার নেই, কোনো আঞ্চলিকতা নেই, জাতীয়তাবাদ নেই, শ্রেণীভেদ নেই। এখানে সবাই সমান। সকল মানুষ এখানে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সমান মর্যাদা ভোগ করবে।

এটাই হলো মানবরচিত জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামি জীবনব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য। এই পার্থক্য এমন এক পার্থক্য, যা কখনো মুছে যাওয়ার নয়। এটা এমন এক দূরত্ব যা কমিয়ে আনার জন্য কোনো পুল বা সাঁকো নেই। এটা এমনই এক সংঘাত যার কোনো শেষ নেই। তাই কোনো যুগে, কোনো ভূখণ্ডে, কোনো দেশে কিছুতেই ইসলামি ব্যবস্থা ও জাহেলি ব্যবস্থা একত্রে বসবাস করতে পারে না। চাই সে জাহেলিয়াত সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র কিংবা যে নামেই হোক না কেন। সুতরাং, কিছুটা ইসলামি ভাবধারা কিছুটা জাহেলিয়াত ভাবধারা, কিছু ইসলামি আইন আর কিছু নিজেদের বানানো আইন–এরূপ সমন্বয় সাধন করে নতুন কোনো জগাখিচুড়ি মতবাদ তৈরীর চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আল্লাহ তাআলা যেমন নিজ সত্তার সাথে শিরক করা সহ্য করেন না, তেমনি তাঁর দেয়া জীবনব্যবস্থার মাঝেও অন্য কিছুর সংমিশ্রণ সহ্য করেন না, এই দুটোই মহান আল্লাহর আদালতে সমান অপরাধ।

ইসলামের দিকে মানবজাতিকে আহ্বান করার সময় ইসলামের উল্লিখিত দিকটির কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। এটা ভুলে গেলে ইসলাম অনিবার্যভাবে তার গতি হারিয়ে ফেলবে। ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সময় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যকে ইসলামের পূর্ণ স্বকীয়তা নিয়েই তুলে ধরতে হবে। কোনোরকম জড়তা, সংকোচ কিংবা সন্দেহ-সংশয় থাকলে কখনো সেই দাওয়াত ফলপ্রসূ হতে পারে না। ইসলাম সমাজের শুধু নির্দিষ্ট কোনো দিকের সংস্কার চায় না ; ইসলাম চায় মানুষ ও মানবসমাজের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কাজ-কর্মের আমূল পরিবর্তন। জাহেলিয়াতকে পৃথিবী থেকে বিদায় করাই ইসলামের কাজ। ঘটনাচক্রে দু'একটি নগণ্য বিষয় এমন হতে পারে যা জাহেলিয়াতের কোনো নিয়মনীতির সাথে আকস্মিকভাবে ইসলামি নিয়ম-নীতির সাদৃশ্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে ইসলাম যদি সেটাকে বহাল রাখেও, তবুও তার দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্নিহিত ভাবধারা অন্তত পরিবর্তন করে দেবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আমাদেরকে লক্ষ রাখতে হবে, ইসলামের ধারক-বাহক নামে পরিচিত

লোকগুলোর বাস্তব অর্থে ইসলাম থেকে বিচ্যুতির কারণে তারা আজ সমাজের পশ্চাতমুখী শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, আবিষ্কার, উদ্ভাবনীর কাজে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। এ কারণে অনেক মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এ বিষয়টিও মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে বৈষয়িক ব্যাপারে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার রয়েছে, ইসলাম সেগুলোকে অবমূল্যায়ন তো করবেই না ; বরং এই জ্ঞান-গবেষণা, আবিষ্কার, উদ্ভাবনীর কাজ আরো গতিশীল করবে এবং আবিষ্কৃত বিজ্ঞানকে মানুষের ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করবে না মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

দ্বীনের দায়ীদেরকে দাওয়াত দেয়ার সময় অবশ্যই প্রচলিত মানবরচিত জীবনব্যবস্থার সাথে মেলানোর অপচেষ্টা পরিহার করতে হবে। এটা করলে মানুষ ইসলামকেও অন্য সকল মানবরচিত জীবনবিধানের মতো মনে করতে শুরু করবে। এটা তাদেরকে যেমন গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাবে, তেমনি এ কারণে দ্বীন প্রতিষ্ঠাও একটা সুদূর পরাহত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই ইসলামের প্রচারে ও তা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিতে অবশ্যই ইসলামের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও পদ্ধতি বজায় রাখতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য আপসহীনভাবে তুলে ধরতে হবে। মানুষকে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ইসলাম ইসলামই। মানুষের রচিত ও প্রচলিত এসব ব্যবস্থার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামের রয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও জীবনব্যবস্থা।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সীমাহীন জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উৎসারিত নির্ভেজাল ও সর্বোচ্চমানের ন্যায়নীতিভিত্তিক জীবনব্যবস্থার নামই ইসলাম। কোনো মানবরচিত পূতিগন্ধময় জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামকে সংমিশ্রণ করার চেষ্টা করা সত্যিই ইসলামকে চরম অপমান করার শামিল। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় যদি আমরা ইসলামের এই মহান স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও আপসহীন চরিত্রের দিকগুলির ব্যাপারে যত্নবান হই, তাহলেই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে সকল বাধা-বিপত্তি দু'পায়ে মাড়িয়ে জীবন বাজি রেখে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো। এই স্বাতন্ত্র্যই আমাদের বুঝিয়ে দেবে যে, ইসলামই একমাত্র সঠিক ও গ্রহণযোগ্য; বাকি সবই বাতিল। ইসলাম হচ্ছে আলো, আর বাকি সব অন্ধকার। তাই এ দু'টোর সহাবস্থান কিংবা সংমিশ্রণ কিছুতেই সম্ভব নয়। যারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে মানবরচিত সমাজব্যবস্থার জঞ্জালে জড়িয়ে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ডুবে গেছে, বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ও অশান্তিতে ভুগছে তাদের দেখে আমাদের করুণা হওয়া উচিত। তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগা উচিত। কেননা, তারা ফাঁদে আটকা পড়ে অসহায়ভাবে কাঙ্ক্ষিত যে মুক্তির জন্য ছটফট করছে সেই মুক্তির পথের খোঁজ আমাদের জানা আছে।

ইসলামের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে জানে সে কিছুতেই সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতি তথা জাহেলিয়াতে ডুবে থাকা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের নীতি-আদর্শে কোনোরকম হেরফের করতে পারে না। তাই ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় আমরা মানবসমাজকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দেবো, তোমরা যে জাহেলি সমাজব্যবস্থার মাঝে বাস করছো তা অপবিত্র। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এই অপবিত্রতা থেকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করতে চান। তোমাদের এই পূতিগন্ধময় ভোগবাদী, স্বার্থবাদী সমাজকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের ছোঁয়ায় পবিত্র করে তুলতে চান। তোমরা যে অপমানজনক লাঞ্ছনাময় জীবন যাপন করছো, তা থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সম্মানজনক জীবন দিতে চান। যে জটিলতা ও কুটিলতার জালে তোমরা আবদ্ধ হয়ে আছো, তা থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সহজ সরল জীবনব্যবস্থা প্রদান করতে চান। ইসলামের সংস্পর্শে এলে তোমাদের জীবন থেকে সকল হীনতা, সংকীর্ণতা ও দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তোমাদের জীবনে এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে যে, তোমরা বস্তুগত পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে তখন সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। তখন এই পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার ওপর তোমাদের চরম ঘৃণা এসে পড়বে। তোমাদের চোখে জাহেলিয়াতের পর্দা পড়ে থাকার কারণে তোমরা এই সমাজের ঘৃণ্য দিকগুলা দেখতে পাচ্ছো না। ইসলামি সভ্যতার সংস্পর্শে এলে তোমাদের চোখের ওপর থেকে জাহেলিয়াতের পর্দা সরে যাবে। তখন তোমরা নিজেরাই এই ঘুণে ধরা সমাজের আসল রূপ নিজ চোখে দেখতে পারবে। ইসলামের শত্রুরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং মুসলিম সমাজে বসবাসকারী তাদের দোসর মুনাফিকদের সাথে নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে এতো পরিমাণ ভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে, তোমরা আজ ইসলামের সঠিক রূপ দেখতেই পাচ্ছো না। এসো আমরা তোমাদেরকে ইসলামের সঠিক রূপরেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। মহান আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের হৃদয়ে ইসলামি আদর্শের ছাপ এঁকে দিয়েছেন। আমরা কুরআন-সুন্নাহতে ও ইসলামের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের আয়নায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে পেয়েছি। এসো তোমরা, এই পথে এসো; মানবজীবনের সফলতা ও সার্থকতা এই পথের মাঝেই নিহিত।

ইসলামের যে গতিধারা, যে স্বরূপ উপরে উল্লেখ করা হলো, মানুষকে দাওয়াত দেয়ার সময় সেগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আরব আজম, রোম, পারস্য যেখানেই ইসলামের আলো প্রবেশ করেছে সেখানেই সে তার এই স্বকীয় রূপ ও আপসহীন মূল্যবোধ নিয়েই প্রবেশ করেছে। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে সম্মানিত জীব হিসেবে বিবেচনা করে। এ কারণে ইসলাম অনেক উঁচু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষকে সম্বোধন করে এবং সেই আহ্বানও কোনো কর্কশ ভাষায় কিংবা আগ্রাসী

ভঙ্গিতে করে না ; বরং অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে কল্যাণকামী মানসিকতা নিয়েই সে মানুষকে আহ্বান করে। কারণ, মানুষের কল্যাণ সাধন, মানুষের প্রতি দয়া ভালোবাসা প্রদর্শন ইসলামের প্রকৃতি। ইসলাম মানুষকে কোনোরকম ধোঁকা দেয় না, কোনো মিথ্যা আশ্বাস দেয় না, কোনোরকম অস্পষ্ট কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে না। ইসলাম মানুষকে এভাবে আহ্বান করে না যে, তোমরা যে অবস্থায়, যে চিন্তা-চেতনা, যে সংস্কৃতি, যে আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে এখন আছো—সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সেগুলো নিয়েই তুমি থাকতে পারবে ; বরং ইসলাম যে পরিবর্তন চায় তা হলো আমূল পরিবর্তন, পূর্ণাঙ্গ সংস্কার। চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস, অনুভব-অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন থেকে নিয়ে শুরু করে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারই ইসলামের কাম্য। ইসলাম গ্রহণ অর্থ পূর্বের ধ্যান-ধারণা বহাল রেখে সামান্য কোনো পরিবর্তন নয়। সমাজের প্রচলিত কোনো ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর মানসিকতা ইসলাম কখনোই গ্রহণ করতে রাজি নয়।

আজকাল এক ধরনের 'আধুনিক ইসলামপন্থীদের' প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এরা 'ইসলামি গণতন্ত্র', 'ইসলামি সমাজতন্ত্র'—এসব নামে ইসলামকে আধুনিকায়ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এরা প্রচলিত রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে ইসলামকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এরা হয়তো ইসলামের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ অথবা এরা ইসলামের দুশমন। এরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতো বিভিন্ন জাহেলি মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের মর্জি মোতাবেক ইসলামকে কাট-ছাঁট করে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এটা ইসলামের সাথে চরম প্রতারণা।

জাহেলিয়াত জাহেলিয়াতই। প্রাচীন হোক, আধুনিক হোক সকল যুগের জাহেলিয়াতের মূল ভিত্তি একই চিন্তা-চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সাথে জাহেলিয়াতের সংঘাত চিরন্তন, এ সংঘাত অনিবার্য। কারণ ইসলামের আদর্শ জাহেলি আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত। জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা চাট্টিখানি কথা নয়। এ জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, প্রয়োজন কঠোর অধ্যবসায়। বর্তমান সময়ে মানবজাতি যে জটিলতম জাহেলিয়াতের জালে আটকা পড়ে গেছে তা থেকে উদ্ধার করা তো আরো বেশি কঠিন। ছোটখাটো কোনো পরিবর্তন দ্বারা তা সম্ভব নয়। প্রথম যুগের মতোই আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকার থেকে মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী বিপ্লব। আর আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের পথ হচ্ছে আল্লাহর যমিন থেকে মানবরচিত শাসনব্যবস্থা শেকড়সহ উচ্ছেদ করে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এ ছাড়া বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় কিংবা দোটানায় ভোগার কোনো অবকাশ নেই। এ আমূল পরিবর্তনের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে মানুষকে

জানিয়ে দিতে হবে। মানুষের ভেতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে এসব ব্যাপারে কোনোরকম আপসকামী ও নমনীয় বক্তব্য প্রদানের সুযোগ নেই। মানুষের মধ্যে কোনোরকম অস্পষ্টতা যেন না থাকে। সে যেন ইসলামের পথে আসার সময়ই জেনে নেয় যে, সে কোন পথে পা বাড়াচ্ছে। এ পথের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে সে যেন ভালোভাবে জেনে নিতে পারে।

অনেকে বলবেন, এভাবে দাওয়াত দিলে মানুষ ভয়ে ইসলামের কাছেই আসবে না; আরো দূরে সরে যাবে। এ ধারণা অমূলক নয়, আল্লাহর রাসূলের আহ্বান শুনেও মানুষের মাঝে এমন প্রতিক্রিয়াই হয়েছিলো। তাদের সমাজের সবচেয়ে জনপ্রিয়, ন্যায়বান, নীতিবান, বিশ্বস্ত ও পরোপকারী মানুষটির কাছ থেকেও তারা দূরে সরে গিয়েছিলো ; তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। এর কারণ ছিলো, তিনি তখনকার সমাজের আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রথা-পার্বণ সবকিছুর বিরুদ্ধে আপসহীন বক্তব্য রেখেছিলেন। তাদের সমাজকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সেখানে নতুন সমাজ গড়ে তোলার স্লোগান তুলেছিলেন। সাময়িকভাবে এই আপসহীন বক্তব্যের কিছু বিরূপ ফল দেখা গেলেও পরবর্তীতে তা এক বিরাট কল্যাণ বয়ে এনেছিলো। দেখা গেছে, এক সময় যারা ইসলামের আহ্বান শুনে দূরে সরে গিয়েছিলো, ইসলামের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিলো– তারাই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিল। অথচ তারা এক সময় এমনভাবে পালিয়েছিল যে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার বিবরণ তুলে ধরে বললেন–

“(অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়) এরা যেন বনের কতিপয় (পলায়নরত) ভীতসন্ত্রস্ত গাধা, যারা গর্জনকারী বাঘের আক্রমণ থেকে পালাতেই ব্যস্ত।” (সূরা মুদ্দাছ্ছির, আয়াত ৫০-৫১)

এই লোকগুলো যারা এক সময় ইসলাম থেকে এমন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়েছে, যারা এক সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের সাথে অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, যারা যুলুম নির্যাতন করে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলো, যাদের অত্যাচারে মুসলমানরা প্রাণটুকু হাতের মুঠোয় নিয়ে হিজরত করেছিলো, হিজরত করার পরও যারা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য যুদ্ধ করেছিলো–সেই লোকগুলোই এক সময় এসে ইসলামের শান্তির নীড়ে আশ্রয় নিল। তারাই ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল।

সুতরাং, নমনীয়তা, কাট-ছাঁট বা আপসকামিতার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। অবস্থা, পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া যাই হোক ইসলামের বক্তব্য প্রথম থেকেই সুস্পষ্ট করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

সাফল্যের মূলমন্ত্র

আজকের যুগের ইসলাম-বিরোধিতার ধরন-প্রকৃতি যদিও অনেক জটিল ও কুটিল, তবুও সামগ্রিকভাবে ইসলামের বিরোধিতা আজও যেমন রয়েছে তেমনি রাসূলুল্লাহর যুগেও ছিলো। মক্কার মুশরিকরা দ্বীনে ইবরাহীম থেকে এতো বেশি বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো যে, দ্বীন সম্পর্কে ন্যূনতম কোনো সঠিক ধারণাও তাদের ছিলো না। যে কারণে ইসলামের দাওয়াত শুনে তারা আকাশ থেকে পড়লো। তাদের কাছে এ আহ্বান এক উদ্ভট ও আজগুবী দাওয়াত মনে হলো। তাই ধনি শ্রেণী স্বার্থের টানেই ইসলামকে দমন করতে আদা-জল খেয়ে লেগেছিলো। সাথে সাথে সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছিলো। তারপরও এ শাশ্বত আহ্বান দমিয়ে রাখা যায়নি। কেননা, এ আহ্বানের ভেতরে এক দুর্নিবার আকর্ষণীয় শক্তি রয়েছে যা মানুষের মনের গভীরে গিয়ে নাড়া দেয়। এ কোনো যাদুটোনা বা ভেল্কিবাজির আকর্ষণ নয়; এ হলো ঈমানের মাঝে বিদ্যমান শক্তির দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই বিরোধী শক্তি যতোই তর্জন গর্জন করুক না কেন, যতোই হম্বিতম্বি দেখাক না কেন, বস্তুগত শক্তিতে তারা যতোই সজ্জিত হোক না কেন; ইসলাম তার নিজস্ব গতিতেই এগিয়ে চলবে। আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে অন্ধকার সে আলোকিত করেই যাবে। নিজের সৌরভ বিলিয়ে দিয়ে মানুষকে বিমোহিত করবেই। মানুষের মনে নাড়া দেয়ার, মানুষকে আকর্ষণ করার এই যে ক্ষমতা, এর অন্যতম একটি কারণ হলো ইসলাম যে পথে মানুষকে আহ্বান করে তা প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের সহজাত প্রকৃতি সবসময় এ পথেই চলতে চায়, এ পথেই আসতে চায়, এই আকিদা-বিশ্বাসই সে ধারণ করতে চায়।

একজন মানুষ জাহেলি সমাজ থেকে ইসলামের আলোয় আসার সাথে সাথেই ইসলাম তার কাছে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শবাদিতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চমানের বিশুদ্ধতা আশা করে না; ইসলাম তাকে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে নিজের আদর্শের ছাঁচে গড়ে তোলে। অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক দিক দিয়ে মানুষ যে স্তরেই থাকুক না কেন, যতো পেছনেই থাকুক না কেন, ইসলাম তাকে নিজ স্তর থেকেই আস্তে আস্তে পথ দেখিয়ে উন্নতির সিঁড়িতে আরোহণ করায়। তবে এ ক্রমোন্নতি ও পর্যায়ক্রমিক সংশোধন অর্থ এই নয় যে, ইসলাম কিছুদিন জাহেলিয়াতের সাথে মিলেমিশে থাকবে এবং বাতিলের সাথে সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করবে; বরং এই ক্রমোন্নতির প্রথম ধাপই হলো সকল ধরনের জাহেলি জীবনব্যবস্থা, জাহেলি সমাজব্যবস্থা ও তার রসম-রেওয়ায অস্বীকার করা। জাতির সংশোধনের নামে কিছুদিন জাহেলিয়াতের সাথে মিলেমিশে থাকার জন্য ইসলাম তার একটি বর্ণকেও পরিবর্তন করতে সম্মত নয়। পরিবর্তন তো দূরের কথা– জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠিত স্বার্থবাদী নেতৃত্ব ও সমাজের জাহেলি রীতিনীতির কোনো একটির বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়েও ইসলাম সামান্যতম নমনীয়তা প্রদর্শনের পক্ষপাতী নয়। কোনোরকম খোঁড়া যুক্তি দিয়ে

বাতিলের সাথে সহাবস্থানের নীতি অবলম্বনকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না; বরং সে তার পুরো বক্তব্যকে একই সাথে সমাজের মানুষের কাছে উপস্থাপন করে। জাহেলিয়াতের সাথে সহাবস্থান, বক্তব্যে নমনীয়তা ও আপসকামিতা দ্বারা যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করা যেতো তাহলে মহাজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ নির্দেশ তাঁর রাসূলকেই সর্বপ্রথম দিতেন। তিনিই তো মানুষের স্রষ্টা। মানুষের প্রকৃতি, মন-মানসিকতা এগুলো সম্পর্কে তো তিনিই ভালো জনেন। তাই তিনি এটাও জানেন যে, ইসলামের মহান বাণী নির্দ্বিধায়, বলিষ্ঠ ভাষায়, আপসহীনভাবে যদি মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় তাহলেই মানুষের মন এই বাণীর দিকে ঝুঁকে পড়বে, মানুষের প্রকৃতি এই আহ্বান গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবে।

মানুষের প্রকৃতি এমন যে, সে কোনো জীবনধারা পরিবর্তন করলে আমূল পরিবর্তনই করতে চায়। দুই ধরনের জীবন ধারার সংমিশ্রণের মাধ্যমে কোনো জটিল জীবনধারা অবলম্বন করাটা মানুষের জন্য আরো জটিল। তাই আংশিক পরিবর্তন নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তনই মানুষের সহজাত প্রকৃতির সাথে অধিক সংগতিশীল।

ইসলাম যদি জাহেলি সমাজের সাথে মিলেমিশে থাকাকে মেনে নিতো এবং জাহেলি সমাজকে টিকিয়ে রেখে তাতে সামান্য কিছু পরিবর্তন আশা করতো তাহলে কিছুতেই মানুষ জান-মাল বাজি রেখে ইসলামের দিকে ছুটে আসতো না। আসলে ছোটোখাটো কোনো কারণে এমন ত্যাগ স্বীকারের কোনো যৌক্তিকতাও নেই। এমনটি হলে মানুষ ইসলামের দিকে আসার চেয়ে জাহেলি জীবনব্যবস্থার মধ্যে থাকাই শ্রেয় মনে করতো। কারণ, তাদের পিতৃপরুষ এ জীবনব্যবস্থার কর্ণধার ছিলো। এটা তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা, সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এ ব্যবস্থারই ধারক-বাহক। সমাজের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করে অভ্যস্ত। সুতরাং, এতোদিক থেকে সুবিধাজনক ও ঝামেলামুক্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা ছেড়ে সামান্য কোনো পরিবর্তনের জন্য নতুন আদর্শ গ্রহণ করার দরকার ছিল না। খুব বেশি প্রয়োজন হলে পুরাতন জীবনধারাকেই বরং কিছুটা আধুনিকায়ন করে নেয়া যেতো।

অতএব, আমাদের আজ ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার যে, জাহেলিয়াতের সাথে মিলেমিশে থাকলে দ্বীনের প্রকৃত রূপ কখনোই মানুষের সামনে উন্মোচিত হবে না। এই দ্বীনের প্রকৃত দাবি কী তাও মানুষ কোনোদিন বুঝতে পারবে না।

পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদদের ভূমিকা

আজকালকার কিছু স্থূল চিন্তার দ্বীনদরদীদেরকে মাঝে মাঝে ইসলাম সম্পর্কে এমন সব বক্তব্য দিতে দেখা যায়, মনে হয় ইসলাম আসামীর কাঠগড়ায় নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি তাকে বিচারকের শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এর কারণ হলো, বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, (নামধারী) মুসলমানদের তথা নামকাওয়াস্তে মুসলিম জাহানের বাসিন্দাদের অবস্থা ইহুদী নাসারা ও নাস্তিকদের চেয়ে খতরনাক। এ কারণে কেউ যখন এ কথা বলে যে, 'তোমরা মুসলমান হওয়ার কারণেই পিছে পড়ে আছো', তখন এই সব দ্বীনদরদীরা(!) ইসলামের কার্যকারিতা ও বাস্তবতা বুঝানোর জন্য উঠেপড়ে লাগেন। তারা ভুলে যান যে, আজকের মুসলমান দাবিদাররা ইসলাম গ্রহণের কারণে পশ্চাৎমুখী, অনুন্নত, দারিদ্রপীড়িত নয়; বরং ইসলামকে পরিত্যাগ করার কারণেই তাদের ওপর এই অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-দুর্দশা ও নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে এসেছে।

তাই এসব দ্বীনদরদীদেরকে আমরা বলবো, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে নিজেরা সঠিকভাবে ইসলামের ওপর আসার চেষ্টা করুন। ইসলাম এমনিতেই শ্রেষ্ঠ। আপনি প্রমাণ করতে পারলেও শ্রেষ্ঠ, না পারলেও শ্রেষ্ঠ। তাই জাহেলিয়াতের সাথে মিলেমিশে, সহাবস্থান করে দাওয়াত দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই; বরং একথা মনে রাখুন যে, এসব প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করতেই ইসলাম এসেছে। মানবজাতিকে এই জাহেলিয়াতের যাতাকল থেকে উদ্ধারের জন্যই ইসলাম এসেছে।

প্রচলিত কোনো জাহেলি সমাজব্যবস্থার ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে তার সাথে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা, তার সাথে ইসলামের কোথায় কোথায় মিল আছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা পরাজিত ও অধঃপতিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। একজন যথার্থ মুসলমানের জন্য এটা কিছুতেই সঙ্গত নয়। পৃথিবীর যে অঞ্চল থেকেই আসুক না কেন, ইসলামবিবর্জিত সকল জাহেলি ব্যবস্থাকে আমরা চোখ বুজে বাতিল ঘোষণা করবো। কারণ, ইসলাম যে সম্মানের আসনে মানুষকে আসীন করেছে এসব ব্যবস্থা তাকে সেই আসন থেকে টেনে নামিয়ে চরম অপমানজনক অবস্থানে নিয়ে যায়।

দ্বীনের পথে আহ্বানকারীরা যখন আপসহীনভাবে ইসলামের বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরবে, তখন মানুষ এই আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত তাড়া অনুভব করবে। নিজ থেকেই ছুটে আসতে চাইবে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। মুহূর্তেই এ জাহেলি সমাজব্যবস্থার প্রতি তার ঘৃণা জেগে উঠবে। এর অসারতাগুলো তার সামনে ফুটে উঠবে, সে ইসলামি জীবনব্যবস্থা মেনে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা উপলব্ধি করবে। আমরা যেন মানুষকে কখনো এমনটি না বলি যে, 'তোমরা যে সমাজব্যবস্থায় আছো তা ইসলাম আসলেও তেমনই থাকবে, ইসলাম বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করতে চায়। তোমরা এখন যা করছো তখনো তা-ই করতে পারবে, শুধু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য রদবদল ছাড়া ইসলাম কিছু করবে না।'

আপাতদৃষ্টিতে পদ্ধতিটিকে বেশ ভালোই মনে হয়। মনে হয়, এভাবে কথা বললে মানুষ আস্তে আস্তে সংশোধন হয়ে আসবে, ইসলামের ভয়ে দূরে সরে যাবে না– আরো অনেক যুক্তি এনে শয়তান আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আসলে এটা চরম মূর্খতা ও

বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, এই পদ্ধতিতে দাওয়াত দিলে সে দাওয়াত মানুষের চেতনায় তেমন কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। এ ধরনের নমনীয় কথার কোনো আকর্ষণীয় শক্তিও নেই। কেননা, ইসলাম মানুষের জীবনে ছোটোখাটো, যৌগিক ও বিচ্ছিন্ন কোনো পরিবর্তন নিয়ে সন্তুষ্টও নয়। ইসলাম মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রা, আইন-কানুন, বিচার ব্যবস্থা, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আবেগ-অনুভূতি–তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এমন আমূল পরিবর্তন সাধন করে যে, জাহেলিয়াতের সাথে তার কিছুমাত্র মিল থাকে না। ইসলাম মানুষকে জীবনের ছোটো-বড়ো সকল ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা, খোদমতলবী, কুপ্রবৃত্তি ও জাহেলি শাসকদের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে একক সার্বভৌম সত্তা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। এ লক্ষ্যে ইসলামের বক্তব্য আপসহীন, দ্ব্যর্থহীন ও বলিষ্ঠ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তাতে যদি কেউ ইসলাম মানে তবে সে তার নিজেরই কল্যাণ কামনা করলো, আর যদি কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করে তবে সে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারলো। তাতে দাওয়াত দানকারীর কোনো ব্যর্থতা নেই, ইসলামেরও কোনো ক্ষতি নেই, আল্লাহরও কিছু আসবে যাবে না। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন–

"(হে নবী) তুমি বলো, এই সত্য (দ্বীন) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এসেছে; সুতরাং যার ইচ্ছা সে (এর ওপর) ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে (তাকে) অস্বীকার করুক। আমি তো এই (অস্বীকারকারী) যালিমদের জন্য এমন এক আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার বেষ্টনী তাদের পুরোপুরিই পরিবেষ্টন করে রাখবে। যখন তারা (পানির জন্য) ফরিয়াদ করতে থাকবে তখন এমন এক গলিত ধাতুর মতো পানীয় তাদের দেয়া হবে যা তাদের সমগ্র মুখমণ্ডলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে; কী ভীষণ (হবে সে) পানীয়! আর কী নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি!" (সূরা কাহফ, আয়াত ২৯)

"আর যদি কেউ (এই বিধানকে) অস্বীকার করে তবে (তার জেনে রাখা উচিত), নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মানুষদের মুখাপেক্ষী নন।"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

ইসলামের এ আপসহীন বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কেননা এটা সরাসরি ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শেরক, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব। এখানে সামান্যতম নমনীয়তার সুযোগ নেই। যারা চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছে তারা নিজেদেরকে হাজারবার মুসলমান দাবি করলেও মুসলমান নয়। তারা যদি ইসলামকে জাহেলিয়াতের স্তরে টেনে নামিয়ে এনে, মুসলমানকে টেনে জাহেলের পর্যায়ে নামিয়ে এনে নিজেদেরকে এবং অপরকে প্রবোধ দিতে চায় সেটা তাদের ব্যাপার। জীবননাশক বিষ খেয়ে যদি কেউ মনে করতে চায় যে, সে প্রাণজুড়ানো কোমল পানীয় পান করেছে;

অন্যকে যদি সে বুঝাতে চায় যে, সে কোমল পানীয় পান করছে তাতে কারোরই কিছু যায় আসে না এবং এতে বিষক্রিয়া কিছুমাত্র কমেও যাবে না। সময়মতো বিষক্রিয়া ঠিকই শুরু হবে এবং তার জীবনলীলাও সাঙ্গ হবে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ব্যাপারটিও এমন। জাহেলিয়াতের ভেতরে ডুবে থেকে সমাজের সামনে নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করার জন্য যতো সাফাই গাওয়া হোক তাতে কেউ সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায় না। তাই ইসলামি আন্দোলন শুরু করতে হলে সর্বপ্রথম পৈত্রিক সূত্রে সনদ পাওয়া এসব পথভ্রষ্ট মুসলমানদের আহ্বান করে সঠিকভাবে ইসলামে নিয়ে আসতে হবে।

আমরা যারা মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করি তাদেরকে মনে রাখতে হবে, কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় পাওয়ার জন্য কাউকে দাওয়াত দিই না। নিছক কোনো ক্ষমতা দখল আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বৈষয়িক স্বার্থের মোহে আমরা কাণ্ডজ্ঞানহীনও হয়ে পড়িনি। ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে এ রকম কোনো হীন উদ্দেশ্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থ জড়িত নয়; বরং আমরা আমাদের সকল নেক কাজের প্রতিদান আল্লাহর কাছেই আশা করি। মানুষকে আমরা ভালোবাসি বলেই আমরা তাদেরকে ইসলামের শান্তির নীড়ে আশ্রয় নেয়ার আহ্বান জানাই। জাহেলিয়াতের প্রভাবে থাকার কারণে আমাদের কল্যাণকামিতা যদি বুঝতে না পেরে তারা আমাদের ওপর উল্টো যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দেয় তবুও আমরা আমাদের পথ থেকে চুল পরিমাণ দূরে সরবো না। এটাই হলো একজন সত্যিকার দা'য়ীর বৈশিষ্ট্য।

আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। তা হলো ইসলাম প্রচার যেন শুধুমাত্র জ্বালাময়ী বক্তৃতা, আবেগঘন আলাপ-আলোচনার মাঝেই আবদ্ধ না থাকে। আমাদের বাস্তব কর্মকাণ্ড, আমল-আখলাক, চাল-চলন, আচার-আচরণ সবকিছুর মধ্য দিয়ে যেন ইসলামের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। এতে করে জাহেলিয়াতের মাঝে ডুবে থাকা একজন মানুষ খুব সহজভাবে বুঝতে পারবে যে, আসলে তাকে আমরা কোন পথে ডাকছি। আমাদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা, কাজকর্ম সবকিছুর মধ্য দিয়েই তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী কিংবা যে নামেই হোক না কেন—এই সমাজ নির্ভেজাল জাহেলি সমাজ। নির্দিষ্ট কিছু মানুষের খেয়ালখুশি ও স্বার্থপরতার ওপর ভিত্তি করেই এ সমাজ গড়ে উঠেছে। আল্লাহর শরিয়তের সাথে এর সম্পর্ক নেই। এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

আজ যে সব স্থূল চিন্তার দ্বীনদরদীরা ইসলামকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগেন, কাফির ও তাদের দোসরদের বিত্তবৈভব, প্রাচুর্য, শক্তি ক্ষমতা দেখে একেবারে চুপসে যান; আর ইসলামের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লাগেন তাদের মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের এমন কোনো অভাব নেই যার জন্য কোনো মুসলমানকে হীনমন্যতায় ভুগতে হবে। ইসলামের এমন কোনো দোষ বা দুর্বল দিক নেই যা চাপা দেয়ার জন্য আপনাকে ওকালতি করতে হবে। ইসলামের এমন কোনো ছিদ্র নেই যা আপনাকে বন্ধ করতে

হবে। এমন কোনো অপূর্ণতা নেই যা পূরণের জন্য আপনাকে জাহেলিয়াতের সাথে গিয়ে হাত মেলাতে হবে। মনগড়া কোনো উদ্ভট পদ্ধতিতে মানুষের মধ্যে 'ইসলাম প্রচারের' দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়নি। এজন্য ইসলামের ওপর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কিংবা কোনো ধরনের লেবেল আঁটার প্রয়োজন নেই। দা'য়ীর দায়িত্ব হলো পরিপূর্ণভাবে, প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে ইসলামের আহ্বান মানুষের সামনে তুলে ধরা। এটুকুই একজন দা'য়ীর দায়িত্ব। কে গ্রহণ করবে, কে করবে না–সেটা তদারকি করার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়নি।

বিশ্বজুড়ে জাহেলিয়াতের সদর্প পদচারণা ও বিজয় দেখে মুসলমানদের অনেকেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে জাহেলিয়াতের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। এই মানসিক পরাজয়ের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাদের মনে নানা ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি জন্ম নিয়েছে। এসব নানাবিধ মানসিক ব্যাধির কারণে তারা আজ জাহেলি জীবনব্যবস্থার মাঝে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকগুলো খুঁজে বের করতে শুরু করে দিয়েছে। যখন তারা বোঝে, যুক্তির মারপ্যাঁচে, যুগ চাহিদার দোহাই দিয়ে জাহেলিয়াতের কোনো বিশেষ পথ বা পদ্ধতিকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে প্রমাণ করার ক্ষীণ সুযোগ রয়েছে, তখনই তারা উঠেপড়ে লেগে যায় জাহেলিয়াতের এসব বিধিব্যবস্থাগুলোকে ইসলামাইজ্‌ড (ইসলামিকরণ) করার জন্য। তারা নির্বোধের মতো তখন বলতে থাকে যে, 'এসব ব্যবস্থার প্রবর্তন তো এক সময় ইসলামই করেছিলো।'

যে ব্যক্তি ইসলামি ব্যবস্থার কোনো নিয়ম-নীতি সঠিক প্রমাণ করার জন্য আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে, ইসলামি ব্যবস্থার বাস্তবমুখিতা প্রমাণের জন্য কোনো সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করে সে জাহেলিয়াতের চাকচিক্য দেখে মানসিকভাবে আগেই পরাজয় বরণ করে বসে আছে। তারপক্ষে দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়, তার দ্বারা দ্বীনের কোনো কল্যাণ সাধনই সম্ভব নয়। কারণ, সে দ্বীনের একজন নির্বোধ সমর্থক। এসব নির্বোধ লোকেরা জাহেলিয়াতের মাঝে ইসলামের সমর্থন খুঁজে বেড়ায়। কোনো বিধর্মী ইসলামের পক্ষে কিছু বললে সে পুলকিত হয়। তাদের এসব আচরণ দ্বারা নিজের অজান্তেই জাহেলিয়াতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এদের নিষ্ঠা যতোই থাকুক না কেন, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, কালের পরিক্রমায় এরা আজ নিজেদের অজান্তেই ইসলামের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তাদের দ্বারা ইসলামের কোনো উপকার তো হয়ই না; বরং অনেক মানুষ তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। তারা বিভিন্ন আলোচনার মজলিসে ইসলামের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য এমন আপ্রাণ চেষ্টা করেন, এমন সব দুর্লভ বৈজ্ঞানিক দলীল-প্রমাণ পেশ করেন, যা দেখে মনে হয় ইসলাম এক ফাঁসীর আসামী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে; আর তিনি তাকে বিচারকের দণ্ড থেকে বাঁচানোর জন্য উকিল হিসেবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আমি আমেরিকায় থাকাকালে ইসলামের পক্ষ বিপক্ষের বেশকিছু লোকজনের সাথে পরিচয় ছিলো। তখনো আমি দেখতাম যে, ইসলামের পক্ষের লোকেরা সব সময়ই

যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে নিছক আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। এগুলো দেখে রাগে ক্ষোভে আমার গা জ্বলে যেতো। আমি কিছুতেই সেসব ইসলামবিদ্বেষীদের ছেড়ে দিতাম না। আমি বরং তাদের জাহেলি জীবনব্যবস্থার কুফল, তাদের শোষণমূলক সুদভিত্তিক অর্থনীতি, নৈতিকতা বিবর্জিত উচ্ছৃঙ্খলতা–এসবের দিকে ইংগিত করে তাদেরকে পাল্টা আঘাত হানতাম। আমি বলতাম, তোমাদের এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যা চলছে তাতে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা বলতে কিছু নেই। শাসনের ডাণ্ডা ছাড়া কাউকেই কোনো কিছু মানানো যায় না। মানবতাবোধ বর্জন করে বস্তুবাদী হওয়ার কারণে তোমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটেছে। খোলামেলা জীবনব্যবস্থার নামে, নারী স্বাধীনতার নামে, অবাধ যৌনতা, বেহায়াপনা নষ্টামী, পশুসুলভ যৌনাচার ও নোংরামিতে তোমাদের সমাজ ছেয়ে গেছে। পারিবারিক পবিত্র বন্ধন বলতে তোমাদের কিছুই নেই। বিয়ে তালাকের ক্ষেত্রে তোমাদের মনগড়া, অযৌক্তিক, অন্তঃসারশূন্য ও অবাস্তব আইন-কানুনের দরুন দাম্পত্য জীবন নিছক ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে। ভাবাবেগপ্রসূত বর্ণবাদকে তোমরা জিইয়ে রেখেছো, ... বলো, এর কোন্টা মানুষের জন্য কল্যাণকর? বলো, এর কোন্টার মাঝে মানবতাবোধের ছাপ আছে?

অন্যদিকে তোমরা ইসলামের বাস্তবমুখিতা, কল্যাণকামিতার দিকে একটু চেয়ে দেখো! এ জীবনব্যবস্থা মানুষকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছে তেমন সম্মান কোনো ব্যবস্থাই দেয়নি। প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রকৃতিই এই উঁচু আসনে আরোহণ করতে চায়। প্রত্যেকটি মানুষের সহজাত প্রকৃতির সাথে ইসলামের এক গভীর মিল বিদ্যমান। তাই মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্য, স্বভাবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ইসলাম মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান পেশ করে।

পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাওয়ার কারণে এর অসারতা, অন্তঃসারশূন্যতাগুলো আমার খুব ভালোভাবে জানা ছিলো। তাই ইসলামের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে যখন আমি জাহেলি জীবনব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করতাম তখন পাশ্চাত্যের অন্ধ সমর্থকরাও লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতো। লজ্জায় তারা মুখ লুকানোর জায়গা পেতো না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো কালের চক্রে আজ মুসলমান সমাজে এমন সব দ্বীনদারদের আবির্ভাব ঘটেছে যারা জাহেলিয়াতের পূতিগন্ধময় আবর্জনা ও ঘৃণ্য বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামের সাদৃশ্যপূর্ণ নিয়ম-কানুন খুঁজে বেড়ায়। এরা আসলে জাহেলিয়াতের জয়জয়কার দেখে নিজেদের অজান্তে জাহেলিয়াতের কাছে পরাজয় বরণ করে নিয়েছে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির আপসহীনতা

আশা করি বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দ্বীনের পথে আহ্বানকারী কোনো ব্যক্তির বা দলের পক্ষে এটা আদৌ সমীচীন নয় যে, সে জাহেলি রাজনৈতিক ধারার কোনো নিয়মনীতির সাথে খাপ খাইয়ে চলবে। এই ধরনের পরাজিত

নীতি গ্রহণ করার অর্থ হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে গলাটিপে হত্যা করা। তাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার গোটা পদ্ধতিটাই হতে হবে রাসূলের সুন্নাহ থেকে। এক্ষেত্রে প্রচলিত কোনো জাহেলি রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের সাথে আপস করা কিছুতেই বৈধ নয়। জাহেলি রাজনীতি চলবে জাহেলি নিয়মনীতি অনুযায়ী, আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলবে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী। এ কারণে জাহেলি নেতৃত্ব যদি ইসলামি আন্দোলনকর্মীদের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলারও চালিয়ে দেয়, তবুও কোনো আপস করা চলবে না। পরিস্থিতির সাথে কিংবা প্রচলিত জাহেলি রাজনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা কিছুতেই আমাদের কাজ হতে পারে না। কেননা, এসব জাহেলি রাজনীতিসহ যতো ধরনের জাহেলি নীতি-আদর্শ আছে সেগুলোকে উচ্ছেদ করে ইসলামি নীতি-আদর্শ প্রবর্তন করাই তো আমাদের মিশন। সুতরাং, যে জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করাটাই আমাদের মিশন সেই জাহেলিয়াতের সাথে সহাবস্থান কিংবা সহযোগিতামূলক কাজ করলে কখনোই আমাদের মিশন সফল হতে পারে না; বরং তখন মানুষ হয়তো আমাদেরকেও জাহেলিয়াতের ধারকবাহক হিসেবে অবমূল্যায়ন করতে শুরু করবে। কেননা, ইসলামকে বোঝার জন্য ইসলাম ও জাহেলিয়াতকে আলাদা আলাদাভাবে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু দুটো যদি রাজনৈতিকভাবে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, একই মঞ্চে কিংবা একই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যদি ইসলামি নেতৃত্ব ও জাহেলি নেতৃত্ব কথা বলে, তখন মানুষ ইসলামের ব্যাপারেই সংশয়ে পড়ে যাবে।

অনেক নির্বোধ দ্বীনদরদীরা আমাদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে, শুরুতে কিছুদিন যদি জাহেলি দলের সাথে সমতা রক্ষা করে চলা যায়, সংঘাত এড়িয়ে চলা যায়, তাহলে দ্বীন প্রচারের জন্য তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ওসব জাহেলি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাও ইসলামকে বোঝার একটা সুযোগ পাবে। কিন্তু না, কিছুতেই না, কস্মিনকালেও না।

এ ধরনের নীতি অবলম্বন করলে কখনোই ভালো ফলাফলের আশা করা যায় না। এতে মহান আল্লাহর শাশ্বত দ্বীনকে দুর্গন্ধময় জাহেলিয়াতের কাছে চরমভাবে অপমান করা হয়। এর মাধ্যমে জাহেলিয়াতের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেয়া হয়। এতে ইসলামকে দুর্বল, হীন, স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদাহীন একটি অনাদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

বর্তমান জাহেলি আদর্শের সমর্থক ও নেতৃস্থানীয় সবাই মিলে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমাদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। মুসলমান সমাজে বসবাসকারী মুনাফিকদের কাজে লাগিয়েও তারা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছে। ছলে-বলে, কলে-কৌশলে তারা আমাদেরকে দ্বীনের আলোকিত পথ থেকে সরিয়ে জাহেলিয়াতের অন্ধকার পথে নিয়ে যেতে চায়। এসব বাধা-বিপত্তির ব্যাপারে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এগুলো আমাদের চলার পথে অনিবার্য বাধা। এগুলো তো

আসবেই। আরো কতো ধরনের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে। এসব মোহ এ পথের অপরিহার্য প্রতিবন্ধক। এপথে চলতে গেলে এসব বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করতে হয় বলেই তো এ পথ একটি মহান পথ, সৌভাগ্যবানদের পথ, বীর সাহসী মানুষদের পথ। যেন তেন মানুষরা তো এমন প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না।

তাই আমরা যদি সত্যিই আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে আমাদেরকে বিক্রি করে থাকি তাহলে অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে এসব বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিকূলতাকে জয় করাই তো আমাদের কাজ। আমরা জাহেলিয়াতের ওপর বিজয়ী হবো। ইসলামের মহান আদর্শের তুলনায় জাহেলি অনাদর্শগুলো যে কতো জঘন্য, কতো নীচ ও অকল্যাণকর তা আমরা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেবো।

এই কাজ সম্পন্ন করতে হলে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তাই কিছুদিন জাহেলিয়াতের সাথে মিলে মিশে থাকা, কিছুটা সমতা রক্ষা করা, সহাবস্থান করা সম্ভব নয়। এজন্য জাহেলিয়াত থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই বিচ্ছিন্ন করা অর্থ 'সমাজ ছেড়ে, লোকালয় ছেড়ে, আপনি গিয়ে মসজিদের কোণ কিংবা জংগলে আশ্রয় নিবেন'–তা নয়। আমরা যতোদিন পৃথিবীর কোথাও দারুল ইসলাম না পাবো ততোদিন পর্যন্ত এই জাহেলি সমাজেই বসবাস করবো।

তবে এটা হবে ঠিক পদ্মা-মেঘনার পানির মতো। একই সাথে উভয় নদীর পানি বয়ে চলে, তবে কারো সাথে কারো মিল নেই, কারো সাথে কেউ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় না। দেখলেই বোঝা যায়, এই ধারাটি পদ্মার স্বচ্ছ পানির, আর এই ধারাটি মেঘনার ঘোলাপানির। আমরা এই সমাজেই থাকবো তবে নিজেদের অবস্থান, মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে। আমরা ইসলামের দাওয়াত দেবো আপসহীনভাবে, তবে সহানুভূতিশীল মানসিকতা নিয়ে। আমরা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার সামনে তুলে ধরবো, শিষ্টাচার ও শালীনতার মাধ্যমে; উগ্রতার মধ্য দিয়ে নয়। আমরা সমাজের মানুষের সাথে লেনদেন করবো ঠিকই, অর্থের মোহে অন্ধ অন্য পাঁচজন দুনিয়া পূজারীদের মতো নয়; বরং নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা বহাল রেখে।

মনে রাখতে হবে, আমরা যে সমাজে বসবাস করছি তা নিঃসন্দেহে নির্ভেজাল জাহেলিসমাজ। আমরা এই জাহেলিয়াতের মাঝেই বড় হয়েছি। অথচ এ অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থাকেই আমরা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাই, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই এবং এই জাতিকে আমরা ইসলামের সুমহান আদর্শের আলোকিত পথে তুলে দিতে চাই। এটা চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজন এক সুদূরপ্রসারী, দীর্ঘমেয়াদী ও নিখুঁত পরিকল্পনা। প্রয়োজনীয় সকল উপায়-উপকরণ যদি ঠিক থাকে, পরিকল্পনা ও কর্মনীতি যদি সঠিকভাবে সুন্নাহ অনুযায়ী হয়, সর্বোপরি যদি আল্লাহর মর্জি হয় তবেই এ সংগ্রাম

সফল হতে পারে। কেননা, যে জাহেলিয়াতের মাঝে মানুষ ডুবে রয়েছে তার ও ইসলামের মাঝে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। এ জাহেলিয়াত ও ইসলামকে একত্রিকরণের জন্য কোনো পুল বা সাঁকো নির্মাণ সম্ভব নয়। সামান্য কিছু রদবদল কিংবা জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামকে জোড়াতালি দিয়েও চালানো সম্ভব নয়। তবে এমন একটি সংযোগ-সেতু অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে যেটি দিয়ে মানুষ জাহেলিয়াতকে ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিতে পারে। এরা মুসলমান নামধারী জাহেলি সমাজের সদস্য হোক বা সরাসরি বিধর্মী হোক সবার জন্য এই পথ খোলা রাখতে হবে। যারা ইসলামের আলোয় আলোকিত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই জাহেলিয়াত বর্জন করে ইসলামের পথে আসতে হবে। আর যারা আলোর পথে আসতে আগ্রহী নয়, যারা কিছুতেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসতে আগ্রহী নয় তাদেরকে আগ্রহী করে তোলার জন্য, তাদের মন ভুলানোর জন্য, তাদের সাথে মিলেমিশে থাকার জন্য আমরা যেন ইসলামের কোনো আপসহীন বক্তব্যকে নমনীয় করে না বলি, কোনো রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না বলি। তাদের ব্যাপারে আমরাও তা-ই বলবো যা বলতে আল্লাহ তাআলা রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ 'লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন'।

একাদশ অধ্যায়

ঈমানের মর্যাদা

"তোমরা হতোদ্যম হইও না, চিন্তিতও হইও না; তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯)

এখানে যে আয়াতটি আমি তুলে ধরেছি সেটি পাঠ করলে সাধারণভাবে পাঠকরা যে অর্থ বুঝে থাকেন তাহলো, আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুমিনদের বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। বলেছেন, তোমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই, তোমরা বিজয়ী হবেই।

সাধারণভাবে আয়াতটি পড়লে এমন ধারণা আসাটা কিছুতেই অস্বাভাবিক নয় এবং এটা আয়াতের একটা অর্থও বটে। তবে যদি আমরা আয়াতটির মর্মের আরো গভীরে প্রবেশ করতে পারি তাহলে দেখতে পাবো, আয়াতটি আরো অনেক ব্যাপক অর্থ ধারণ করে আছে। আয়াতটি একজন মুমিনের মানসিক অবস্থার এক বাস্তব ছবি এঁকে দিয়েছে। আয়াতটির অর্থের মাঝে একজন মুমিনের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ফুটে উঠেছে। আয়াতটিতে একজন মুমিন কোন্ মানদণ্ডে কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ করে, কীভাবে সে জীবনের হিসাব মেলায় সবই ফুটে উঠেছে।

আয়াতটি আমাদের বলে দেয় যে, একজন মুমিন যে কোনো অবস্থায় যে কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তার ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলবে। যতো কঠিন পরিস্থিতিরই সে সম্মুখীন হোক না কেন, ঈমানের মূলনীতির ভিত্তিতেই কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। ঈমানের দৃষ্টিতেই যাচাই করবে যে, সে কোন্‌টা গ্রহণ করবে এবং কোন্‌টা বর্জন করবে। কোনো কিছু গ্রহণ করার কিংবা বর্জন করার জন্য ঈমানী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া যতো ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে সেগুলোকে সে নির্দ্বিধায় বর্জন করবে। যেসব বস্তুগত শক্তির সাথে ঈমানী শক্তির সম্পর্ক নেই, সেসব বস্তুর কোনো গুরুত্বই মুমিনের কাছে নেই। যেসব রীতিনীতি, আইন-কানুন, রসম-রেওয়ায, শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে ঈমানের সম্পর্ক নেই তা সমাজে যতোই প্রচলিত হোক না কেন মুমিনের কাছে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। ঈমানের মর্যাদা সমুন্নত করার স্বার্থেই একজন মুমিন সেগুলোকে স্বেচ্ছায় সানন্দে ও আগ্রহের সাথে পরিত্যাগ করে।

শক্তি বলতে মুমিন শুধু ঈমানী শক্তিকেই বোঝে। ঈমানী শক্তিই তার একমাত্র কার্যকরি শক্তি, ঈমানের সম্পদই তার কাছে অমূল্য সম্পদ। এই শক্তির বলেই দোর্দণ্ড ক্ষমতাশালী ও স্বৈরাচারী শাসকদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলতে একজন মুমিনের কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপে না। এ শক্তিবলে কিছুতেই সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে

মাথা নত করে না। সামাজিক কোনো রীতিনীতি, আইন-কানুন, শাসনব্যবস্থা যতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠুক না কেন, ঈমানের মানদণ্ডে উন্নীত না হলে তা একজন মুমিন গ্রহণ করতে পারে না।

সশস্ত্র যুদ্ধ তো জীবনের একটি অংশ মাত্র, নির্দিষ্ট কিছু সময়েই তা হয়ে থাকে; কিন্তু একজন মুমিন তো প্রতিটি মুহূর্তে ঈমানহীনতা ও জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলে। আর সশস্ত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রেও মুমিনগণ অস্ত্রশস্ত্র তথা বস্তুগত শক্তির দিক থেকে যতোই দুর্বল হোক, সংখ্যায় তারা যতো কমই হোক, ঈমানের মর্যাদা সমুন্নত রেখেই একজন মুমিন তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব ও, ঈমানী মূল্যবোধকে সে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে না। ঈমানের প্রভাবে মানুষের মনে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তা কোনো সাময়িক ভাবাবেগ নয়, এটা এক চিরস্থায়ী ও শাশ্বত শক্তি। এটা মহাসত্যের প্রতি বিশ্বাসের স্বাভাবিক প্রতিফলন। এই মহাসত্য কোনো দোদুল্যমান চেতনা নয়। এই চেতনা সকল যুক্তি, সকল চাপ, সকল রসম-রেওয়ায ও প্রচলিত রীতিনীতির ঊর্ধ্বে স্থান করে নেয়। জাতিগত কিংবা বংশানুক্রমে পাওয়া যে কোনো রীতিনীতিকে এই আদর্শের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। সকল রীতিনীতির চেয়ে এই আদর্শ অনেক বেশি মজবুত ও বেশি স্থায়ী শক্তি সৃষ্টি করে।

নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, আইন-বিধান মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামি সমাজ না থাকলে সেখানে কোনো না কোনো ধরনের জাহেলি নীতি আদর্শ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এক সময় এসব রীতি-নীতির শেকলে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া জাহেলি সমাজের 'নেতা' নামক মানবকীটগুলো তো আছেই। এরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজের সাধারণ মানুষদেরকে এসব নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য করে। তখন যেনতেন লোকের পক্ষে সমাজের স্রোতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব হয় না। কোনো শক্তিশালী আশ্রয় ছাড়া এই সব ভ্রান্ত নিয়মনীতির বেড়াজাল ছিন্ন করা যায় না। সমাজে প্রতিষ্ঠিত নীতি-আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রসম-রেওয়ায দ্বারা মানুষ স্বাভাবিক কারণেই প্রভাবিত থাকে। সুতরাং, এতোসব কুপ্রভাবের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা কেবল তখনই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, যখন সে এমন মহান আদর্শের সন্ধান পায় যা তার প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। যখন মানুষ উন্নত চেতনা ও আদর্শের ছোঁয়া পায় তখনই সে দীর্ঘদিনের লালিত জাহেলিয়াতের অসারতা উপলব্ধি করতে পারে। আর তখনই তা বর্জন করে নতুন ও মহান আদর্শের ছায়ায় আশ্রয় নিতে এগিয়ে আসে। মানুষ কখনো আদর্শ ছাড়া থাকতে পারে না। তা যে ধরনেরই হোক না কেন। হয় সে ইসলামি আদর্শ গ্রহণ করবে, না হয় জাহেলি আদর্শ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ কোনো না কোনো আদর্শের মাঝে থাকার চাহিদা মানুষের প্রকৃতিগত।

সমাজের স্রোতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য যেমন প্রয়োজন আত্মিক শক্তি ও মনের জোর, তেমনি প্রয়োজন এক মহাপরাক্রমশালী

পরাক্রান্ত সত্তার আশ্রয় ও সাহায্য। বিপদে-মুসিবতে আশ্রয় নেয়ার, হৃদয়ের একান্ত আকুতিটুকু জানানোর কোনো স্থান যদি না থাকে তাহলে মুমিন শুধু নিজেকে অসহায়ই মনে করবে না বরং সারা দুনিয়াতেও হয়তো সে একটু আশ্রয় খুঁজে পাবে না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন কি তাঁরই পথে জীবন উৎসর্গকারী মুমিনদেরকে এমন অসহায় করে ছেড়ে দিতে পারেন?–কিছুতেই নয়।

এই দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদের মাঝে মুমিনগণ যেন কিছুতেই নিজেদেরকে একা না ভাবে, শেকড়হীন, আশ্রয়হীন না ভাবে; বরং তারা যেন সব সময় এ বিশ্বাস রাখে যে, আমরা এমন এক শক্তিশালী সত্তার আশ্রয়ে আছি, যিনি সৃষ্টিজগতের একক সার্বভৌম ও মহাশক্তিধর সত্তা। আমরা যেহেতু তাঁর পথেই লড়ছি, সুতরাং, বস্তুগত দৃষ্টিতে অবস্থা যাই হোক না কেন, চূড়ান্তভাবে আমরাই বিজয়ী হবো। তাই তো আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন–

"তোমরা হতোদ্যম হইও না, চিন্তিতও হইও না, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯)

যুলুম-নির্যাতন, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে মনোবল হারিয়ে ফেলা, দমে যাওয়া, উৎসাহ হারিয়ে ফেলা–এগুলো মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। তাই মুমিন যাতে কোনো অবস্থাতেই এসব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কাছে পরাজিত না হয় এজন্যই আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে বিরাট এক আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ববোধ, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের মাহাত্ম্যতা মুমিনকে এতো উঁচুতে নিয়ে যায় যে, সে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত তাগুতের হম্বিতম্বি, গর্জন হুংকার কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করে না। সকল ধরনের তাগুতি রীতিনীতি, আচার-আচরণ, আইন-কানুনের প্রতি সে ঘৃণা পোষণ করে। এসব কারণে একজন মুমিন নিজে বস্তুগত সমাজের অনেক উর্ধ্বে উঠে সমাজকে মূল্যায়ন করে। ধৈর্য, সহনশীলতা আর দৃঢ়তার বলে একজন মুমিন ঈমানের পথে টিকে থাকে এবং জাহেলি আদর্শের তুলনায় ইসলামের আদর্শকে সে অনেক উন্নত বলে জানে। তার এ শ্রেষ্ঠত্ববোধই তাকে সকল প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবেলার সাহস যোগায়।

একজন মুমিনের কাছে বস্তুবাদী সমাজের সকল জাঁকজমক ও জৌলুসই তুচ্ছ। জাহেলি সমাজের মূল্যবোধ, মানদণ্ড, রীতিনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই তার কাছে ঘৃণ্য। তাগুতি শাসনব্যবস্থার ধারকেরা যতোই শক্তি ও বাহাদুরী দেখাক, মুমিন তাকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। সুতরাং, একজন মুমিন আসলেই সকল বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ। তার আদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ সবকিছুই শ্রেষ্ঠ। এ কারণে এই সমাজের হুজুগে মাতাল জনগণ গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোনো বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়লেও একজন মুমিন তা গ্রহণ করে নেয় না। মুমিন তার গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড গ্রহণ করেছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে। তার জ্ঞানের উৎস হলেন মহাজ্ঞানী সত্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তাঁর কাছ থেকেই সে পথনির্দেশ নেয়, তাঁর কাছ থেকেই সে জেনে

নেয় কোন্‌টা সে গ্রহণ করবে, কোন্‌টা বর্জন করবে। কাকে ঘৃণা করবে, আর কাকে ভালোবাসবে। তিনি যে নির্দেশনা দেন তা সে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচ চিত্তে, স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে চলে।

ইসলামি আদর্শ তাকে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে তার মাধ্যমে সে অবিনশ্বর ও চিরন্তন মহাসত্যের সাথে পরিচিত হতে পেরেছে। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে তার কাছে কোনো জটিলতা নেই। কেননা, তাওহিদি আকিদা-বিশ্বাস যে দর্শন তাকে উপহার দিয়েছে তা নতুন পুরাতন সকল শিরকী চিন্তা-চেতনার নোংরা আবর্জনা থেকে পূত পবিত্র এক মহান আদর্শ। পৌত্তলিকতা, পথভ্রষ্ট আহলে কিতাব সম্প্রদায়সহ আরো যতো আকিদা-বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রচলিত তা পর্যালোচনা করলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ইসলাম যে তাওহিদি দর্শন পেশ করেছে তা অন্য সকল দর্শনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহান ও উন্নত; বরং বলা যায়, ইসলামের সাথে সেগুলোর কোনো তুলনাই চলে না। ধন-সম্পদ, জীবন-মরণ, গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কে ইসলাম যে দর্শন পেশ করেছে তা অন্য সকল ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনের তুলনায় অনেক উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত। কেননা, অন্য সকল আদর্শগুলো মানুষকে তার বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সংকীর্ণতার মাঝে আবদ্ধ করে ফেলে, পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে এই সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক সুবিশাল মহাসত্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। এই মহাসত্য এমন শাশ্বত ও চিরন্তন বিশ্বাস যে, তা কখনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় না, কালের চক্রে হারিয়ে যায় না; এর কোনো সংস্কার বা পরিমার্জন নেই বরং চিরকালই এক। অথচ মানবরচিত এসব আইন-কানুনগুলোর অস্তিত্বই হলো কতোগুলো পরস্পরবিরোধী ঠুনকো নিয়মনীতির ওপর। তাই দেখা যায়, এসব মানবরচিত মতাদর্শের প্রবক্তারা সকালে বলে এক কথা, আর বিকেলে বলে আর এক কথা। আজ এক আইন প্রণয়ন করলো, তো কাল আরেকটা। অথবা সকালে এই আইন বানালো তো বিকেলে সংশোধনী (amendment) এনে পরিবর্তিত আরেকটা। কত হাস্যকর ব্যাপার! দেখা যায়–একজন যা গ্রহণ করে, অন্যজন তা বর্জন করে। একজন যা ঘৃণা করে, অন্যজন তা ভালোবাসে। যার কারণে এসব আইন-কানুন, নীতি-আদর্শ মানুষের জীবনে অকল্যাণ তথা ক্ষতি ও অধঃপতন ছাড়া ইতিবাচক কিছুই সংযোজন করেনি।

মুমিনের নৈতিক ও আদর্শিক উন্নতির আর একটি কারণ হলো, সে যে মহান সত্তার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি তো অসংখ্য পূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত। এ কারণে তার প্রতি ঈমান আনার স্বাভাবিক দাবিতেই একজন মুমিন সকল ভালো কিছু অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা করে। মুমিনের বিশ্বাসই তাকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে, তার আচার-আচরণে শিষ্টাচার আনয়ন করে, তার রুচিতে মননশীলতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাবোধের জন্ম দেয়। তাছাড়া একজন মুমিন যখন নিজেকে আল্লাহর খলীফা হিসেবে চিন্তা করে তখন তার মধ্যে এই পৃথিবীকে সুন্দর ও শান্তিময় করে গড়ে

তোলার জন্য এক অদম্য দায়িত্ববোধ জন্ম নেয়। পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাসের কারণে এমনিতেই মুমিনের কাছে এই ক্ষণিকের পার্থিব জীবনের কোনো মূল্য থাকে না; বরং পরকালীন জীবনে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আশায় সে সততা, নিষ্ঠা ও উত্তম গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করে। এই গুণাবলী অর্জন করতে গিয়ে তাকে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়, যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয় সেগুলোকে সে সহাস্যবদনে বরণ করে নেয়। সে জানে সীমাহীন, মৃত্যুহীন, অসীম সুখময় পরকালের তুলনায় ক্ষণিকের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ভোগ-বিলাস খুবই সামান্য। এ উন্নত চিন্তা ও মহৎ অনুভূতির কারণে মুমিনের অন্তরে এক গভীর প্রশান্তি জন্ম নেয়। তাই সে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত হয়েও কখনো বিন্দুমাত্র হতাশাবোধ করে না এবং কারো কাছে কোনোরকম অভিযোগ করে না। বাহ্যিক পরিস্থিতি যতোই দুর্বল হোক না কেন সে কখনো বিন্দুমাত্র হীনমন্যতায় ভোগে না।

পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানবজাতি যতো রকম মনগড়া মতবাদ আবিষ্কার করেছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে একজন মুমিন সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারে যে, মানুষের রচিত এসব আইন-কানুন, নীতিমালা ও আদর্শ ইসলামি আদর্শ ও আইন-কানুনের সাথে তুলনা করার যোগ্য নয়। স্থূল দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমাবদ্ধ তুচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী মানুষ তাদের জীবনবিধান রচনা করতে গিয়ে যেভাবে দিগ্বিদিক ছুটছে, এখনে ওখানে হোঁচট খাচ্ছে, তাকে সহযোগীহীন একজন অন্ধের পথ চলার সাথেই তুলনা করা যায়। মুমিন নিজে এই পথহারা মানবজাতির অবস্থান থেকে স্বাভাবিক কারণেই অনেক উপরে উঠে যায়। সেখান থেকে দিশেহারা মানুষগুলোর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলার দৃশ্য দেখে সে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে–তার নিজের অবস্থা, আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, জীবন চলার পথ সবকিছুই এদের চেয়ে অনেক উন্নত; এবং বলা যায়, এ দুটোর একটির সাথে আরেকটির কোনো তুলনাই হয় না। মুমিন দেখতে পায়, এই জাহেলি সমাজের মানুষগুলো ঠুনকো, সীমিত ও ক্ষণিকের একটু সুখ, শান্তি ও ক্ষমতা পেয়ে তাতেই বিভোর হয়ে রয়েছে। সে আরও দেখতে পায়, সামান্য অস্থায়ী ধনসম্পদ, অর্থবিত্ত ও ভোগবিলাসের পেছনে কীভাবে মানুষগুলো হন্যে হয়ে ছুটছে।

আজকাল অনেকে মনে করে যে, জাহেলি যুগ তো ছিলো সেই চৌদ্দশত বছর আগের যুগ। আমরা তো এখন ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগে বাস করছি, আমাদের এটা তো আলোকিত যুগ। তাদের এই ধারণা নিঃসন্দেহে ভুল। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে যে সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তাও সেই চৌদ্দশত বছর আগের যুগের মতো একই মানের জাহেলি যুগ। কেননা, জাহেলি যুগ কোনো নির্দিষ্ট যুগের নাম নয়। অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ যে কোনো যুগেই হোক না কেন মানুষ যদি আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা পরিত্যাগ করে তাহলে সেই যুগই জাহেলি যুগ হিসেবে গণ্য হবে।

ইতিহাসখ্যাত পারস্য বীর সেনাপতি রুস্তমের জৌলুসপূর্ণ রাজকীয় জাঁকজমক দেখে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী মুগীরা বিন শো'বা (রা.) যে মন্তব্য করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ঐতিহাসিক আবু ওসমান আন নাহদীর বর্ণনায় তা তুলে ধরা হলো ঃ

'রোম পরাজিত হওয়ার পর মুগীরা বিন শো'বা (রা.) রোমের সৈন্য শিবিরে গেলেন। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাকে বসিয়ে রেখে সেনাপতি রুস্তমের অনুমতি আনতে গেলো, তিনি এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখছিলেন, যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জাঁকজমক মোটেই হ্রাস পায়নি। শিবিরের সকলের পরনে সেনাবাহিনীর নির্দিষ্ট পোশাক রয়েছে। কারো মাথায় সোনার মুকুট, কারো কাপড় চোপড়ে স্বর্ণের কারুকাজ খচিত। রুস্তমের সিংহাসন থেকে প্রায় একশ' গজেরও বেশি দূর পর্যন্ত দামী কার্পেটে মোড়ানো।

অনুমতি নিয়ে আসলে তিনি নিঃসংকোচচিত্তে সোজা হেঁটে গিয়ে রুস্তমের পার্শ্বের চেয়ারে বসে পড়লেন। দরবারের লোকজন তো দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। নিরাপত্তা প্রহরীরা ছুটে গিয়ে মুগীরা (রা) কে সেখান থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করতে গেলে তিনি সবার মুখের ওপর বলে দেন, 'আমরা এতোদিন শুনে আসছিলাম যে, তোমরা বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক দিক থেকেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু এখন দেখছি এগুলো সবই ফাঁকা বুলি। তোমরা তো বোকা ও নির্বোধ জাতি।

আমাদের সমাজে মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই সমান মর্যাদার অধিকারী। কেউ কারো গোলামও নয়, কেউ কারো মনিবও নয়। যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারটাই শুধু কিছুটা ভিন্ন। এছাড়া সকলেই সমান। কারো মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমি তো ভেবেছিলাম তোমরাও মানুষকে আমাদের মতো মানুষ হিসেবেই সমান মর্যাদা দিয়ে থাকো। কিন্তু আমি বাস্তবে যা দেখলাম তাতে সত্যিই অবাক। তোমরা আমার সাথে যে আচরণ করলে তা তো কোনো সভ্য সমাজের আচরণ নয়, তোমরা আমাকে এখানে আসার আগেই জানিয়ে দিতে পারতে যে, তোমরা কিছু লোককে তোমাদের ওপর প্রভু বানিয়ে রেখেছো এবং তোমরা তাদের গোলামী করছো। তোমরা যদি সভ্য হতে তাহলে কিছুতেই আমার সাথে এমন আচরণ করতে পারতে না। আমি তোমাদের কাছে নিজ আগ্রহে কোনো দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য নয়; বরং তোমাদের আমন্ত্রণেই এসেছি। সুতরাং, এমন আচরণ কোনো আমন্ত্রিত মেহমান তো দূরের কথা, কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই শোভনীয় নয়। তোমাদের আচরণ দেখে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তোমাদের সামাজিক কাঠামো একেবারেই ভংগুর। এ ধরনের নীচ, হীন ও দাসত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে কখনোই কোনো সমাজ টিকে থাকতে পারে না।'

কাদেসিয়া যুদ্ধের সময় হযরত রাবী বিন আমের (রা) এর ঘটনাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ যুদ্ধের পূর্বে শত্রুপক্ষের আমন্ত্রণে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) হযরত রাবী বিন আমের (রা)-কে দূত হিসেবে পারস্য সম্রাটের সেনাপ্রধানের কাছে পাঠান। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, স্বর্ণের মুকুট পড়ে মণিমুক্তা খচিত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে সে দামী বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। চারিদিকে মূল্যবান আসবাবপত্র। দামী কার্পেট দিয়ে পুরো দরবার এলাকা মোড়ানো। রাবী বিন আমের (রা) ছোট একটি ঢাল হাতে নিয়ে জীর্ণশীর্ণ একটি ঘোড়ায় চড়ে দরবারে প্রবেশ করেন। ঘোড়াটি বেঁধে রেখে যুদ্ধের পোশাক, শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম পরেই রুস্তমের কাছে চলে যাচ্ছিলেন। রুস্তমের সামনে যাওয়ার আগে নিরাপত্তা প্রহরীরা তাকে যুদ্ধের পোশাক খুলে যেতে বললে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদের প্রতিবাদ করে বলেন, নিজের কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছায় নয়; বরং তোমাদের আমন্ত্রণে দূত হিসেবেই আমি এখানে এসেছি। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে যদি তোমাদের কোনো আপত্তি থাকে কিংবা পছন্দ না হয় তাহলে আমি এক্ষুণি চলে যাবো। রুস্তম তার কথা শুনে বললো, তাকে আসতে দাও। তিনি বর্শা হাতে নিয়েই এগিয়ে গেলেন। তার বর্শার খোঁচায় খোঁচায় মূল্যবান কার্পেট ছিঁড়ে যাচ্ছিলো। রুস্তম তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কেন এসেছো? তিনি অত্যন্ত সাবলীল ও জড়তাহীন ভাষায় বলছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের মানবজাতিকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে একমাত্র তাঁর গোলামীতে নিয়োজিত করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। মানুষকে পার্থিব জগতের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে আখেরাতের প্রশস্ত জগতের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া আমাদের মিশন। মানবরচিত শাসনব্যবস্থার যাতাকল থেকে মুক্ত করে মানুষকে ইসলামের ন্যায়, ইনসাফ ও শান্তির সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)

এই ছিলো ইসলামের ইতিহাস, মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার নমুনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বর্তমান সময়ের মুসলিম জাতির, তারা এ ধারা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। কালের পরিক্রমায় ঈমানী দুর্বলতার কারণে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার, ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন হয়ে গেলো। পার্থিব জীবনের মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়ার ফলে মুসলমানের সেই তেজোদ্দীপ্ততা, বলিষ্ঠতা কালের চক্রে হারিয়ে গেলো। তারা হয়ে পড়লো শৌর্যবীর্যহীন এক কাপুরুষের জাতি। তবে আশার আলো একেবারে নিভেও যায়নি। সামগ্রিকভাবে সকলের মাঝে না থাকলেও ঈমানের অস্তিত্ব যাদের মাঝে রয়েছে তাদের মাঝে এখনো ঈমানী শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা বহাল তবিয়তেই রয়ে গেছে। পার্থিব বিবেচনায়, রাজনৈতিকভাবে তারা পরাজিত হলেও কখনোই তারা সামান্যতম কোনো হীনমন্যতায় ভোগে না। কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনের জাঁকজমক, অর্থবিত্ত, শক্তিক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। বৈশিষ্ট্যগতভাবেই বাতিল হলো ঘৃণ্য, জাহেলিয়াত হলো নীচ, হীন ও তুচ্ছ। পক্ষান্তরে, ঈমানী চেতনা সর্বাবস্থায়ই শ্রেষ্ঠ, মহান ও উঁচু। তাই মুমিন একথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে যে, আজ হোক কাল হোক, এই যুগে হোক বা আগামী যুগে হোক, এই

শতাব্দীতে হোক বা আগামী শতাব্দীতে হোক, এই প্রজন্মে হোক বা আগামী প্রজন্মে হোক–বাতিল ও জাহেলিয়াত সত্যের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবেই। আর পরকালীন জীবনে বাতিলের ধারকদের করুণ পরিণতি তো অবধারিত, তা এড়াবার কোনো উপায় নেই।

এই বলিষ্ঠ ও শাশ্বত বিশ্বাসবোধের কারণে একজন মুমিন কখনোই নিজেকে নীচ, হীন, তুচ্ছ, নগণ্য বা পরাজিত ভাবে না। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অহংকারী যালিম শাসকদের সামনে মাথা নত করে না এবং সত্য কথা বলতে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। সত্যের ঘোষণা দিতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর এতটুকুও কেঁপে ওঠে না। সে তো জানে যে, এসব অহংকারীদের জন্য রয়েছে অপমানজনক মৃত্যু, অথচ তার জন্য বরাদ্দ রয়েছে মহা সম্মানের শাহাদাত। সে জানে যে, ঈমান নিয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারলে তার জন্য রয়েছে সুশোভিত জান্নাত। আর প্রতিপক্ষের কাফিররা যদি এই ঈমানহীন অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের নিকৃষ্ট আবাস ও অপমানজনক কঠোর শাস্তি। তাই মুমিন তাদের এই সাময়িক ঠাঁটবাট, জাঁকজমক দেখে মোটেই প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ হয় না। এসব তুচ্ছ জাঁকজমকে প্রভাবিত না হওয়ার নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

"(হে মুহাম্মদ) শহরে নগরে কাফিরদের সদম্ভ পদচারণা যেন কোনোভাবেই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। (কেননা, এই দুনিয়ার প্রাচুর্য হচ্ছে) সামান্য কয়দিনের ভোগ মাত্র; অতঃপর তাদের (সবারই অনন্ত) নিবাস জাহান্নাম, আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল! আর যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে জান্নাত, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝরনাধারা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এ হবে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য) আতিথেয়তার স্বাগত সম্ভাষণ আর আল্লাহ তাআলার কাছে যে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্য অতি উত্তম জিনিস।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৬-১৯৮)

মুমিন যে চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে, জাহেলি সমাজে সাধারণত তার বিপরীত চিন্তাধারার স্রোত বয়ে যেতে দেখা যায়। সমাজের অসংখ্য মানুষের মাঝে হয়তো হাতেগোনা সামান্য কয়েকজন মানুষই দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। আর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছে। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু একজন মুমিন কিছুতেই এই অবস্থা দেখে সামান্যতম হীনমন্যতায় ভোগে না; কেননা, এক মুহূর্তের জন্যও এই বস্তুবাদী সমাজকে সে আদর্শ সমাজ ভাবে না। এই সমাজের মূলনীতি ও চিন্তাধারার চেয়ে তার লালিত নীতি-আদর্শ, আকিদা-বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সে কখনোই ভুলে যায় না। নিজের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, মান-সম্মান, বজায় রেখেই সে এই সমাজের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায়। সে তার উঁচু অবস্থান থেকে জাহেলিয়াতের ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত মানুষগুলোর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের বস্তুবাদী ভোগ-বিলাস, সাময়িক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি

দেখে সে একটুও প্রভাবিত বা প্রলুব্ধ হয় না এবং তাদের সাথে একই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় না; বরং নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রেখেই মানুষকে ইসলামের মহান আদর্শের দিকে আহ্বান করে, মুক্তির পথে ডাকতে থাকে। এই জাতি তো তারই কোনো না কোনো পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজন, নিকটজন, পাড়া–প্রতিবেশী অন্তত মানুষ হিসেবে তারই স্বজাতীয়। তাই তাদেরকে জাহেলিয়াতের ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার করার জন্য এক প্রবল আগ্রহ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

মুমিনগণ যখন একান্তই নিঃস্বার্থভাবে সমাজের মানুষকে আলোর মুখ দেখানোর জন্য, মুক্তির পথে তুলে আনার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে তখন প্রতিষ্ঠিত বাতিলপন্থী নেতারা সমাজে মুমিনদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করে, কুৎসা রটায়, তাদের সম্পর্কে নানারকম মিথ্যা আজগুবী কথা ছড়ায়, ভয়ভীতি দেখায়, বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করে, হৈ চৈ সৃষ্টি করে। এতেও সাধারণ জনগণকে এদের থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা সফল না হলে তারা শক্তি প্রয়োগের পথে পা বাড়ায়। হাকডাক ছাড়ে, তর্জন-গর্জন করে, গোঁফে তা দেয়, শক্ত হাতে দমন করার হুমকি দেয়। জেল জরিমানা করে, এমনকি চূড়ান্ত পর্যায়ে হত্যার হুমকি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাদের সাথে সঙ্গী হয়ে যায় তাদের রাজনৈতিক সহযোগী ও সুবিধাভোগী দল। এরা সবাই মিলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তাদের ও সত্যের মাঝে জাহেলিয়াতের পর্দা টেনে দেয়। ফলে মানুষগুলো যদি খুব সচেতন হয়ে, তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সত্যকে মোলাকাত করতে না চায় তাহলে তারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জাহেলিয়াতের অন্ধকারেই থেকে যায়।

মুমিন নিজের অবস্থানে থেকে জাহেলি সমাজের নেতাদের হম্বিতম্বি, তর্জন-গর্জন, আস্ফালন দেখতে থাকে। সে আরো দেখতে পায়, কীভাবে সাধারণ মানুষগুলো প্রতারিত হচ্ছে, প্রবঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু বাতিলের বস্তুবাদী শক্তিক্ষমতা বাহ্যত যতোই প্রবল হোক না কেন মুমিন তার দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় না, একটুও অসহায়ত্ব বোধ করে না, সামান্যতম দুর্বলতাও তার মনে জাগে না, তার আকিদা-বিশ্বাসের বন্ধন একটুও শিথিল হয় না, সত্যের আপসহীন বক্তব্য ও নীতি থেকে সে এক চুলও সরে দাঁড়ায় না; বরং প্রবঞ্চিত, প্রতারিত, অসহায় জনসমাজের দুরাবস্থা দেখে তার মনে তাদের জন্য আরো সহানুভূতি জেগে ওঠে, আরো করুণার উদ্রেক হয়।

স্থূলদৃষ্টিতে সাধারণত মানুষের কাছে জাহেলি সমাজের ধারাটাকেই প্রিয় মনে হয়। কেননা, এখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা, আইন-কানুন, বিধি-নিষেধের শেকল থেকে মুক্ত হয়ে বল্গাহীন ভোগ-বিলাস, বিকৃত আরাম-আয়েশ, পশুসুলভ অশ্লীলতা, নোংরামী, অবাধ যৌনতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনার স্রোতে ভেসে যাওয়া যায়। স্বাধীনতার নামে এখানে 'যা খুশি তাই করার' বিকৃত পাশবিক আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু মুমিন কিছুতেই তার ব্যক্তিত্ব, মান-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে এসবের কাছে বিসর্জন দিতে পারে না; বরং সে এসবের ঊর্ধ্বে উঠে নোংরামী, নষ্টামী ও বস্তুবাদী স্বার্থপরতার স্রোতে ভাসমান সমাজের মানুষগুলোর দিকে করুণার চোখে তাকায়। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য তার মনে

প্রবল আগ্রহ জেগে ওঠে। তাদের সাথে সে যতটুকু সম্পর্ক রাখে তা শুধুই দ্বীনের দাওয়াতটুকু তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এই সাময়িক রাজনৈতিক শক্তি, ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উল্লাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে কখনোই তার মনে আগ্রহ জাগে না। ঈমানের যে পবিত্র স্বাদ সে পেয়েছে, আকিদার যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সে পেয়েছে, তার কাছে সারা পৃথিবীর ভোগ-বিলাস ও মান-মর্যাদাও অতি তুচ্ছ মনে হয়।

ঈমানী মূল্যবোধ ধারণ করার জন্য সামাজিক পরিবেশের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে সমাজে পবিত্রতা ও শালীনতার কোনো মূল্য নেই, যে সমাজের মানুষের আত্মিক ও নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, যে সমাজের মানুষের কাছে আত্মসম্মানবোধের কোনো মূল্য নেই, সর্বোপরি যে সমাজের মানুষ আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিদ্রোহী, বিদ্বেষী কিংবা অবহেলাকারী, সেই সমাজে ঈমান আঁকড়ে বেঁচে থাকা হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত অংগার ধরে রাখার মতোই কঠিন। কিন্তু যতো কঠিনই হোক না কেন, মুমিন প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও অমূল্য ধন ঈমানের সম্পদ রক্ষা করে যাবে এটাই স্বাভাবিক। স্বার্থপরতা, বেহায়াপনা, নষ্টামী, নোংরামী ও অসভ্যতার স্রোতে যারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে তারা ঈমানদারের এই আপসহীনতা, ঈমান রক্ষার দৃঢ়তা দেখে তাদেরকে হয়তো পাগল বলে আখ্যা দেয়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদেরকে বিভিন্ন রকম সামাজিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়, তাদের সমালোচনা করে। কিন্তু ঈমান মুমিনকে যে মহাসত্যের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে সেই মহাসত্যের পরশে মুমিনের অন্তর থেকে সকল ধরনের দ্বিধা, সংশয় দূর হয়ে যায়। তার মধ্যে আকাশের মতো বিশালতা, পাহাড়ের মতো স্থিরতা সৃষ্টি হয়। সে নিজেকে এই বস্তুবাদী সমাজ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়ে নেয়। সেখান থেকে সে এই সমাজের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তাদের অসার, সংকীর্ণ ও অপরিণামদর্শী কাজকর্ম দেখে তাদের প্রতি সহনশীল ও করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, সমালোচনা তার মনে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা কিংবা সংশয়ের জন্ম দিতে পারে না। কেননা, সে যে দৃষ্টি দিয়ে এই জগৎ সংসার ও জীবন মরণকে মূল্যায়ন করে, সেখানে তো এই ক্ষুদ্র জীবনই মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি নয়; বরং চূড়ান্ত জীবনে কে হাসবে, কে কাঁদবে, কে পুরস্কার পাবে, কে লাঞ্ছিত হবে, কে সমালোচিত হবে, কে নন্দিত হবে এটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। তাই তো আমরা দেখতে পাই সাড়ে নয়শ'ত বছরের দাওয়াতী জীবনে হযরত নুহ (আ) যে বিরামহীন ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হুমকি-ধমকি, সমালোচনা ও নিন্দার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার জবাবে তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে, বলিষ্ঠচিত্তে, সম্পূর্ণ আস্থার সাথে তাদের বলে দিয়েছেন–

"আজ যদিও তোমরা আমাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো, অচিরেই এমন একদিন আসবে যেদিন আমরাও তোমাদের বিদ্রূপ করবো, যেমনি তোমরা আজ আমাদের বিদ্রূপ করছ।" (সূরা হুদ, আয়াত ৩৮)

পাপিষ্ঠরা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করবে এটা তাদের পাপিষ্ঠ চরিত্রেরই একটা স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাদের হাসি-তামাশার কারণে প্রভাবিত

হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মুমিন এতে মোটেই প্রভাবিত হয় না। কারণ, সে তাদের এসব পাপাচার যেমন চামড়ার চোখে দেখতে পায়, তেমনি তাদের পরিণতিও সে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"অবশ্যই তারা ভীষণ অপরাধ করেছে যারা ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করেছে। তারা যখন ঈমানদারদের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো তখন এরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর চোখ টেপাটেপি করতো। যখন এরা নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যেতো তখন খুব উৎফুল্ল হয়েই সেখানে ফিরতো। (এরা) যখন তাদের দেখতো তখন একে অপরকে বলতো, (দেখো) এরা হচ্ছে কতিপয় পথভ্রষ্ট (ব্যক্তি)। অথচ তাদেরকে এই ঈমানদারদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। (বিচারের পর) আজ ঈমানদার ব্যক্তিরাই কাফিরদের ওপর (নেমে আসা আযাব দেখে) হাসবে। উন্নত আসনে আসীন হয়ে তারা (এসব) দেখতে পাবে। প্রতিটি কাফিরকে তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় কি দেয়া হবে না?" (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াত ২৯-৩৬)

মুমিনদের বাহ্যিক অবস্থা একটু খারাপ দেখে এবং নিজেদের জাঁকজমক ও জৌলুসের কারণে তারা মুমিনদের কীভাবে বিদ্রূপ করে তা তুলে ধরতে গিয়ে কুরআন বলছে–

"তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়েছে তখন যারা কুফরী করেছে, তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলে, (বলো তো) আমাদের উভয় দলের মাঝে কোন দলটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও কোন দলের মাহফিল বেশি শানদার।"
(সূরা মারইয়াম, আয়াত ৭৩)

তাদের প্রশ্নের মূলকথা হলো দু'পক্ষের মধ্যে, অর্থ্যাৎ ইসলামের পক্ষের এবং বিপক্ষের মধ্যে কারা উত্তম, কারা শ্রেষ্ঠ, কারা বিত্তবৈভব ও প্রতিপত্তির অধিকারী, কারা নেতৃত্বের অধিকারী? ইত্যাদি।

মক্কার কাফিরদের উত্থাপিত প্রশ্নটিই আল্লাহ তাআলা আয়াতে তুলে ধরেছেন। তৎকালীন মক্কার যেসব বিশিষ্ট সমাজপতি, বিত্তশালী, অহংকারী, দাম্ভিক লোক ঈমান আনেনি তাদেরকে তারা রেখেছে এক পক্ষে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে তারা রেখেছে আরেক পক্ষে। তাদের প্রশ্ন হলো, এই দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণী উত্তম? তারা একপক্ষে দেখছে মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবস্থান। নযর বিন হারেস, আমর বিন হিশাম, ওয়ালিদ বিন মুগীরা, আবু সুফিয়ানদের মতো বিত্তশালী নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে। অপরপক্ষে দেখছে বেলাল, আম্মার, খাব্বাবদের মতো অসহায়, নিঃস্ব, গরীবদের। মক্কার নির্বোধ কাফির মুশরিকদের প্রশ্ন ছিল, মুহাম্মদ যদি সত্য কথাই বলতো তাহলে সমাজের এসব জ্ঞানীগুণীরা কি তা উপলব্ধি করতে পারতো না! এসব বিত্তশালী জ্ঞানীগুণী নেতারা বুঝলো না, অথচ তা বুঝলো কিছু হতদরিদ্র মানুষরা! যারা এমনই অসহায় ও দরিদ্র যে, তারা সবাই সামন্য সময়ের জন্য একত্রিত হওয়ার মতো ভালো একটি বৈঠকখানা কিংবা একটা ভালো বাড়িরও ব্যবস্থা করতে পারেনি। অথচ

যারা ইসলামের বিরোধিতা করছে তারাই তো সমাজের হর্তাকর্তা, তারাই সমাজ পরিচালনা করে, তাদের মিটিং করার জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক সংসদভবন, হোয়াইট হাউজ, 'দারুন নদওয়া'। বস্তুপূজারী, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সব সময়ই এমন নিম্নমুখী হয়ে থাকে যে, তাদের কাছে অর্থবিত্ত, ধন-সম্পদ, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এগুলোই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের কাছে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শবাদিতা এসবের কোনো মূল্যই নেই। তাদের দৃষ্টি কখনো মহাসত্যের সাথে মিলিত হতে পারে না, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় বস্তুবাদী ক্ষুদ্রতার ভাগাড়েই আটকা পড়ে থাকে।

ঈমানের পথে চলার জন্য আল্লাহ তাআলা যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা চিরদিনই এক রকম। এর কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন বা সংস্কার নেই। আর তা হলো এই যে, ঈমানের পথে চলতে হলে অবশ্যই ঈমানদারকে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে, দুনিয়ার শান-শওকত ও জাঁকজমকের মোহ ত্যাগ করতে হবে। সব ধরনের সংকীর্ণতা ত্যাগ করে মাহাত্ম্য ও উদারতার পথে আসতে হবে। ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের মোহে ডুবে গেলে ঈমানের পথে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে ঈমানদারকে অবশ্যই আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সত্য ও ন্যায়ের প্রশ্নে, মূল্যবোধ, মানদণ্ড ও দ্বীনের প্রশ্নে সামান্যতম কোনো আপসকামিতাকেও তারা প্রশ্রয় দিতে পারবে না। শাসক শ্রেণীর সাথে একটু মিলেমিশে থাকার জন্য ইসলামের ছোট থেকে বড় কোনো বক্তব্যকেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না। শাসকদের সুনজর পাওয়ার জন্য কিংবা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য সমাজে প্রচলিত কোনো ব্যবস্থার স্রোতে ভেসে যাওয়া চলবে না। ঈমান গ্রহণের সময় থেকেই জেনে নিতে হবে যে, জাহেলি সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া তার জন্য সমীচীন নয়; বরং শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কঠোর সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই তার কাজ। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের সময় থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, নাম, যশ, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের পথ ইসলাম নয়; এগুলো পাওয়ার জন্য কেউ ইসলামে আসলে সে যেন ইসলামে প্রবেশই করেনি। যারা এসব বস্তুবাদী ও তুচ্ছ পার্থিব বিষয়ের জন্য লালায়িত তাদের মতো হীন মানসিকতাসম্পন্ন স্বার্থপর মানুষদের জন্য ইসলাম মোটেই সুখকর ব্যবস্থা নয়। মুমিনদেরকে ইসলামের পথে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের এ পথে আসার আর একটি কারণ হলো এই যে, পৃথিবীর সকল মত ও পথের মধ্যে ঈমানের পথই শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ।

এসব কারণে একজন সত্যিকার মুমিন কখনো সমাজের চাকচিক্যময় কোনো ব্যবস্থা কিংবা ক্ষমতাশালী কোনো ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাদের প্রশংসায় সে অনুপ্রাণিতও হয় না, আবার তাদের গালমন্দ, হুমকি ধমকিতে সে নিরুৎসাহিতও হয়

না। কারণ, সে সকল অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশের উৎস হিসেবে আল্লাহকে গ্রহণ করেছে। মহাপরাক্রমশালী, বিশ্বজগতের একক স্রষ্টা, একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মতো এক মহান সত্তাকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করার পর আর কারো কাছে ধর্ণা দেয়ার কোনো প্রয়োজন তার নেই। সে তো মহাসত্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। সে তো এক চিরন্তন, শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল মূল্যবোধের মানদণ্ড গ্রহণ করেছে। মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত নিত্যপরিবর্তনশীল কোনো নিয়ম-কানুন, আইন-কানুনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার সকল প্রেরণার একমাত্র উৎসমূল হচ্ছেন বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি একক সার্বভৌম সত্তা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তাই সে কখনো কোনো হীনমন্যতায় ভোগে না, দোদুল্যমানে আক্রান্ত হয় না। আজ এক কথা কাল অন্য কথা বলে না। ক'দিন পর পর নীতি-আদর্শ পরিবর্তন করে না। সে তার মিশন সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে কারো রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা করে না, কারো হুমকি ধমকিকে পরোয়া করে না। বাতিলের শক্তি সমাজে যতোই প্রবল হোক, জনশক্তি ধনশক্তি বাতিলের পক্ষে থাকুক, বাতিল যতোই ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করতে চেষ্টা করুক, যতো বেশি জনগণই তার দিকে ঝুঁকে পড়ুক না কেন তাতে মুমিনগণ বাতিলের ভয়ে কিংবা বাতিলপন্থীদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সত্যের বাণী কাটছাঁট করে না। কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা পরিমার্জনের কথা চিন্তা করে না। কিছুতেই বাতিলের সাথে নীতি আদর্শের প্রশ্নে আপস করে না ; বরং জাহেলি সমাজের ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশের মোহ যেন কিছুতেই তাদেরকে আকৃষ্ট না করে, নিজের অজান্তেও কখনো যেন সে এগুলোর প্রতি প্রলুব্ধ না হয়ে পড়ে সে জন্য সে হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে একান্ত আকুতি জানিয়ে ফরিয়াদ করে–

"(তারা আরো বলে) হে আমাদের মালিক, (একবার যখন) তুমি আমাদের (সঠিক) পথের দিশা দিয়েছো (তখন আর) তুমি আমাদের মনকে বাঁকা করে দিও না। একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের প্রতি দয়া করো, যাবতীয় দয়ার মালিক তো তুমিই। হে আমাদের মালিক, তুমি অবশ্যই সমগ্র মানবজাতিকে তোমার সামনে (হিসাব-নিকাশের জন্য) একদিন একত্রিত করবে, এতে কোনোরকম সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা (কখনোই) ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮-৯)

দ্বাদশ অধ্যায়

রক্ত-পিচ্ছিল পথের যাত্রী যারা

"শপথ (বিশালকায়) কক্ষপথ বিশিষ্ট আকাশের, এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিনটির। শপথ (সেই প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষীর, (শপথ সেই ভয়াবহ দৃশ্যের) যা (তাদের সামনে) ঘটেছে। (মুমিনদের জন্য) গর্ত খোড়ার (লোকদের) ওপর অভিসম্পাত। আগুনের কুণ্ডলী যাতে জ্বালানী দেয়া হয়েছিল। (অভিসম্পাত তাদের ওপরও) যারা তার পাশে বসা ছিলো। এই লোকেরা মুমিনদের সাথে যা করছিলো এরা তা প্রত্যক্ষ করছিলো। তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এ কারণেই যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো। (ঈমান এনেছিলো) এমন এক সত্তার ওপর যার জন্য নিবেদিত আসমানসমূহ ও যমিনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব। আল্লাহ তাআলা (তাদের) সব কয়টি কাজের ওপরই সাক্ষী। যারা মুমিন নর-নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং (এ কাজ থেকে) কখনো তারা তাওবা করেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠোর আযাব। তাদের জন্য আরো রয়েছে (আগুনে) জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার শাস্তি। (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে তাদের জন্য অবশ্যই আমি এমন জান্নাতের বাগান বানিয়ে রেখেছি, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সাফল্য। তোমার মালিকের পাকড়াও হবে ভীষণ শক্ত। যিনি তোমাদের বানানো শুরু করেছেন তিনিই (আবার তোমাদের জীবন) ফিরিয়ে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল, (সৃষ্টিকে) তিনি ভালোবাসেন। তিনি সম্মানিত আরশের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি যা চান–তাই করেন।"

(সূরা আল বুরুজ, আয়াত ১-১৬)

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অতীতের যেসব ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে তার বর্ণনাধারা, কাহিনী বিন্যাস, ভূমিকা, উপসংহার তথা সার্বিক প্রেক্ষাপটগুলো যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে মুজাহিদদের জন্য অনেক পথনির্দেশ খুঁজে পাওয়া যায়। এসব কাহিনীগুলো বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হলো–এই প্রজন্মের মুজাহিদদের সামনে অতীতের মুজাহিদদের ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাদেরকে দেখানো যে, তাওহিদের পথে চলতে গেলে কোন্ কোন্ ধরনের বাধাবিপত্তির মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই দাওয়াত শুরু করলে জাতির মাঝে কোন্ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। এই দাওয়াতকে দমন করার জন্য জাহেলরা কী পদক্ষেপ নিতে পারে এবং মুমিনদেরকে কোন্ প্রেক্ষাপটে কীভাবে তাদের মোকাবেলা করতে হবে। সাথে সাথে অতীতের ঈমানদাররা তাওহিদের পথে থাকার কারণে যে ত্যাগ-তিতীক্ষা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ সহ্য করেছেন সেগুলো তুলে ধরে এই প্রজন্মের মুজাহিদদেরকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যের ছবক দিয়েছেন। এই সবক'টি দিক থেকেই 'সূরা

বুরুজে' আলোচিত ঘটনাটি সকল প্রজন্মের ঈমানদারদের মনেই এক গভীর ভাবনা জাগিয়ে তোলে। আসলেই 'সূরা বুরুজ' দ্বীনের পথের মুজাহিদদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে।

'সূরা বুরুজে' আলোচিত ঘটনাটি হচ্ছে ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের একদল ঈমানদারদের ঘটনা। তারা শুধু মুখ দিয়েই নয়; বরং সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সমাজের পাপিষ্ঠ জনগণ এবং তাদের পাপিষ্ঠ তাগুত সরকার তাদেরকে ঈমানের দাবি পূরণ করার অধিকার দিতে রাজি হয়নি। কেননা, ঈমানের দাবি পূরণ অর্থ হলো তারা নিজেদেরকে পাপাচার ও আল্লাহদ্রোহিতা থেকে মুক্ত করার সাথে সমাজকেও পাপিষ্ঠ শাসক ও যাবতীয় পাপাচারের হাত থেকে মুক্ত করার অভিযান শুরু করবেন। তাই এই অশনি সংকেত বুঝতে পেরে তৎকালীন সমাজের পাপিষ্ঠ শাসক শ্রেণী মুমিনদের ওপর চরম যুলুম-নির্যাতন শুরু করে। তাদের পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তা পশুকেও হার মানায়।

পাপিষ্ঠরা যেমন চরম মাত্রার নিষ্ঠুর ও অমানুষ ছিলো, ঠিক তেমনি ঈমানদাররাও ছিলেন ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত আপসহীন মহান মানুষ। তারাও যুলুম-নির্যাতনের মুখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। আপসকামিতার পথ গ্রহণ করেননি, একটুও নমনীয় হননি। ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় তারা চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হন। পৃথিবীর ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, মোহ, প্রতিপত্তি, নশ্বর দেহ সবকিছুর ওপরই তারা বিজয়ী হন। তারা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেছেন তবুও ঈমান থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসতে রাজি হননি, কিংবা কোনোরকম আপসকামী সন্ধির প্রস্তাব দেননি। তাদের সামনেই তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার আয়োজন চলছিলো; তারা স্বচক্ষে দেখছিলেন যে, একটু পরেই কাফিররা তাদেরকে এই আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে, কিন্তু তবুও তারা একটুও বিচলিত হননি। উদ্বিগ্ন হননি। ঈমানের পথে তারা ছিলেন অটল, অবিচল। আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো রকম ছাড় দিয়ে তারা পার্থিব জীবনকে বেছে নেননি। কী এক মহান দৃষ্টান্ত! কী এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস তারা বিশ্বমানবতার সামনে স্থাপন করলেন! সত্যিই এটা ইতিহাসের এক অপূর্ব অধ্যায়।

এই ছিলো একদল মহান মানুষের ইতিহাস। এর বিপক্ষে রয়েছে আল্লাহদ্রোহী তাগুতি সরকার, স্বার্থপর ও পাপিষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং এদের অনুসারী বিকৃত মস্তিষ্কের অপরাধপ্রবণ, চরিত্রহীন সমর্থক শ্রেণী। বিকৃত মস্তিষ্কের এই পশুতুল্য অমানুষগুলো আগুনের গর্তের কিনারে বসে মুমিনদের মৃত্যুর করুণ দৃশ্য উপভোগ করতো। একজন তরতাজা জীবন্ত মানুষকে কীভাবে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় এই নারকীয় দৃশ্য দেখার জন্য কৌতুহল নিয়ে এরা এসে গর্তের পাশে ভীড় জমাতো। যুবক, যুবতী, শিশু, বৃদ্ধ কিংবা শক্ত সামর্থ্য কোনো ঈমানদারকে ধরে এনে যখন জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হতো তখন তাদের পশুসুলভ পাশবিক উন্মত্ততা আরো বেড়ে যেতো। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে

যাওয়া মুমিনদের রক্ত এবং তাদের অগ্নিদগ্ধ হাড্ডি গোশ্ত দেখে তারা আনন্দে নৃত্য করতো। তাদের এই লোমহর্ষক আচার আচরণ থেকে এটা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা মানবিক বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে একেবারেই পশুর স্তরে এমন কি পশুর চেয়েও নিচে নেমে গিয়েছিলো। কেননা, হিংস্র পশুরাও কখনো নিছক পশুবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কোনো জীব হত্যা করে না, তারা শুধু ক্ষুধার তাগিদে তথা জীবন ধারণের প্রয়োজনেই জীব হত্যা করে।

এই ঘটনা থেকে আমরা আরো দেখতে পাই যে, ঈমানের বদৌলতে একজন মানুষ মান-মর্যাদার কতো উঁচু স্তরে আরোহণ করতে পারে। আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতার যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন তা সকল যুগের সকল ঈমানদারদের জন্যই এক অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তবে এই ঘটনার সঠিক পর্যালোচনা করাও যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখানে দেখা যায় ঈমানের ওপর বাতিলের বিজয় হয়েছে, সত্যের ওপর মিথ্যার জয় হয়েছে। তাদের ঈমানী শক্তি কোনো কাজেই আসেনি। বাতিলের সাথে সম্মুখযুদ্ধে ঈমানী শক্তি কুফরী শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় ঈমানদারদের পক্ষে বুঝি কেউই নেই। কেননা, এই একই ধরনের অপরাধের কারণে নূহ, হুদ, সালেহ ও শোআইব (আ) এর জাতিকে চরম শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। ফেরাউনকে সদলবলে নীলনদে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো। অথচ এই আসহাবুল উখদুদকে দুনিয়াতে তেমন কোনো শাস্তি দেয়া হয়েছে কিনা কুরআন কিংবা সহিহ হাদিসের দ্বারা তা জানা যায় না। সুতরাং, বস্তুবাদী দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে কুফর ও জাহেলিয়াতের কাছে ঈমান ও ইসলামের শোচনীয় পরাজয় ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

ঘটনা কি এখানেই শেষ?

মানবরূপী পশুগুলো ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানদেরকে যেভাবে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারলো তার কি কোনোই বিচার নেই? তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন বলে সবই কি সেখানে শেষ হয়ে গেলো? পশুর চেয়েও জঘন্য অমানুষগুলো এমন একটি নারকীয় তাণ্ডব ঘটিয়েও কি একেবারে বিনা বিচারে পার পেয়ে গেলো? না–কিছুতেই নয়–কস্মিন্‌কালেও এমনটি হতে পারে না। কুরআন জানায়, তাদেরকে অবশ্যই একদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে তাদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে।

সাথে সাথে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঈমানদারদের সামনে তুলে ধরে কুরআন তাদের সামনে বিচার বিশ্লেষণের এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতেই ঈমানদাররা প্রতিটি ঘটনার বিচার করে। তারা যে সংগ্রামী জীবন বেছে নিয়েছে, যে রক্তভেজা রাজপথে তারা চলতে শুরু করেছে, সেই পথে চলার জন্য এই মানদণ্ড তাদের অনেক সহায়তা করে থাকে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বৈষয়িক স্বার্থ, ভোগ-বিলাস কিংবা দুঃখ-দুর্দশা প্রভৃতি– শুধুমাত্র বস্তুগত বিষয় দিয়েই মাপা ঠিক নয়। রাজনৈতিকভাবে জাহেলি শক্তিকে পরাজিত করাটা বিজয়ের একটা স্তর মাত্র, এটাই বিজয়ের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়; বরং বস্তুগত লোভ-লালসা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থবিত্ত, সহায়-সম্পদ তথা বৈষয়িক সকল কিছুর ওপর ঈমানী শক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারাটাই হলো আসল বিজয়। এটাই হলো ঈমানের বিজয়। আল্লাহর কাছে এই ঈমানেরই মূল্য আছে। আল্লাহর বাজারে এই খালেস ঈমানেরই চাহিদা রয়েছে।

সূরা বুরুজে আলোচিত ঘটনায় আমরা ঠিক এই বিজয়েরই একটি বাস্তবচিত্র দেখতে পাই। যুগযুগান্তরের সময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে আমরা যেন চাক্ষুষ দেখতে পাই, সেই মুমিনদের মহান দলটি পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, এমনকি জীবনের মায়ার ওপরেও বিজয়ী হয়েছিলেন। নির্মম যুলুম-নির্যাতনের মুখে দাঁড়িয়ে ঈমানী মর্যাদার যে শ্রেষ্ঠত্ব তারা দেখিয়েছেন, যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন তা মানবজাতির ইতিহাসে সত্যিই এক গৌরবময় অধ্যায়। এই বিজয়ই হলো কুরআনের কাঙ্ক্ষিত বিজয়, এটাই হলো সত্যিকার বিজয়।

মৃত্যু এমন এক অবধারিত মহাসত্য যাকে কেউই উপেক্ষা করতে পারে না। প্রতিটি মানুষই এক সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়; কিন্তু কে কী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, কী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য, কোন মিশনকে সফল করার জন্য মৃত্যুবরণ করলো– সেটাই হলো বিবেচ্য বিষয়। কেউ নারীর জন্য জীবন দেয়, কেউ অর্থের জন্য মরে, কেউ একটু ক্ষমতার জন্য, কেউ হতাশায়, কেউ বা শেয়ালের মতো মারা যায়। বিভিন্ন কারণে মানুষ বিভিন্নভাবে মৃত্যুবরণ করে।

আলোচিত ঘটনায় ঈমানদাররা যে সফলতা অর্জন করেছিলেন এমন সফলতা ক'জনের ভাগ্যে জোটে? এমন উঁচু মানের ঈমান ক'জন অর্জন করতে পারে? এমন চূড়ান্ত স্বাধীনতার স্বাদ ক'জন নিতে পারে? আসলেই তারা ঈমানের এক চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, যে স্তরে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়। এই সফলতা আল্লাহর রহমতের এক বিশেষ দান। তিনি যাকে চান তাকেই বাছাই করে নেন এই ধরনের সফলতা দানের জন্য। অন্য সবার মতো একই প্রক্রিয়ায় হয়তো তারাও মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু তাদের জীবনটিকে উৎসর্গ করার সামনে থাকে এক মহান উদ্দেশ্য। এ সৌভাগ্য সকল মানুষের ভাগ্যে জোটে না। সামান্য কিছু মানুষই সাধারণত একেক যুগে নিজেদের জীবন এই মহান উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তানে পরিণত হন।

আসহাবুল উখদুদের ঘটনার নির্মম শিকার যে মুমিন সম্প্রদায়, তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে ঈমানের পথ পরিত্যাগ করে জীবন বাঁচানোর সহজ পথ অবলম্বন কতে পারতেন।

কিন্তু তা করা হলে শুধু তারাই নন; বরং সমগ্র মানবজাতি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হতো। কেননা, তখন তারা সমগ্র মানবজাতির সামনে ঈমানী শক্তির নয়; বরং ঈমানী দুর্বলতার এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াতেন। জান বাঁচানোর স্বার্থে যদি তারা ঈমান ছেড়ে দিতেন তাহলে কী হতো?

মানুষের সুখ-শান্তি, স্বাধীনতা, পরাধীনতা, সম্মান, মর্যাদা, অপমান, লাঞ্ছনা–এসব কিছুর উপলব্ধিটা হয় মানুষের অন্তরে। আর এই ঈমানও বসবাস করে অন্তরে। যদি তারা ঈমান ছেড়ে দিতেন তাহলে তাদের অন্তরের ওপরও যালিম শাসকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যেতো। তারা আত্মিকভাবেই পরাধীন, রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে যেতেন। ঈমানী মহাসত্যের আলোয় যার অন্তর আলোকিত সেই ঈমানদার ব্যক্তি তো কিছুতেই তার অন্তরকে কোনো শাসকের ইচ্ছার ঘৃণ্য গোলামে পরিণত করতে পারে না। অন্তরের ওপর রাজত্ব থাকবে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান সার্বভৌম অধিপতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের। এখানে যদি কোনো মানুষের গোলামী করার প্রবৃত্তি বাসা বাঁধে তার চেয়ে অধঃপতন, হীনতা, দীনতা আর কী হতে পারে!

তাই তো আমরা দেখতে পাই, জ্বলন্ত আগুন যখন তাদের নশ্বর দেহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছিলো তখনও সেই মুমিনদের অন্তর ছিলো মহাসত্যের আলোয় উদ্ভাসিত। তাদের অন্তরকে তারা তখনও স্বাধীন রেখেছেন, কোনো শাসকের ইচ্ছার গোলামীর শেকল পড়াননি। দুনিয়ার দাউ দাউ করা আগুন তাদের কিছুই করতে পারেনি; বরং মনে হয় আগুনের আলো তাদের আদর্শবাদিতার আলোকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিলো।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয়। সুতরাং, হক ও বাতিলের, সত্য-মিথ্যার যে লড়াই দুনিয়ায় আমরা দেখতে পাই তা-ও এখানেই শেষ নয়। এর রেশ, এর ফলাফল চূড়ান্ত জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া মিথ্যার বিরুদ্ধে ও বাতিলের বিরুদ্ধে হকপন্থীরা যে যুদ্ধ ঘোষণা করে সেখানে সে একা নয়, তার সাথে আল্লাহর ফেরেশতারাও রয়েছেন। তারা প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করছেন। সংকীর্ণ দৃষ্টিশক্তির মানুষেরা জয়-পরাজয় বলতে শুধু সাময়িকভাবে জয়ী হওয়া কিংবা হেরে যাওয়াকেই বোঝে, কিন্তু ফেরেশতারা তো মহাসত্যের সাথে সম্পৃক্ত। তারা তো এই সংকীর্ণ মানদণ্ডে ঘটনার মূল্যায়ন করেন না। তারা মহাসত্যের মানদণ্ডে দেখতে পান যে, বাহ্যিকভাবে না হলেও মুমিনগণই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী। তাই তারা এই বীর-সেনানী মুমিনদের প্রশংসা করেন। আর পৃথিবীতে যতো মানুষ বাস করে ফেরেশতাদের সংখ্যা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। সুতরাং, তারা যদি কারো প্রশংসা করে তাহলে তা নিশ্চয়ই মানুষের প্রশংসার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

এ তো গেলো মানবজীবন। এরপর আসবে পরকালীন জীবন। একজন মুমিনের বিশ্বাস হলো দুনিয়ার জীবনই চূড়ান্ত নয়; বরং তা ওতপ্রোতভাবে আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়ার জীবনে নাটকের মাত্র এক অংশ চিত্রায়িত হচ্ছে, এর চূড়ান্ত দৃশ্য তো

আখেরাতে দেখানো হবে। দুনিয়ার জীবনে যে অংশটুকু মঞ্চস্থ করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা মোটেই ঠিক নয়। কেননা, তাহলে তা নিছক কিছু দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মাঝেই শেষ হয়ে যাবে, চূড়ান্ত পরিণতি পর্দার আড়ালেই থেকে যাবে।

বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে উঠে এভাবে চিন্তা করাটা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। যেসব স্থূল ও সংকীর্ণমনা অস্থির লোকেরা চর্মচক্ষুর পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের পক্ষে আসল সত্যকে অনুধাবন করা কখনো সম্ভব হয় না। তাই কুরআন মুমিনদেরকে বাস্তবমুখী, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে গড়ে তুলতে চায়। কেননা, ঈমানী আদর্শ ধারণ করার জন্য চিন্তার ব্যাপকতা ও বিশালতা অনিবার্য। সংকীর্ণ চিন্তার লোকেরা ঈমান ধারণ করতে পারে না। চিন্তার এই বিশালতার কারণে ঈমানদারদের অন্তর থাকে প্রশস্ত ও প্রশান্ত। তারা সকল পরিস্থিতিতে, সকল অবস্থায় থাকে স্থির। তারা কিছুতেই অধৈর্য হয় না। এই স্থিরতা ও মানসিক প্রশান্তি আসলে ঈমানেরই প্রতিফল। তাই তো আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

"যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর যিকিরে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো, আল্লাহর যিকিরই অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে।"

(সূরা আর রা'দ, আয়াত ২৮)

এই প্রশান্তির সাথে সাথে আল্লাহ তাআলাও মুমিনদেরকে এক অতুলনীয় উপহার প্রদানের ওয়াদা করেছেন। আর তা হলো তাঁর সন্তুষ্টি। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেন–

"যারা (আল্লাহ তাআলার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৯৬)

এছাড়া পৃথিবীতে যারা আল্লাহর নির্দেশমতো জীবন যাপন করে তাদের অনেক ব্যাপারেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বয়ং ফেরেশতাদের সাথে কথা বলেন। এ ব্যাপারে উদাহরণ আমরা খুঁজে পাই মহানবী (স) এর একটি হাদিসে। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর কোনো (নেক) বান্দার সন্তান মারা যায় তখন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার অমুক বান্দার সন্তানের জান কবয করেছো? ফেরেশতারা বলেন, জি হাঁ। আল্লাহ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরা ছিনিয়ে এনেছো? ফেরেশতারা বলেন, জী হাঁ, হে আমাদের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দা তখন কী বলেছে? ফেরেশতারা বলেন, তিনি তখনও আপনার প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে 'বাইতুল হামদ' নামে একটি সুবিশাল অট্টালিকা বানিয়ে দাও। অন্য হাদিসে মহানবী (স) আরো বলেন, 'আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন, আমার

বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন বিশ্বাস রাখে, আমি তার সাথে তেমন আচরণই করি। সে আমাকে স্মরণ করলে আমিও তাকে স্মরণ করি। সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনেই স্মরণ করি। তবে সে যদি আমাকে (ছোট-খাটো কোনো) মজলিসে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে অনেক বড় মজলিসে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘৎ এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে কয়েক হাত এগিয়ে আসি। সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'

(বোখারী, মুসলিম)

সরাসরি কুরআনের আয়াতের দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা মুমিনদের জন্য উর্ধ্ব জগতের বাসিন্দারা অনেক দোয়া প্রার্থনা করেন। সহানুভূতি ও সহমর্মিতা পেশ করেন। যেমন কুরআনে রয়েছে—

"যেসব (ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার) আরশকে ধারণ করে আছে, যারা এর চারিদিকে (কর্তব্যরত), তারা নিজেদের মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে, তারা তাঁর ওপর ঈমান রাখে। তারা ঈমানদারদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করে, হে আমাদের মালিক, তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছুর ওপর ছেঁয়ে আছো; সুতরাং, সে সব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তাওবা করে এবং যারা তোমার (দ্বীনের) পথে চলে এবং তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।"

(সূরা মুমিন, আয়াত ৭)

যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই মহান মানুষদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' বলো না; বরং তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তাদের রিযিক দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন তাতেই তারা পরিতৃপ্ত এবং যারা এখনো তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা খুশি। কেননা, এ ধরনের লোকদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা (সেই দিনে) উৎকণ্ঠিতও হবে না। এই (ভাগ্যবান) মানুষেরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়। (কারণ) আল্লাহ তাআলা ঈমানদার বান্দাদের পাওনা (শ্রম ফল) কখনো বিনষ্ট করেন না।"

(সূরা আলে ইমরান, ১৬৯-১৭১)

একইভাবে যেসব অহংকারী, যালিম ও পাপিষ্ঠরা আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত, যারা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যারা ইসলামকে যমিনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেসব অপরিণামদর্শী পাপাচারীদেরকে

আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেক আয়াতে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে পাকড়াও না করে দুনিয়ার জীবনে তাদের কিছুটা স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। কিছুটা শিথিলতা দিয়ে রেখেছেন। তারা এই দুনিয়ায় কিছু দিন ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ যা খুশি তা করে যাক; তাদের বিচার হবে কেয়ামতের দিন। সাথে সাথে তাদের দুনিয়াবী জীবনের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, গর্ব-অহংকার যেন মুমিনদেরকে প্রতারিত না করে সে জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন–

"(হে মুহাম্মদ) জনপদসমূহে কাফিরদের সদম্ভ বিচরণ যেন কোনোভাবেই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। (কেননা এই প্রাচুর্য হচ্ছে) সামান্য (কয়দিনের) ভোগ মাত্র; অতঃপর তাদের (সবারই অনন্ত) নিবাস (হবে) জাহান্নাম; আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল!" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৬-১৯৭)

"(হে নবী,) তুমি কখনো মনে করো না যে, এই যালিমরা যা কিছু করে যাচ্ছে তা থেকে আল্লাহ তাআলা গাফেল রয়েছেন, (আসলে) তিনি তাদের সেই দিন আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন যেদিন (তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা আকাশের দিকে চেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দৌড়াতে থাকবে, (এমনকি) তাদের নিজেদের প্রতিই নিজেদের কোনো দৃষ্টি থাকবে না, (ভয়ে) তাদের অন্তর বিকল হয়ে যাবে।"

(সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪২-৪৩)

"(হে নবী) তুমি বরং এদের ছেড়ে দাও, কিছুদিন এরা বাক-বিতণ্ডা ও খেল-তামাশায় নিমগ্ন থাক–ঠিক সেই দিনটির সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত যেদিনের (ব্যাপারে বার বার) তাদের সতর্ক করা হয়েছে। সেদিন যখন এরা (নিজ নিজ) কবর থেকে বের হয়ে আসবে তখন এমনি দ্রুতগতিতে এরা দৌড়াতে থাকবে (যে দেখে মনে হবে) তারা (সবাই বুঝি) কোনো এক (প্রতিযোগিতার) লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে চলেছে, তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের (সবকিছু) থাকবে আচ্ছন্ন, (তখন তাদের বলা হবে) এই হচ্ছে সেই (ভয়ংকর) দিবস যেদিনের ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক করা হয়েছিলো।" (সূরা আল মাআরিজ, আয়াত ৪২-৪৪)

যদিও চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের সাথে ফেরেশতাদের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে পরকালীন জীবনও মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ; বরং বলা যায়, সেটাই আসল জীবন। সুতরাং, এই দুনিয়ার জীবনে সুখ-দুঃখকে সফলতা কিংবা ব্যর্থতার মানদণ্ড মনে করা উচিত নয়। সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ধারিত হয় চূড়ান্ত পর্যায়ে; সুতরাং, মানবজীবনের চূড়ান্ত পর্বের সফলতা ব্যর্থতাই হলো প্রকৃত সফলতা কিংবা ব্যর্থতা।

তেমনিভাবে এ দুনিয়ার জীবনে হক ও বাতিলের যে সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা যায় সেক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে, এ লড়াইয়েও দুনিয়ার জীবনের ফলাফলই চূড়ান্ত

ফলাফল নয়। এ লড়াইয়ে আসলে কে জিতলো, কে হারলো তার চূড়ান্ত ফলাফলও ঘোষণা করা হবে কিয়ামতের ময়দানে। সুতরাং, দুনিয়ার জীবনের সাময়িক বস্তুগত পরাজয় কিংবা বিজয় দেখে উল্লসিত হওয়া কিংবা হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। বস্তুগত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে গিয়ে মুমিন সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপকতর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয় বিধায় দুনিয়ার জয়-পরাজয়কে সে কিছুই মনে করে না। দুনিয়ার সব কিছুই তার নিকট তুচ্ছ মনে হয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি যেমন উন্নত তেমনি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া পাওয়াও অনেক উঁচু মানের। এ ধরনের উঁচু ও উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন ঈমানদারদের জন্য 'আসহাবুল উখদুদের' ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান জানানোর পর তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে দ্বীনের পথে আহ্বানকারীদের ভূমিকা কেমন হবে সে সম্পর্কেও একটি সুস্পষ্ট ধারণা এই ঘটনা থেকে পাওয়া যায়।

আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। একেক যুগে এই সংগ্রাম একেক রকমের পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে। এই সংগ্রাম হযরত নূহ, হুদ, শোয়াইব এবং লুত (আ) এর জাতির সামগ্রিক ধ্বংস ও গুটি কয়েক ঈমানদারদেরকে রক্ষার দৃশ্যও দেখতে পেয়েছে। তবে ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া ঈমানদার সম্প্রদায় পরবর্তীতে কী ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে কুরআন কোনো আলোচনা করেনি। কেননা, সে অধ্যায়টি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। যে অধ্যায়টুকু দ্বীনের পথের মুজাহিদদের জন্য প্রয়োজনীয় সেটুকুই আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন। কুরআনে উল্লিখিত এসব ইতিহাস থেকে দেখা যায়, আল্লাহদ্রোহী তাগুতদের দমন করার জন্য কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনেও তাদেরকে শাস্তির কিছুটা ভোগ করিয়ে দেন, আর চূড়ান্ত বিচার তো কিয়ামতের দিনের জন্য রয়েই গেলো।

এমন আরো অনেক ইতিহাস মানবজাতির সামনে রয়েছে। বিশাল সেনাবাহিনীসহ ফেরাউনের সলিল সমাধি ও সঙ্গী-সাথীসহ মুসা (আ) এর মুক্তি ও ক্ষমতা লাভও দ্বীনের ইতিহাস। বনী ইসরাঈলরা কখনো ঈমানদারিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেনি, তবে সেই যুগের অন্যান্য জাতির তুলনায় তাদের গুণগতমান অনেক দিক থেকেই ভালো ছিলো। এর প্রতিফলস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতেও বিজয় দান করেছিলেন।

এবার আমরা ফিরে আসি আমাদের নবীর ইতিহাসের দিকে। যেসব কাফির-মুশরিকরা নবীর প্রতি ঈমান না এনে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, বদর প্রান্তরে সেসব অহংকারী যালিমদের লাশের স্তূপও ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে। ঈমানদারদের দুনিয়ার জীবনের সম্ভাব্য চূড়ান্ত সাফল্যও দেখতে পেয়েছে। তাদের হৃদয়রাজ্যে দ্বীনের শাসন

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপহারস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের গলায় সফলতার মালা পরানোর দৃশ্যও ইতিহাস দেখলো। পৃথিবীর ইতিহাসে পরিপূর্ণরূপে মানুষের জীবনে ও আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার নমুনাও দেখতে পেলো, যা এর পূর্বে বা পরে ইতিহাস আর কখনো দেখতে পায়নি।

দ্বীনের পথের বীর মুজাহিদদের অনেক রক্তরঞ্জিত ইতিহাস এই পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে। বর্তমান যুগেও যে পৃথিবীর আনাচে কানাচে এমন দু'একটি ঘটনা ঘটছে না–তা নয়। তবে সব ইতিহাসের মাঝে 'আসহাবুল উখদুদের' ঘটনাটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। সুতরাং, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন তারা এই ঘটনা থেকে তাদের চলার পথের অমূল্য পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারেন। কারণ, ঈমানের পথে চলতে গেলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা যে কোনো যুগেই রয়েছে।

যে কারণে এ ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্য রাখে তাহলো যে, বাতিলপন্থীদেরকেও আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি এবং ঈমানদারদেরকেও আল্লাহর পক্ষ থেকে পার্থিব কোনো সাহায্য দেয়া হয়নি।

হয়তো এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আবারও হতে পারে যে, ঈমানদাররা যালিম শাসকদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হবে, কিন্তু পার্থিব জগতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। এই কঠিন পরিস্থিতি ঈমানদাররা কীভাবে সামাল দেবে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনে রাখতে হবে, বাতিলের সাথে এসব ঈমানী প্রশ্নে কিছুতেই আপস করা যাবে না। ঈমানদারদেরকে অবিচলভাবে ঈমানী দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। কোনো অবস্থাতেই দ্বীনের কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখানো যাবে না।

ঈমানদারদের পরিণাম পরিণতি সবকিছু আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়াই ঈমানদারদের কাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জীবনের একমাত্র চাওয়া-পাওয়া হিসেবে নির্ধারণ করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাসকে অবশ্যই জীবনের চেয়ে মূল্যবান মনে করতে হবে এবং অন্তরে, কথায় ও বাস্তব কর্মকাণ্ডে আপসহীনভাবে ঈমানের দাবি প্রতিফলিত হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ঈমানদারদের হাতে আল্লাহ তাআলা সবকিছু ছেড়ে দেননি; বরং তাদেরকে তিনি কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন মাত্র। যেগুলো পালন করা তার ঈমানী দায়িত্ব। তার কাজের ফলাফল কী হবে, তার সংগ্রাম সফল হবে–না ব্যর্থ হবে, অগ্রসর হবে–না থেমে যাবে, এসব বিষয় ভাবতে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এসব বিষয় একান্তই আল্লাহর হাতে। তার কাজ হলো তাকে যে পথে আল্লাহ রব্বুল আলামীন চলতে বলেছেন সে পথে চলা, যে কথা বলতে বলেছেন সে কথা বলা। তার পার্থিব পরিণতি হয়তো ইতিহাসের কোনো মুমিন দলের মতো হতেও পারে, কিংবা এমন কোনো ফলাফলও আসতে পারে যা অতীতে কারোও হয়নি।

মুমিনগণ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত মুজাহিদ। তাদেরকে তিনি যেখানে, যে স্তরে, যেভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে কাজ করে নির্ধারিত পুরস্কার গ্রহণ করাটাই ঈমানদারের দায়িত্ব। সে নিজে যে সংগ্রাম পরিচালনা করছে তার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে, ভবিষ্যৎ কেমন হবে এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো তাদের কাজ নয়। কেননা, এই সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কোনো ক্ষমতাই তো তাকে দেয়া হয়নি। এটা তাঁরই দায়িত্ব যিনি এ আন্দোলন বা সংগ্রামের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক ও মালিক।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, ঈমানদাররা সারা জীবন শুধু অশান্তিতেই থাকে।

আসলে ঈমানদাররা কখনোই অশান্তিতে থাকে না; বরং তাদের পুরস্কারের প্রথম কিস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া শুরু করেন। পুরস্কারটি সত্যিই এক অমূল্য পুরস্কার, যা পাওয়ার জন্য মানুষ ছুটছে আর ছুটছে কিন্তু পাচ্ছে না। মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পাউন্ডের মাঝে থেকেও অসংখ্য মানুষের জীবন যার অভাবে নরক হয়ে আছে সে জিনিসটিই আল্লাহ রব্বুল আলামীন দান করেছেন তাঁর প্রিয় ঈমানদার বান্দাকে। সেই অমূল্য সম্পদটি হলো মানসিক প্রশান্তি। এর সঙ্গে আরো যেসব অমূল্য সম্পদ একজন ঈমানদার লাভ করে তার মধ্যে রয়েছে চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষ, উন্নত আদর্শ; বস্তুবাদী সংকীর্ণতা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি। এর প্রত্যেকটিই এমন সম্পদ যা প্রতিটি সুস্থ মানুষের একান্ত কাম্য।

পুরস্কারের দ্বিতীয় কিস্তিটাও দুনিয়া থেকেই শুরু হয়। সেটা হলো, অন্যদের প্রশংসা। পৃথিবীর ভালো মানুষেরা তো মুমিনদের প্রশংসা করেই, এদিকে ফেরেশতাদের মহলেও মুমিনদের মান-মর্যাদা বেড়ে যায় এবং তাদের প্রশংসা শুরু হয়ে যায়।

দুনিয়ার জীবনে তো কোনো কিছুরই চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় না। এজন্য মুমিনদের চূড়ান্ত সফলতা ও সবচেয়ে বড় পুরস্কারটি দেয়া হবে আখেরাতে। এ পুরস্কারের কোনো তুলনা নেই, শেষ নেই, এর কোনো মূল্যমান নেই। প্রথমত, তাদের হিসাব-নিকাশ সহজ করে দেয়া হবে এবং সীমাহীন নেয়ামত তারা লাভ করবেন। এ সকল পুরস্কারের সাথে সবচেয়ে দামী পুরস্কারটি হলো মহান মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি।

একটি মজার ব্যাপার লক্ষ করুন

মুমিনদেরকে এ কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই বাছাই করেছেন, জীবনটিও তিনিই দিয়েছেন, শক্তি ক্ষমতাও দিয়েছেন, ঈমানী দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা দিয়েছেন, সাহসও তিনি দিয়েছেন, বিপদে-আপদে ধৈর্য ধরার শক্তিও তিনি দিয়েছেন। তাঁর সবকিছু ব্যবহার করে সে যে সফলতা অর্জন করেছে তিনিই তার পুরস্কারও দিচ্ছেন। সত্যিই এটা মহান দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পরম দয়া ও বদান্যতা।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন তার প্রথম শ্রোতাদেরকে সম্পূর্ণ কুরআনের ছাঁচেই গড়ে তুলেছিলো। তাদের মাঝে কুরআনের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলির সর্বোচ্চমাত্রার সমাহার ঘটেছিলো। তাদের চরিত্র ছিলো সম্পূর্ণ কুরআনের আদলে গড়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে তারা জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। ব্যক্তিস্বার্থ, সুনাম, সুখ্যাতির আশা–সবকিছুকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যেতেন, আর কাজের সফলতা ব্যর্থতার ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতেন। কুরআন থেকে তারা থিউরিক্যাল জ্ঞানের পাশাপাশি মহানবী (স) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানের ফলে তারা আরো ত্যাগী, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল হয়ে ওঠেন। তারা জান্নাতপ্রাপ্তিকে তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এ কারণে তাদের যতো কষ্টই হোক না কেন, বৈষয়িক দিক থেকে যতো ক্ষতিই হোক না কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ফলাফল নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত তারা দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতেন। পার্থিব সফলতা ব্যর্থতাকে তারা তেমন কোনো গুরুত্ব দিতেন না; বরং আল্লাহর সিদ্ধান্তকেই তারা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর মনে করতেন। এ কারণেই দেখা যায় হযরত আম্মারের পরিবারের ওপর যখন কাফিরদের নির্মম যুলুম-নির্যাতন চলছিলো তখন তাদের দেখে আল্লাহর রাসূল শুধু তাদের বলেছিলেন–

‘হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে।’

তারা এ কথা শুনেই পরম প্রশান্তি লাভ করেছেন। তাদের অসহ্য দৈহিক অত্যাচারও তখন তাদের কাছে তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়।

খাত্তাব বিন আরত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন কাবার দেয়ালের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ, ‘আপনি কেন আমাদের জন্য দোয়া করছেন না? আপনি কেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছেন না?’ তখন তিনি বলেন, ‘(কী আশ্চর্য, তোমরা এতো তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারিয়ে ফেললে? অথচ) তোমাদের পূর্ববর্তীদের যুগে দ্বীনের পথের মানুষদেরকে ধরে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো, জীবন্ত মানুষকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হতো, লোহার চিরুনী দিয়ে হাড় থেকে গোশত খাবলে নেয়া হতো; তারপরও তাদেরকে দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তিনি তাঁর জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অচিরেই এমন দিন আসবে যখন সান'য়া থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত একজন আরোহী একা সফর করবে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে তার ভয় করতে হবে না। তার মেষ পালের ওপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কোনো বিপদের ভয় থাকবে না। আসলে তোমরা অতি অল্পতেই অধৈর্য হয়ে পড়েছ।’

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিশ্বজগতের একক স্রষ্টা। গোটা বিশ্বজগৎ তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পরিচালনা করেন। সৃষ্টিজগতের যেখানে যা কিছুই ঘটে তা সবই তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটে। তার প্রতিটি ব্যবস্থাপনার মাঝে সৃষ্টির জন্য সামগ্রিকভাবে কল্যাণই নিহিত রয়েছে। বান্দার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে কল্যাণ বরাদ্দ করার জন্যই বিভিন্ন সময় বিভিন্নরকম ঘটনা ঘটে। যখন ঘটে তখন হয়তো কেউই সেই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। দূর ভবিষ্যতে কোনো এক সময় তাঁর ইচ্ছায় মানুষ হয়তো সেই ঘটনার তাৎপর্য ঠিকই উপলব্ধি করতে পারে।

অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, যে যুগে ঘটনাটি ঘটেছে সে যুগের মানুষদের কাছে ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হয়নি। তারা হয়তো বুঝতেই পারেনি কী কারণে এমন ঘটনাটি ঘটলো, কী এর তাৎপর্য? তারা হয়তো দিশেহারা হয়ে প্রশ্ন করেছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এসব কী হচ্ছে, কেন এমন হচ্ছে?'

কিন্তু দেখা যায়, কয়েক শতাব্দী পর এসে এই ঘটনার অন্তর্নিহিত রহস্য ও তাৎপর্য মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। তাই কোনো ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা, দিশেহারা হয়ে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করা মুমিনদের উচিত নয়। তাদের অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা, তাদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত প্রশ্ন থেকে বিরত রাখে। ঘটনা যা-ই ঘটুক, অবস্থা যতোই সংকটময় হোক তাতে মুমিনগণ মোটেই বিচলিত হয় না। সে আল্লাহর নির্দেশিত পথে এবং রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সফল করার জন্য বস্তুগত উপকরণের চেয়ে ঈমানী শক্তিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ; বলা যায় এটাই আসল সম্পদ। এ সংগ্রাম চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন এমন বলিষ্ঠ মনোবলসম্পন্ন মুজাহিদদের, যারা আল্লাহর পথে দ্বিধাহীনচিত্তে জান-মাল সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। যারা ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, কুরআন সর্বপ্রথম মানুষকে এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য তার সকল শক্তি নিয়োগ করেছে। কুরআন এমন ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা-চেতনার অধিকারী মানুষ সৃষ্টি করেছিলো যারা সকল ধরনের বৈষয়িক, বস্তুগত ও সংকীর্ণ চিন্তার উর্ধ্বে থাকতেন। তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দখল করার চিন্তা, প্রতিপক্ষকে যথাসম্ভব দ্রুত ধ্বংস করার মানসিকতা তাদের ছিলো না।

দ্বীনের পথের মুজাহিদদেরকে সফলতা দানের জন্য আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ চান। কারণ, নিছক ক্ষমতা দখলই যদি কারো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তাদের হাতে খেলাফতের আমানত মোটেই নিরাপদ নয়। তাই আল্লাহ

তাআলা যদি দেখেন যে, তার পথের সংগ্রামী মুজাহিদরা আখেরাতের সফলতাকেই একমাত্র সফলতা হিসেবে বিবেচনা করেছে, আখেরাতকেই হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত মীমাংসার স্থান মনে করেছে, দুনিয়ার জীবনে ক্ষমতা লাভ করার ক্ষুদ্র মানসিকতা ত্যাগ করেছে; সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা যদি তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা, দৃঢ়তা, অবিচলতা দেখে খুশি হন তাহলেই তাদের হাতে খেলাফতের মহামূল্যবান আমানত অর্পণ করতে পারেন। মুমিনদেরকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা কারো ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেয়া হয় না। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়।

মুমিনগণ দুনিয়াতে বিজয় ও ক্ষমতা লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যখন তারা দুনিয়াবী সুবিধাভোগের সকল আশা ত্যাগ করে একমাত্র আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করবে। যখন তারা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমা, দয়া, অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই চাইবে না তখনই তারা এই মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতে পারে।

আমরা যদি একটু গভীরভাবে কুরআন নাযিলের একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রতি খেয়াল করি তাহলে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য জানতে পারি। দেখুন—দুনিয়াতে আল্লাহর সাহায্য আসা, গনিমত পাওয়া, ধনসম্পদ লাভ এবং দুনিয়াতেই কাফিরদের ধ্বংস করে দেয়া প্রসঙ্গে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তার সবই নাযিল হয়েছে মদিনায়। মানবজীবনের অস্থায়িত্ব, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, জান্নাত, জাহান্নাম এসব বিষয়ে মক্কী জীবনের আয়াতগুলোতে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনের সকল কামনা-বাসনা দূর করার পরই আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভের ওয়াদা করেন। শুধুমাত্র মুমিনদের ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সাহসিকতার প্রতিদানস্বরূপই আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাদের সাহায্য করেননি। বরং এটা আল্লাহ তাআলার নিজের পক্ষ থেকেই নেয়া সিদ্ধান্ত। হেকমতসম্পন্ন এ সিদ্ধান্তের মাঝে মানবজাতির জন্য যে কী পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে তা অকল্পনীয়।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত সকলের এ বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। এতে যদি তাদের কোনো অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা ও জড়তা না থাকে তাহলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যতো ধরনের বিপদ মুসিবত, সমস্যা, সংকটের মুখোমুখিই তারা হোক না কেন তা উৎরে যাবার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অতি সহজেই পেয়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে জয়-পরাজয়ের চিন্তা না করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে, তারা উল্লিখিত চেতনার ফলেই ধৈর্যের সাথে নিজেদেরকে অটল অবিচল রাখতে পারেন। তারা দুনিয়াতে জয় পেলেন, না পরাজিত

হলেন তা নিয়ে মোটেই ভাবেন না। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যে ফয়সালাই দান করেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত আপসহীনভাবে তাওহিদের পথে থাকতে পারবেন কিনা সেটাই মুখ্য বিষয়। যুদ্ধের ময়দানে তারা নিজেদের অতি আপনজন, কাছের মানুষ ও দ্বীনী ভাইদের রক্তে রঞ্জিত পথ দিয়ে, তাদের রক্তের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায়, দুনিয়াবী বিজয় তাদের উদ্দেশ্য থাকে না।

আলোচনার দ্বারা এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, দুনিয়াতে দ্বীনের বিজয়ের কোনো মূল্য নেই। দুনিয়াতে বিজয়ের একটা মূল্য তো অবশ্যই আছে, তবে মুমিনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া। তবে আল্লাহ তাআলা যদি মুমিনদের দ্বারা তাঁর দ্বীনকে যমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, দুনিয়াতেও যদি আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বিজয় দিতে চান তাহলে তাকে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা-ই বলতে হবে। এটা মুমিনদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিনিময়ও নয়, পুরস্কারও নয়; কারণ দুনিয়া তো পুরস্কার বা বিনিময় দেয়ার জায়গা নয়।

'আসহাবুল উখদুদে'র ঘটনায় মুমিনদের প্রতি কাফিরদের শত্রুতার মূল কারণের দিকে ইঙ্গিত করে যে আয়াতটির মাধ্যমে মন্তব্য করা হয়েছে সেদিকেও আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"তারা এদের (ঈমানদারদের) কাছ থেকে শুধু এ কারণেই প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো।"

(সূরা আল বুরুজ, আয়াত ৮)

দ্বীন সম্পর্কে যারা ভাবেন তাদের প্রত্যেকের উচিত আয়াতটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা। আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে কাফিররা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেনি; বরং শুধু আকিদা-বিশ্বাসের পার্থক্যই তাদের শত্রুতার আসল কারণ। যদি তারা রাজনৈতিক বা বৈষয়িক কোনো কারণে শত্রুতা করতো তাহলে তা মিটিয়ে ফেলা কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু এখানে যে লড়াই চলছে তা মেটানোর কোনো উপায় নেই। কেননা, এ বিরোধ তো ঈমান ও কুফরীর, শিরক ও তাওহিদের, হক ও বাতিলের। এখানে তো প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় যে, পৃথিবীতে কোন ব্যবস্থা চলবে–ঈমানভিত্তিক না কুফরভিত্তিক? তাওহিদভিত্তিক না শিরকভিত্তিক? ইসলামভিত্তিক না জাহেলিয়াতভিত্তিক?

আমরা যদি মক্কার মুশরিকদের দিকে তাকাই তাহলেও একই ধরনের চিত্র সেখানেও দেখতে পাবো। নবী (স) যখন সত্যের, ঈমানের, তাওহিদের দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন তখন তারা তাকে ঈমানের দাওয়াতকে বন্ধ করে দেয়ার বিনিময়ে বৈষয়িক সুবিধাগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলো। অর্থবিত্ত, সুন্দরী নারী, সর্দারী, নেতাগিরি,

জমিদারী–কোন্‌টা তারা দিতে চায়নি? সবই তারা দিতে প্রস্তুত ছিলো। তাদের শুধু দাবি ছিলো, তিনি যে আকিদা-বিশ্বাস প্রচার করেন তা বন্ধ করতে হবে। এটাই ছিলো তাদের একমাত্র চাওয়া। এতে বোঝা যায় যে, ইসলামবিরোধীদের সাথে ইসলামপন্থীদের মূল ও প্রধান দ্বন্দ্বই হলো একমাত্র আকিদা-বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। মুসলমানরা চায় ইসলামি আদর্শভিত্তিক জীবন ও সমাজ গড়তে, আর তারা চায় জাহেলিয়াতভিত্তিক জীবন ও সমাজব্যবস্থা গড়তে। ঈমানদাররা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর তারা তাদের অসংখ্য মানবপ্রভুদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মুমিনগণ একমাত্র মুহাম্মদ (স) এর আদর্শ অনুসরণ করে, আর তারা বিভিন্ন ধরনের তন্ত্র-মন্ত্র ও মতবাদের প্রবক্তা ও উদ্ভাবকদেরকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য, মুমিনদের অন্তর থেকে ঈমানের আলো নিভিয়ে দেয়ার জন্য অনেক সময় এরা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। আল্লাহর দ্বীনের সাথে জাহেলিয়াতের কোনো দিক দিয়েই কোনোরকম সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। যার কারণে জাহেলি সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখার বিরুদ্ধে যখন ঈমানদাররা প্রচার অভিযান চালায়, যখন জাহেলিয়াতের সকল ব্যবস্থার অসারতা মানুষের সামনে তুলে ধরে তখন জাহেলি সমাজের নেতৃস্থানীয় ধূর্ত শেয়ালগুলো মুমিনদের সম্পর্কে জনগণকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করে। তখন তারা চেপে যায় যে, দ্বীনের পথের মুজাহিদদের সাথে তাদের বিরোধ হলো ঈমান ও কুফরীর, শিরক ও তাওহিদের এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের কোনো বস্তুগত বিষয়ের নয়। তারা সুকৌশলে এই বিরোধিতা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে এটাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক দ্বন্দ্বের রূপ দিয়ে সাধারণ জনগণকে ধোঁকায় ফেলে দেয়ার অপচেষ্টা করে। তাই এসব ক্ষেত্রে মুমিনদের কিছুতেই প্রতারিত হলে চলবে না। তাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এগুলো তাদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা মুমিনদেরকে চূড়ান্ত বিজয় থেকে বঞ্চিত করতে চায়। তাই এই সংগ্রামের পথে চলতে গিয়ে কোনো ক্ষেত্রেই জাহেলিয়াতের সাথে আপস করা চলবে না। কেননা, দুনিয়াতে সামান্য সুবিধাজনক অবস্থানে যাওয়াটাই কোনো সফলতা নয়; বরং আগুনের গর্তে নিক্ষিপ্ত ঈমানদাররা আপসহীনতার মাধ্যমে যেভাবে ঈমানের বিজয় সাধন করেছিলেন সেই পথ ধরেও তাদের বিজয় আসতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের ইহুদি-খ্রিস্টানরা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিকৃত করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অবিরাম অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এখন ক্রুশ যুদ্ধকে আদর্শিক যুদ্ধ না বলে নিছক দেশ দখলের যুদ্ধ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। আসলে এটা একেবারে নির্জলা মিথ্যা। ক্রুশপন্থীরা অনেক পরে এসে সাম্রাজ্যবাদীতে পরিণত

হয়। এর মূল কারণ ছিলো তাদের ভেজাল আদর্শ। তাদের এই ভেজাল আদর্শ মধ্যযুগের অশিক্ষিত সমাজের মানুষগুলোকে গেলানো যতোটা সহজ ছিলো পরবর্তীতে ওই বস্তাপচা আদর্শ আর গেলানো সম্ভব হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই ভোল পাল্টে ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

মুসলমানরা এই বর্বর ক্রুশপন্থীদের সকল ষড়যন্ত্রের মুখে দলমত নির্বিশেষে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গেছেন। মামলুক গোত্রের তুরান শাহ, কুর্দীদের সালাহুদ্দীনসহ আরো অনেকে গোত্র, বর্ণ, অঞ্চল, দলমত নির্বিশেষে ঈমানের মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধ করেন এবং ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনেন। ঈমানী শক্তিই হলো মুসলিমদের একমাত্র শক্তি। বিরোধীরা যতো কৌশলই অবলম্বন করুক না কেন, যতো ভিন্ন সুরই তুলুক না কেন, সব সময় মনে রাখতে হবে, তাদের মূল বিরোধিতাই হলো ঈমানের সাথে, ইসলামের সাথে। তাই তো আল্লাহ তাআলা 'আসহাবুল উখদুদের' ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন–

"তারা এদের (ঈমানদারদের) কাছ থেকে এ কারণেই প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো।"

(সূরা বুরুজ, আয়াত ৮)

সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মহাজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কথা চিরন্তন, শাশ্বত ও মহাসত্য। পক্ষান্তরে ধোঁকাবাজ, প্রতারক ও ইসলাম বিদ্বেষীরা চিরকালই মিথ্যাবাদী ও ভ্রান্ত।

সমাপ্ত



AGAMI BIPLOBER GHOSONAPATRO

By : Sayed Kutub Shahid

Published by : Panjeree Islamic Publications

11, Islami Tower, Banglabazar, Dhaka

Phone : 7124328

Design : Solyman Shohag



ISBN 984-840-3-43-4

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা